অভিরূপ সরকার

ভারতীয় অর্থনীতির সংকট



ভারতীয় অর্থনীতির সংকট

অভিরূপ সরকার

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

BHARATIYA ARTHANITIR SANKAT
by
Abhirup Sarkar

ISBN 978-93-89584-58-5

প্রথম প্রকাশ :কলকাতা বইমেলা ২০২০
দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ : সুমন
প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৫

অধ্যাপক মিহির রক্ষিত, শ্রদ্ধাস্পদেষু

মুখবন্ধ

ভারতে উন্নতির রেলগাড়িটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। শুধু আর্থিক বৃদ্ধির মন্থরতা নয়। সেটা তো আছেই, কিন্তু তার সঙ্গে আছে অসম বন্টনের প্রশ্ন, ধর্মান্ধতার রক্তচক্ষু, জাতপাতের খাঁড়া, গণতন্ত্রের ব্যর্থতা। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, যেসব দরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজ-অর্থনীতি-গণতন্ত্রকে ধরে রাখে তারা ক্রমশ তাদের নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলছে। বোঝার ওপর শাকের আঁটি হিসেবে এসেছে নোট-বাতিলের অহেতুক বিড়ম্বনা। সব মিলিয়ে আমাদের দেশ এখন একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

ভারতীয় সমাজের বর্তমান সংকট নিয়ে এই বই। টুকরো টুকরো সমস্যাগুলো জুড়ে একটা সামগ্রিক ছবি তৈরি করার চেষ্টা করেছি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ও তাঁদের অর্থনীতি-চিন্তা নিয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবনা; সমাজতন্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথের সমবায় ধারণা নিয়ে দুটি লেখা। প্রবন্ধগুলো ২০১৩-১৯ এই সময় কালে আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, হরপ্পা, জাগো বাংলা এবং দৈনিক প্রতিদিন-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারতীয় ব্যাঙ্কিং-এর চালচিত্র' প্রবন্ধের 'বন্ধন ব্যাঙ্ক' অংশটি যৌথভাবে শৌভিক দত্ত এবং সোমদত্তা বসুর সঙ্গে লেখা। তাঁদের প্রতি আমার ঋণের কথাটা এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। পরিশেষে জানাই, দীপ প্রকাশন-এর কর্ণধার শংকর মণ্ডলের উৎসাহ ছাড়া এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা।

সূচিপত্র

উন্নতির মন্থর রেলগাড়ি

অর্থশাস্ত্রে ছোটখাট প্রহেলিকার অভাব নেই, কিন্তু প্রকৃত বিচারে যাকে রহস্য বলা চলে তেমন ধাঁধার সংখ্যা দু'একটার বেশি নয়। এই কতিপয় রহস্যের মধ্যে সম্ভবত সব থেকে বেশি চর্চিত রহস্য অর্থনীতির ওঠাপড়া। কে জানে কেন, কখনও কখনও হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে ওঠে বাজার, বেচাকেনা বেড়ে যায়, অবিশ্রাম ঘুরতে থাকে কল-কারখানার চাকা, চাকরি-বাকরি সহজলভ্য হয়, বাড়তে থাকে মজুরি, আয়, বিনিয়োগ। আবার কখনও কখনও কমে আসে জিনিসপত্রের চাহিদা, খদ্দেরের অভাবে দোকানদার দোকানে বসে মাছি তাড়ায়, পাড়ার মোড়ে ভিড় বাড়ে বেকারদের, যাদের কাজ আছে তারাও ভয়ে ভয়ে থাকে এই বুঝি চাকরিটা চলে গেল। সুখের দিন শেষ হয়ে আসে দুঃখের দিন, যেমন দিনের পর রাত্রি আসে। স্বস্তির কথা, সেই দুঃখের দিনও চিরস্থায়ী হয় না। কালচক্রের মতো মন্দার পরে আসে বেচাকেনার জোয়ার, জোয়ারের পরে আবার মন্দা। সুসময় এলে যত না সুখ, তার থেকে ঢের বেশি আতঙ্ক মন্দা নিয়ে। বিশেষ করে আমাদের দেশে, যেখানে সাধারণ মানুষের না আছে বেকার ভাতা, না আছে দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখা পর্যাপ্ত টাকাপয়সা।

রহস্যই বটে। মন্দা চলার সময় কেউই সঠিক জানে না আবার কবে ভাল সময় আসবে। আর এলে কতদিনই বা স্থায়ী হবে সেই সুসময়। বিজ্ঞানীরা যেমন সঠিকভাবে বলতে পারেন না কখন কোথায় ভূমিকম্প হবে, আর যেটুকু বলতে পারেন, সেটা এতটাই ত্রুটিযুক্ত যে তা দিয়ে বিশেষ কাজ হয় না। জোয়ার-মন্দা ভবিষ্যৎবাণী করার ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রীদের তেমনই অপারঙ্গমতা। সব থেকে বড় কথা, অর্থনীতিতে কেন মন্দা আসে, কেনই বা জোয়ার, এ-নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতান্তর লেগেই আছে। তবু চেষ্টা চলে, নতুন-নতুন তত্ত্বের জন্ম হয়।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর অর্থনীতিটা ঢিমে তালে চলছে। ঠিক মন্দা হয়ত আসেনি, তবে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রিবাটা যে হারে বাড়ছিল, সেই হারে আর বাড়ছে না। বিনিয়োগও নিম্নগামী। বলা যায়, মন্দার পূর্বাভাস। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তাদের 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক'-এ ভবিষ্যৎবাণী করেছে এবছর পৃথিবীব্যাপী আর্থিক বৃদ্ধিহার ৩ শতাংশে নেমে আসবে যা ২০০৮-০৯ থেকে বর্তমান সময় অব্দি সর্বনিম্ন। অর্থভাণ্ডার পৃথিবীর দেশগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেছে—বৃহত্তম চার এবং বাকি বিশ্ব। বৃহত্তম চারে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরো অঞ্চল, চিন ও জাপান। এদের সম্মিলিত উৎপাদন সারা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি। বাকি বিশ্বের মধ্যে আবার ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া, মেক্সিকো ইত্যাদি বড় বাজারওলা উদীয়মান দেশগুলিকে অন্যান্য স্বল্প আয়ের উন্নতিশীল দেশগুলির থেকে আলাদা করা হয়েছে। অর্থভাণ্ডারের তথ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবীর সম্মিলিত বৃদ্ধিহার যতটা কমেছে, বৃহত্তম চারটি দেশের আয় বৃদ্ধির হার ততটা কমেনি। অর্থভাণ্ডারের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৯ সালে বৃহত্তম চারের বৃদ্ধিহার ৩.৫ শতাংশের কিছু বেশি। অপরপক্ষে, রাশিয়া, সৌদি আরব, মেক্সিকো বা ব্রাজিল-এর মতো কয়েকটি উদীয়মান অর্থনীতির বৃদ্ধিহার ১ শতাংশেরও নীচে নেমে গেছে। তুলনায় অবশ্য ভারতের বৃদ্ধিহার কিছুটা ভাল। কিন্তু ভারতের প্রসঙ্গে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আসব।

অর্থভাণ্ডারের বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বব্যাপী এই আর্থিক ঝিমুনির প্রধান কারণ পৃথিবী-জুড়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমে আসা। এটা এখন সকলেই জানেন যে এখন চারদিকে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে একটা হাওয়া উঠেছে। সেই আবেগের একটা বর্হিপ্রকাশ যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের মধ্যে শুল্কযুদ্ধ, আর একটা ব্রেক্সিট। যুক্তরাষ্ট্র-চিনের শুল্কযুদ্ধের ফলে দুই দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গভীরভাবে মার খেয়েছে। ব্রেক্সিটের ফলে থমকে গেছে ব্রিটেনের সঙ্গে ইউরো অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোর স্বাভাবিক অর্থনৈতিক লেনদেন। শুল্কযুদ্ধ বা

ব্রেক্সিটের কারণে শুধু যে চিন, অ্যামেরিকা, ব্রিটেন কিংবা ইয়োরোপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাই নয়, এদের সঙ্গে যারা বাণিজ্য করে তারাও আর্থিক নিম্নগামীতার শিকার হয়েছে। এছাড়া উদীয়মান কিংবা উন্নতিশীল দেশগুলিতে তাদের নিজস্ব কিছু সমস্যাও আছে। কোথাও যুদ্ধ চলছে, কোথাও বৈদেশিক ঋণ এত বেড়ে গেছে যে সরকারের ওপর আস্থা হারাচ্ছে সাধারণ মানুষ, কোথাও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় ফাটল দেখা দিয়েছে আবার কোথাও বা পরিবেশ সংক্রান্ত আইন উদ্যোগপতিদের ওপর এতটাই চেপে বসেছে যে তাঁরা নতুন বিনিয়োগ করতে ভয় পাচ্ছেন। এই দেশ-ভিত্তিক সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট দেশগুলির আর্থিক বৃদ্ধি অনেকটাই ব্যাহত করেছে।

এবার ভারতের প্রসঙ্গে আসি। ২০১৯-এর অক্টোবর মাসে প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার 'মনিটারি পলিসি রিপোর্ট' থেকে জানতে পারছি ২০১৯-২০র প্রথম কোয়ার্টারে জাতীয় আয় ৫.১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলনায় এক বছর আগে, ২০১৮-১৯-এর প্রথম কোয়ার্টারে বৃদ্ধিহার ছিল ৮ শতাংশের কিছু বেশি, দু'বছর আগে, অর্থাৎ ২০১৭-৮র প্রথম কোয়ার্টারে এই বৃদ্ধিহার ছিল ৬ শতাংশ আর তিন বছর আগে, ২০১৬-১৭র প্রথম কোয়ার্টারে বৃদ্ধিহার ছিল প্রায় ৯.৫ শতাংশ। একটু খেয়াল করে দেখলেই বোঝা যাবে এই পরিসংখ্যানের আড়ালে একটা পরিষ্কার ছবি আছে। ২০১৬-১৭-র প্রথম কোয়ার্টার অর্থাৎ ২০১৬র এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার যে-শিখরে পৌঁছেছিল, এক বছর পরে, সন্দেহ নেই, নোট-বাতিলের ধাক্কায়, সেই বৃদ্ধিহার ৬ শতাংশে নেমে আসে। স্মরণ করা যেতে পারে, নোট-বাতিলের ঘোষণা হয়েছিল ২০১৬ সালের নভেম্বরে, এবং নোট বাতিল ছাড়া ২০১৬-১৭র প্রথম কোয়ার্টার থেকে ২০১৭-১৮র প্রথম কোয়ার্টার অব্দি আর তেমন কিছু ঘটেনি। কাজেই বৃদ্ধিহারের এই হঠাৎ পতনের পেছনে নোট-বাতিলকেই দায়ী করতে হবে। লক্ষনীয় যে, নতুন নোট বাজারে এসে যতই বাতিল নোটের শূন্যস্থান পূরণ করে দিয়েছে, ততই আপাতদৃষ্টিতে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেছে অর্থনীতি। এইভাবে চাঙ্গা হতে হতে ২০১৮ সালের এপ্রিল-জুনে বৃদ্ধিহার আবার ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৯-২০র দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার আরও কমে গিয়ে ৪.৫ শতাংশে নেমে গেছে।

দুটো প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে। এক, ২০১৮-র এপ্রিল-জুনে চাঙ্গা হবার পরে আবার কেন ভারতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করল? ২০১৮-র প্রথম কোয়ার্টারের পরে তো আর নোট-বাতিলের মতো বড় কোনও আঘাত অর্থনীতিতে আসেনি। দুই, এই পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে এক বছরের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতি নোট-বাতিলের বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠে আবার ৮ শতাংশেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। তাহলে কি ধরে নিতে হবে, ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান অধোগতির পেছনে নোট-বাতিলের কোনও ভূমিকাই নেই? তাহলে কি ধরে নিতে হবে, বর্তমান মন্দার জন্য বিরোধী দলগুলো যে নোট-বাতিলকে দায়ী করছে তার কোনও অর্থনৈতিক সারবত্তা নেই? এই দোষারোপের পেছনে শুধুই রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করছে?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা আমরা পরে খুঁজব, আগে প্রথম প্রশ্নটার সম্ভাব্য উত্তরগুলো খতিয়ে দেখা যাক। শাসক দল বলছে, বর্তমান মন্দার কোনও অভ্যন্তরীণ কারণ নেই। এর পুরোটাই শ্লথগতি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমদানি হয়ে এসেছে। ভারত যেহেতু কোনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়, তাই আন্তর্জাতিক টানাপোড়েনের আঁচ তার গায়েও লাগবে, আন্তর্জাতিক ওঠানামার ওপর ভারতের ভাগ্যও কিছুটা নির্ভর করবে, এটা স্বাভাবিক। এই ব্যাখ্যা মানলে এটাও মেনে নিতে হয় যে আর্থিক বৃদ্ধি কমে আসার পেছনে ক্ষমতাসীন সরকারের কোনও ভূমিকা নেই।

কিন্তু শাসক দলের এই ব্যাখ্যা মেনে নেবার কিছু যুক্তিসঙ্গত অসুবিধে আছে। প্রথমত, যদি এমন হতো যে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা কমে গেছে বলে দিশি বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পেতাম আমাদের রপ্তানির বৃদ্ধি কমছে। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, পেট্রোপণ্য বাদ দিয়ে ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ এই তিন বছরে ভারতীয় রপ্তানির বার্ষিক বৃদ্ধিহার ছিল যথাক্রমে

৫.৪ শতাংশ, ৮.৯ শতাংশ এবং ৬.৫ শতাংশ। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারের অগ্নিমান্দ্যের কারণে সম্প্রতি ভারতীয় রপ্তানি সাঙ্ঘাতিক রকম কমে গেছে এটা আদৌ বলা যাবে না। তাছাড়া পেট্রোপণ্য বাদ দিলে ভারতীয় রপ্তানি জাতীয় আয়ের দশ-এগারো শতাংশের বেশি নয়। ফলে রপ্তানির বৃদ্ধি দু'এক শতাংশ কমে গেলেও জাতীয় আয়বৃদ্ধির ওপর তার প্রভাব খুব বেশি না পড়ার কথা। সব মিলিয়ে, বর্তমান আর্থিক অধোগমন বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে এই তত্ত্ব খুব একটা দাঁড়াচ্ছে না।

কেউ কেউ বলছেন, বর্তমান অর্থনৈতিক শ্লথগতির প্রধান কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক বাজারের অস্থিতিশীলতা। কিছুদিন আগে ব্যাঙ্কগুলোর যে পাহাড়-প্রমাণ অনাদায়ী ঋণ জমে উঠেছিল, যে ঋণের পরিমাণ এখনও মোট জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ, তার ধাক্কা আজ অব্দি ব্যাঙ্কগুলো সামলে উঠতে পারেনি। তার ওপর ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো টাকা ধার দেয় তাদের অবস্থাও ভাল নয়। এই অবস্থায় ধার দেবার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত সাবধান হয়ে গেছে। ফলে বিনিয়োগকারিরা ধার চেয়ে পাচ্ছেন না, তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দেশের আর্থিক অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে, বৃদ্ধির হার কমছে। দুর্ভাগ্যবশত, অর্থনৈতিক শ্লথগতির এই ব্যাখ্যাও বাস্তবের সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না। যদি সত্যি সত্যি পর্যাপ্ত ঋণের অভাবে উৎপাদন ও আয়বৃদ্ধি আটকে থাকত তাহলে আমরা দেখতে পেতাম বাজারে জিনিসপত্রের অতিরিক্ত চাহিদা রয়েছে, যে-চাহিদা উৎপাদন যথেষ্ট হচ্ছে না বলে মেটানো যাচ্ছে না। বাস্তবে কিন্তু আমরা ঠিক এর উল্টোটা দেখছি। আমরা দেখছি, বাজারে চাহিদা নেই বলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করা যাচ্ছে না, বিক্রি না হওয়া পণ্য ডাঁই হয়ে মজুতঘরে পড়ে রয়েছে। ফলে নতুন উৎপাদনে কারও উৎসাহ নেই, শ্রমিকরা উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছেন, কোনও কোনও সংস্থায় ঢালাও ছাঁটাইও হচ্ছে। অর্থাৎ সমস্যাটা যোগানের দিক থেকে নয়, চাহিদার দিক থেকে।

ব্যাঙ্ক ঋণ কমে যাবার একটা বিকল্প একটা ব্যাখ্যা আছে। সেটা হল, ব্যাঙ্ক বা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে গিয়ে কম ধার দিচ্ছে তা নয়, বিনিয়োগকারিরাই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে কম ধার চাইছে। কম ধার চাইছে তার কারণ বাজারে জিনিসপত্রের চাহিদা নেই, তাই বিনিয়োগ করেও লাভ নেই। অর্থাৎ এই বিকল্প ব্যাখ্যা ঋণ যোগানের ঘাটতি নয়, ঋণ চাহিদার ঘাটতির ওপর জোর দিচ্ছে। যে ঘাটতির উদ্ভব ঘটছে জিনিসপত্রের চাহিদার অভাব থেকে।

কিন্তু বাজারে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমে যাচ্ছে এবং সেই কারণে দেশে মন্দা আসছে, শুধু এইটুকু বললে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। অনিবার্য প্রশ্ন ওঠে, বেশ তো সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল, হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমে যেতে লাগল? প্রশ্নটা গভীর। আমরা একভাবে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব যা কিছুটা অনুমান-নির্ভর হলেও বাস্তব পরিসংখ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমরা যেহেতু চাহিদার অভাবের কথা বলছি তাই প্রথমেই বোঝা দরকার জিনিসপত্রের চাহিদাটা মূলত কোথা থেকে আসছে। জিনিসপত্র একরকম নয়, অনেক রকম। এক-একরকম জিনিসের এক-এক ধরনের ক্রেতা। আয়ের নিরিখে একেবারে তলার দিকে যারা রয়েছেন তাদের চাহিদার তালিকায় রয়েছে একেবারে মৌলিক ভোগ্যপণ্য—খাদ্য, বাসস্থান, জামাকাপড়, কম দামের তেল-সাবান, বাসনপত্র, প্লাস্টিকের মগ-বালতি, সাইকেল। আজকাল গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেচে তাই গরীব মানুষও ইলেকট্রিক পাখা কিনছেন। তাছাড়া মোবাইল ফোন তো এখন ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। এই নীচের তলার ক্রেতারা সকলেই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। কেউ দিনমজুর, কেউ রিক্সা চালান, কারও হয়ত ছোট এক চিলতে চাষের জমি আছে। যারা শহর কিংবা মফস্বলে থাকেন তাঁদের কেউ কেউ ফুটপাতে বা জবরদখলের জমিতে দোকান দিয়েছেন, কেউ করেন মিস্তিরির কাজ, আবার কারও বা একটা ছোটখাট কারখানা আছে যার যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আদিম যুগের।

একটা সময় ছিল যখন অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে যাঁরা আয় করতেন তাঁরা তাঁদের ভোগ্যপণ্যগুলো অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকেই কিনতেন। অর্থাৎ তাঁরা যে জিনিসগুলো ব্যবহার করতেন সেগুলো মূলত

অসংগঠিত ক্ষেত্রেই তৈরি হত। দিনকাল বদলেছে। বেশ কিছুদিন হল, সংগঠিত ক্ষেত্রের বড় বড় কম্পানিরা গ্রাম ও মফস্বলের বাজারে প্রবলভাবে ঢুকে পড়েছে। তেল-সাবান হোক বা বিস্কুট-লজেন্স, সাইকেল হোক বা চাষের সরঞ্জাম, গ্রাম-মফস্বলের বাজারের প্রায় সবটাই এখন বড় বড় কম্পানিদের দখলে। ফলে বড় কম্পানিদের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্রয়-ক্ষমতার ওপর। তাছাড়া, অসংগঠিত ক্ষেত্রে মানুষের আয় যেহেতু কম, সেই আয়ের প্রায় সবটাই তাঁরা ভোগ্যপণ্যের ওপর খরচ করেন, বলা যায় খরচ করতে বাধ্য হন। আর ভোগ্যপণ্যের ওপর খরচ করা মানেই চাহিদা তৈরি করা। অর্থাৎ অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়লে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে। তুলনায় ধনীদের আয় বাড়লে দেশে জিনিসপত্রের চাহিদা ততটা বাড়ে না কারণ সেই আয়ের একটা বড় অংশ ধনীরা সঞ্চয় করে ফেলেন, কিংবা খরচ করলেও সেটা বিদেশি জিনিসের ওপর খরচ করেন, ফলে সামগ্রিকভাবে দিশি জিনিসের ওপর খরচ সামান্যই বাড়ে। এর মানে হল, অর্থনৈতিক বৈষম্য যত বাড়ে, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে দরিদ্রের হাতে জাতীয় আয়ের যত কম অংশ যায়, তত সামগ্রিকভাবে চাহিদার অভাবে একটা সঙ্কটের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

২০১৭ সালে প্রকাশিত লুকাস চানসেল ও টমাস পিকেটি-র একটি গবেষণাপত্র (ইণ্ডিয়ান ইনকাম ইনইকোয়ালিটি, ১৯২২-২০১৫, ফ্রম ব্রিটিশ রাজ টু বিলিওনেয়ার রাজ?) থেকে জানতে পারছি ১৯৫১-৮০ এই সময়ের মধ্যে ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমেছিল। এই সময়ের মধ্যে দেশের দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের মাথাপিছু আয় বছরে গড়ে ২.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তুলনায় উচ্চতম ১০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের মাথাপিছু আয় বেড়েছিল বছরে ১.২ শতাংশ হারে এবং উচ্চতম ০.০০১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের মাথাপিছু আয় কমেছিল ২.০ শতাংশ হারে। কিন্তু এর পর থেকে ভারতে আর্থিক বৈষম্য বাড়তে থাকে। ১৯৮০-২০১৫ এই পঁয়ত্রিশ বছরে যেখানে দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে বার্ষিক ১.৯ শতাংশ হারে সেখানে উচ্চতম ১০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের মাথাপিছু আয় বছরে ৫.১ শতাংশ হারে আর উচ্চতম ০.০০১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ধনীর মাথাপিছু আয় বার্ষিক ৯.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫০ সালে মোট জাতীয় আয়ের ১২ শতাংশ যেত উচ্চতম ১ শতাংশ ধনীর হাতে এবং ২১ শতাংশ যেত দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ-এর হাতে। ২০১৫ সালে পৌঁছে, ভারতে মোট আয়ের ২১.৩ শতাংশ যাচ্ছে উচ্চতম ১ শতাংশ ধনীর হাতে এবং মাত্র ১৪.৭ শতাংশ যাচ্ছে দরিদ্রতম ৫০ শতাংশের হাতে। আমাদের আশঙ্কা, এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ধীরে ধীরে বাজারে একটা চাহিদার অভাব তৈরি করছে।

এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। ১৯৫১-৮০ এই সময়ে আর্থিক বৈষম্য কমেছে বটে কিন্তু সব মিলিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসীর মাথাপিছু গড় বাৎসরিক আয়বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১.৭ শতাংশ হারে। পক্ষান্তরে, পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯৮০-২০১৫ এই পঁয়ত্রিশ বছরে, বৈষম্য যেমন বেড়েছে তেমনি আয়বৃদ্ধির হারও বেড়েছে। এই সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসীর মাথাপিছু গড় বাৎসরিক আয়বৃদ্ধির হার ৩.৩ শতাংশ। কেউ বলতেই পারেন, আর্থিক বৈষম্য বাড়লে যদি চাহিদা কমে গিয়ে বৃদ্ধি ব্যাহতই হবে তাহলে কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে-পর্যায়কালে বৈষম্য বেড়েছে সেই সময়ে বৃদ্ধিও বেশি হয়েছে? সঙ্গত প্রশ্ন, কিন্তু এর উত্তর আছে।

আমরা জানি, আশির দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় বাজার বিশ্বের বাজার থেকে অনেকাংশেই বিচ্ছিন্ন ছিল। একই সঙ্গে অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ কাঠামোটা ছিল নানারকম সরকারি বিধিনিষেধের নিগড়ে বাঁধা, লাইসেন্স রাজের শিকলে বন্দী। যখন সেই শিকল ভেঙে ফেলা হল, এবং যখন ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্বের অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হল, তখন স্বাভাবিকভাবেই আয়বৃদ্ধির সুযোগ বাড়ল। কিন্তু সেই সুযোগ-গ্রহণে, দুর্ভাগ্যবশত, উচ্চবিত্তদের তুলনায় নিম্নবিত্তদের অধিকতর প্রতিবন্ধকতা ছিল। কাজেই সার্বিক আয়বৃদ্ধি ঘটল বটে, কিন্তু উচ্চবিত্তদের আয় যে হারে বৃদ্ধি পেল, নিম্নবিত্তদের আয় সে হারে বৃদ্ধি পেল না। ফলে বৈষম্য বাড়ল। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, ১৯৮০-২০১৫ এই পর্যায়ে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে বৈষম্যের

কোনও সরাসরি কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। বিশ্বায়ন এবং উদারনীতি, নীতিগত পরিবর্তন হিসেবে, আয়বৃদ্ধি এবং বৈষম্য দু'টোকেই বাড়িয়েছে।

কিন্তু বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণ তো একটা এককালীন ধাক্কা। যত শক্তিশালীই হোক না কেন এই ধাক্কার প্রভাব ক্রমশ ফিকে হয়ে আসতে বাধ্য। আমাদের আশঙ্কা, যত এই প্রভাব ফিকে হয়ে আসবে তত ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য, চাহিদা-সঙ্কটের মাধ্যমে, আয়বৃদ্ধির ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সাব-প্রাইম ক্রাইসিস মন্দার আকারে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, আমাদের বিশ্বাস, তার পেছনেও আর্থিক বৈষম্যের একটা বড় ভূমিকা ছিল। ভারতে যেমন, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও গত আশির দশক থেকে ধারাবাহিকভাবে আর্থিক বৈষম্য বেড়েছে। বাড়তে বাড়তে শেষে নতুন শতাব্দীতে পৌঁছে অবস্থাটা এমন দাঁড়াল, যে দেখা গেল, বেশিরভাগ ঋণগ্রহীতা, যারা ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে বাড়ি-গাড়ি কিনছে, তাদের ঋণশোধের ক্ষমতাই নেই। তবু ব্যাঙ্করা তাদের ধার দিয়েই যাচ্ছিল কারণ ধার দিয়ে না গেলে ব্যাঙ্কদের ব্যবসা চলে না। কিন্তু ঝুঁকি এড়াবার জন্য সেই খারাপ ধার ভাল ধারের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন ঋণপত্র তৈরি করে ব্যাঙ্কগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছিল। যখন খারাপ ধারগুলো আর ফেরত পাওয়া গেল না, তখন সেই ঋণপত্রেরও আর কোনও দাম রইল না। ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে যারা সেই ঋণপত্র কিনেছিল তারা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ল, বাজারে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক, শুরু হল অর্থনীতির সংকোচন, মন্দা। এ-নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আর্থিক বৈষম্যের কারণে ব্যাঙ্কগুলো খারাপ ধার দিতে বাধ্য হয়েছিল বলেই এই সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল।

মানতেই হবে, ভারতে ২০১৫-১৬ অব্দি বৈষম্য তেমনভাবে আয়বৃদ্ধির ওপর দাঁত বসাতে পারেনি। ধরে নেওয়া যায়, যদি আর কিছু না ঘটত তাহলে আরও কিছুদিন আমাদের আয়বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটা অব্যাহতই থাকত। কিন্তু ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে নোট-বাতিলের যে হটকারি নীতি আমাদের অর্থনীতিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় তার প্রভাবে আর্থিক বৈষম্য হঠাৎ অনেকটা বেড়ে গেল। আমাদের স্থির বিশ্বাস, মূলত সেই কারণেই এখন থমকে গেছে আয়বৃদ্ধির রথ। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা দরকার।

আচমকা নোট-বাতিলের ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রের তুলনায় অসংগঠিত ক্ষেত্র অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর সহজ কারণ অসংগঠিত ক্ষেত্রের বেশিরভাগ লেনদেনই হয় নগদে। তুলনায় সংগঠিত ক্ষেত্রে নগদের ব্যবহার কম। নোট-বাতিলের বিপুল আঘাতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদন-ব্যবস্থা সেই যে ভেঙে পড়ল, এখনও সেই অবস্থা থেকে অধিকাংশ সংস্থাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। অসংগঠিত ক্ষেত্রের সংস্থাগুলি সাধারণত চড়া সুদে অসংগঠিত ঋণ-বাজার থেকে ধার নিয়ে থাকে। নোট-বাতিলের ফলে বহু সংস্থায় স্বাভাবিক পাওনা-গণ্ডা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, ফলে তারা তাদের ধারগুলো ঠিক সময় শোধ করতে পারল না। এর ফলে স্বভাবতই তাদের সুদের বোঝা বেড়ে গেল। বস্তুত বাজারে নগদের যোগান স্বাভাবিক হতে যতদিন সময় লাগল ততদিন অব্দি সুদের বোঝা বাড়তেই থাকল। এই বিপুল সুদের বোঝা ঘাড়ে থাকার কারণে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বহু সংস্থা এখনও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের রুগ্নতার প্রভাব সংগঠিত ক্ষেত্রে তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদার ওপর পড়েছে। ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রটিও সংকুচিত হচ্ছে। সেখানে উৎপাদন কমছে, কর্মচারি ছাঁটাই হচ্ছে, ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রেরও ক্রয়ক্ষমতা কমছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ, সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মচারিদের মনে ভয় দেখা দিয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে তাদের চাকরি চলে যেতে পারে। ফলে হাতে টাকা থাকলেও তারা ব্যয় করছে না, ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখছে। সব মিলিয়ে সংগঠিত ক্ষেত্রের চাহিদা আরও বেশি করে শ্লথগতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্রটি যে নোট-বাতিলের কুপ্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য আমাদের কাছে নেই কারণ নোট-বাতিলের পরে সেইভাবে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কোনও দেশব্যাপী সমীক্ষা হয়নি। কিন্তু কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ আছে। ভারতীয় শ্রমিকদের সম্পর্কে, বিশেষ করে

তাদের কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব নিয়ে, যে রিপোর্টটি নির্বাচনের আগে বিজেপি সরকার প্রকাশ করতে দেয়নি, সেই রিপোর্ট নির্বাচন শেষ হয়ে যাবার পর প্রকাশ পেয়েছে। রিপোর্টের নাম পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৭-১৮। ২০১৭-১৮র এই সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে বেকারত্বের হার অকল্পনীয় বেড়ে গেছে। ২০১১-১২ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী গ্রামে পুরুষদের বেকারত্বের হার ছিল ১.৭ শতাংশ, শহরে ৩.০০ শতাংশ। ২০১৭-১৮র সমীক্ষা অনুযায়ী গ্রামে পুরুষদের বেকারত্ব বেড়ে হয়েছে ৫.৮ শতাংশ, শহরে ৭.১ শতাংশ। গ্রামে ও শহরে মহিলাদের বেকারত্বও একই রকম বেড়েছে। গ্রামে বেড়েছে ১.৭ শতাংশ থেকে ৩.৮ শতাংশ, শহরে ৫.২ শতাংশ থেকে ১০.৮ শতাংশ। যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও অসংগঠিত ক্ষেত্রেই কাজ করেন তাই এই বেড়ে যাওয়া বেকারত্ব পরিষ্কার ইংগিত দিচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবস্থা ভাল নয়। ভারতীয় পরিবারগুলির ভোগ্যপণ্যের ওপর ব্যয় সংক্রান্ত রিপোর্টও সরকার প্রকাশ করতে দিচ্ছে না। কিন্তু সম্প্রতি মিডিয়াতে ফাঁস হয়ে যাওয়া খবরে প্রকাশ ২০১১-১২র তুলনায় ২০১৭-১৮তে ভারতের গ্রামগুলিতে মাসিক ব্যয় ৮.৮ শতাংশ কমে গেছে। এই তথ্যও, যদি সত্য হয়, তাহলে তা অসংগঠিত ক্ষেত্রের রুগ্নতার ইঙ্গিতবহ।

একটা প্রশ্নের অবশ্য উত্তর দেওয়া দরকার। আমরা দেখেছি, নোট-বাতিলের অব্যবহিত পরে জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার কমে গেলেও বছর খানেকের মধ্যে সেটা আবার অনেকটাই বেড়ে যায়। প্রশ্ন, নোট-বাতিলের পর অসংগঠিত ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবন না হলে এটা কি সম্ভব হতো? আসলে, আয়বৃদ্ধি হিসেব করার আগে অসংগঠিত ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবন হয়েছে কি হয়নি সেটা জানার জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের ওপর একটা সমীক্ষার প্রয়োজন ছিল। সেটা করা হয়নি। অসংগঠিত ক্ষেত্রের আয়ের সঙ্গে সংগঠিত ক্ষেত্রের আয়ের যে অনুপাত নোট-বাতিলের আগে করা কোনও সমীক্ষা থেকে পাওয়া গিয়েছিল, সেই অনুপাতটাকেই ধ্রুব মেনে নিয়ে সংগঠিত ক্ষেত্রের আয়ের ওপর চাপিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রের আয় হিসেব করা হয়েছে। এতে আয়বৃদ্ধির সরকারি হিসেবে মারাত্মক ভুল থেকে গেছে। কারণ সংগঠিত ক্ষেত্র যত তাড়াতাড়ি নোট-বাতিলের আঘাত সামলে উঠতে পেরেছে, অসংগঠিত ক্ষেত্র তা পারেনি।

সরকার অবশ্য এটুকু স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে ঠিক মন্দা না হলেও দেশে একটা মন্দার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এর জন্য সরকার দু'একটা পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। পর্যায়ক্রমে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যবর্তিতায়, সরকার সুদের হার কমিয়েছে। কর্পোরেট করও একধাপে অনেকটা কমানো হয়েছে। বলা হচ্ছে, সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বাড়বে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে মানুষ বাড়ি-গাড়ি-ফ্রিজ-টিভি কিনবে। আবার কর্পোরেট কর কমলেও ধরে নেওয়া হচ্ছে বিনিয়োগকারিরা বিনিয়োগে উৎসাহ পাবেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই চিন্তায় ত্রুটি আছে। প্রথমত বোঝা দরকার, সুদ কিংবা কর্পোরেট কর কমলে বিনিয়োগ বাড়ে না, বিনিয়োগ বাড়ে একমাত্র ভবিষ্যৎ বাজার ও লাভ সম্বন্ধে বিনিয়োগকারি আশাবাদী হলে। এই মন্দার ঋতুতে সেটার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে চাকরির অস্তিত্ব নিয়েই যেখানে সংশয় দেখা যাচ্ছে সেখানে সুদের হার শূন্যে নেমে গেলেও মানুষ ধার করে বাড়ি-গাড়ি কিনবে না, বরং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার জন্য টাকা জমাবে। আসলে সুদ কিংবা কর্পোরেট কর কমানোর মূল উদ্দেশ্য এই মন্দার আবহাওয়ায় বড় কম্পানিগুলোর মুনাফাকে খানিকটা রক্ষা করা। যে-কর্পোরেট নির্বাচনে টাকা যুগিয়ে দলকে ক্ষমতায় এনেছে এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনের সময় আবার যাদের ওপর নির্ভর করতে হবে তাদের, বলাই বাহুল্য, খানিকটা ভাল মেজাজে রাখা দরকার।

আপাতত বাজেট ঘাটতির কথা না ভেবে গরিব মানুষের হাতে টাকা যোগানোটাই মন্দার কবল থেকে উদ্ধার পাবার আসল উপায়। কিন্তু সেদিকে সরকারের আদৌ দৃষ্টি আছে কি?

(২)

ভারতীয় শ্রমিকদের সম্পর্কে, বিশেষ করে তাদের কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব নিয়ে, যে রিপোর্টটি নির্বাচনের আগে বিজেপি সরকার প্রকাশ করতে দেয়নি, সেই রিপোর্ট নির্বাচন শেষ হয়ে যাবার পর প্রকাশ পেয়েছে।

রিপোর্টের নাম পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৭-১৮। সরকার প্রকাশ করতে না দিলেও রিপোর্ট-এর আসল জায়গাটা নির্বাচনের আগেই সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। ফাঁস হওয়া অংশ থেকে জানা গিয়েছিল ২০১৭-১৮র সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে বেকারত্বের হার অকল্পনীয় বেড়ে গেছে। এখন সরকারিভাবে রিপোর্ট প্রকাশ পাবার পর দেখা যাচ্ছে, ফাঁস হওয়া তথ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

বেকারত্ব বাড়া-কমাটা নির্ভর করে আগে কী ছিল আর পরে কী হয়েছে তার ওপর। এর আগে ন্যাশানাল স্যাম্পল সার্ভে কর্মসংস্থান নিয়ে সমীক্ষা করেছিল ২০১১-১২ সালে। ২০১৭-১৮র সমীক্ষার পাশাপাশি ২০১১-১২র সমীক্ষাকে রেখে দু'টি সমীক্ষা থেকে আলাদা আলাদা বেকারত্বের যে ধারণা পাওয়া যায় সেগুলি সারণি ১-এ দেওয়া হয়েছে।

	গ্রাম		শহর	
সমীক্ষা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
২০১১-১২	১.৭	১.৭	৩.০	৫.২
২০১৭-১৮	৫.৮	৩.৮	৭.১	১০.৮

সারণি ১ ভারতে সার্বিক বেকারত্বের হার (শতাংশে)

এই দুই সমীক্ষার মধ্যে তুলনা করাটা যদি বৈধ হয় তবে এটা পরিষ্কার যে সম্প্রতি গ্রামে ও শহরে পুরুষ এবং মহিলাদের বেকারত্ব ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে।

সরকার অবশ্য বলছে, ২০১১-১২র সমীক্ষার সঙ্গে ২০১৭-১৮র সমীক্ষাটির কিছু পদ্ধতিগত তফাত আছে, তাই তারা আদৌ তুলনীয় নয়। কথাটা ২০১৭-১৮র রিপোর্টেও পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। এই কথার অনেক রকম মানে করা যেতে পারে। একটা সম্ভাব্য মানে হল, ২০১৭-১৮র সমীক্ষা ২০১১-১২র সমীক্ষার সঙ্গে সরাসরি তুলনা করলে যতটা মনে হয়, আসলে দেশে কর্মহীনদের সংখ্যা মোটেই ততটা বাড়েনি।

২০১৭-১৮র সমীক্ষা পদ্ধতিগত দিক থেকে কী অর্থে ২০১১-১২র সমীক্ষার থেকে আলাদা সেটা বোঝার আগে ভারতীয় বেকারত্বের দু'টি স্থায়ী প্রবণতার কথা উল্লেখ করা দরকার। আজ অব্দি কর্মহীনতা-কর্মসংস্থানের যত রিপোর্ট বেরিয়েছে তার প্রত্যেকটিতে দু'টো জিনিস লক্ষ করা গেছে। এক, গ্রামে বেকারত্বের হার শহরের তুলনায় কম। দুই, অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতদের তুলনায় বেশি শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশি। এই দু'টি স্থায়ী প্রবণতার প্রধান কারণ, গরিব মানুষ কর্মহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। বেঁচে থাকার তাগিদে কিছু না কিছু কাজ তাকে করতেই হয়। সেই কাজ তার মনের মতো নাও হতে পারে, কিন্তু কর্মহীন থেকে মনের মতো কাজ খোঁজার বিলাসিতা তার কপালে নেই। পক্ষান্তরে, যারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মেছে, যতদিন না তারা পছন্দ মতো কাজ খুঁজে পাচ্ছে ততদিন পরিবার তাদের প্রতিপালন করবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই তাদের পক্ষে কিছুদিন কর্মহীন থেকে উপযুক্ত কাজ খোঁজাটা শক্ত নয়। যেহেতু আমাদের দেশে শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি গরিব মানুষ বাস করে, তাই গ্রামে কর্মহীনতার হার অপেক্ষাকৃত কম। আবার আমাদের দেশে শিক্ষার সঙ্গে যেহেতু পারিবারিক বিত্তের একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে, তাই মোটের ওপর অল্প শিক্ষিতরা গরিব ঘর থেকে আসে, অধিক শিক্ষিতরা আসে অবস্থাপন্ন ঘর থেকে। গরিব ঘরের অল্প-শিক্ষিত মানুষ কর্মহীন হয়ে থাকতে পারে না, অবস্থাপন্ন ঘরের অধিক-শিক্ষিতরা উপযুক্ত কাজের খোঁজে কিছুদিন কর্মহীন হয়ে থাকতেই পারে।

এটা সকলেই জানেন যে, শ্রমজীবীদের মধ্যে কর্মরত-কর্মহীনদের অনুপাত আন্দাজ করার জন্য যে সমীক্ষা করা হয় তাতে নমুনা সংগ্রহের নিয়ম মেনে কিছু পরিবারকে বেছে নেওয়া হয় এবং দেখা হয় এক-একটি পরিবারে কতজন কর্মরত এবং কতজন কর্মহীন রয়েছেন। আমাদের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে যদি কোনও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের কারণে নমুনায় মোটের ওপর অধিকতর অবস্থাপন্ন পরিবার তুলনায় বেশি নির্বাচিত হয় তাহলে সার্বিকভাবে বেকারত্বের হারও বেশি দেখাবে। ২০১১-১২র সমীক্ষা অব্দি পরিবারগুলিকে তাদের মাথাপিছু মাসিক খরচের ভিত্তিতে বেছে নেওয়া হত। এমনভাবে নমুনা সংগ্রহ করা হত যাতে শহরে বেছে নেওয়া পরিবারগুলির ৭৫ শতাংশ সার্বিক আয় বন্টনের উপরের অর্ধেক অংশ থেকে আসে। ২০১৭-১৮র সমীক্ষায় এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন সমীক্ষায় এমনভাবে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে যাতে বেছে নেওয়া ৭৫ শতাংশ গেরস্থালির প্রত্যেকটিতে অন্তত একজন সদস্য থাকে যে মাধ্যমিক বা তার ওপরের কোনও স্তরের পরীক্ষায় পাশ করেছে। প্রশ্ন হল, এই পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে সংগ্রহিত নমুনায় বেকারত্বের হার বেড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে কি?

২০১৭-১৮র রিপোর্টেই দেখতে পাচ্ছি সারা ভারতে নারী-পুরুষ মিলিয়ে ৫১.৬ শতাংশ শহরের মানুষ মাধ্যমিক বা তার থেকে বেশি কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটাও ধরে নেওয়া ভুল হবে না যে বিদ্যার্জনের স্তরের সঙ্গে পারিবারিক বিত্তের একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে। কাজেই যে ৫১.৬ শতাংশ মাধ্যমিক বা তার থেকে বেশি কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁরা মোটের ওপর সার্বিক আয় বন্টনের উপরের অর্ধেক থেকেই আসছেন। অর্থাৎ ২০১৭-১৮র নমুনায় অপেক্ষাকৃত বিত্তবান পরিবারদের অনুপাত বেড়ে গেছে এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হচ্ছে না। আমাদের দেশে যেহেতু শিক্ষার আলো একটু একটু করে সমাজের নিচের তলাতেও পৌঁছে যাচ্ছে, তাই গরিব ঘরেও আজকাল একটা-দু'টো মাধ্যমিক পাশ সদস্য থাকাটা আশ্চর্য নয়। ফলে পুরোনো পদ্ধতিতে যে ৭৫ শতাংশ নমুনায় শুধু আয় বন্টনের ওপরের অর্ধেক থেকে পরিবাররা নির্বাচিত হত, নতুন পদ্ধতিতে সেখানে কিছু কিছু গরিব পরিবারও ঢুকে পড়ছে। এই কারণে নতুন পদ্ধতিতে বেকারত্বের হার কম দেখানোর একটা প্রবণতা থাকছে। অর্থাৎ পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে বেকারত্বের হার বেশি দেখানো দূরের কথা, খানিকটা কম দেখানোটাই স্বাভাবিক।

	গ্রাম		শহর	
সমীক্ষা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
২০১১-১২	৩.৬	৯.৭	৪.০	১০.৩
২০১৭-১৮	১০.৫	১৭.৩	৯.২	১৯.৮

সারণি ২ মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার (শতাংশে)

ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে দেখা যেতে পারে। সারণি ২-তে পুরোনো এবং নতুন সমীক্ষা অনুযায়ী মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার পাশাপাশি রাখা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এই শিক্ষিতদের মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে বেকারত্ব বেড়েছে। এখন, ২০১৭-১৮র সমীক্ষায় যেহেতু এই শিক্ষিতদের নমুনায় আয় বন্টনের নিম্নার্ধের কিছু পরিবারও ঢুকে পড়ছে, তাই, অনুমান করা যায়, এই সমীক্ষায় বেকারত্বের হার বাস্তবের তুলনায় কিছুটা কমই দেখাবে। প্রকৃত বেকারত্বের হার আসলে আরও বেশি।

সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলটা কি তাহলে একটা ধাঁধা? বেকারত্ব বেড়েছে আবার তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের ভোটও বেড়েছে। আমরা বলব, এটা ধাঁধা নয়, একটা আসন্ন সংকটের অশনি সংকেত। ২০১৬ সালের

নভেম্বর মাসে আকস্মিক নোটবন্দি অর্থনীতির স্বাভাবিক লেনদেনগুলোকে গভীরভাবে ব্যাহত করল, ফলে বহু মানুষ রুটি-রুজি হারালেন। পুরোনো বাতিল নোটের পরিপূরক নতুন নোট বাজারে আসতে আসতে বেশ কিছুদিন লেগেও গেল। যতদিন না নতুন নোট এসে নগদের যোগানকে স্বাভাবিক করতে পারল, ততদিন ভারতীয় অর্থনীতিও তার পুরোনো ছন্দে ফিরতে পারল না। এই অবস্থায় দেশে কর্মহীনতা বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, ২০১৭-১৮ সালের সমীক্ষায় এই হঠাৎ বেড়ে যাওয়া কর্মহীনতার চিত্রটাই ধরা পড়েছে।

এই অব্দি কোনও ধাঁধা নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, নোটবন্দি কিংবা অন্যান্য সরকারি নীতির ফলে যাঁরা কর্মহীন হয়ে গেলেন তাঁরা তাঁদের ক্ষোভটা ব্যালট বাক্সে প্রকাশ করলেন না কেন? বিজেপি চিরকালই বড় ব্যবসায়ীদের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু ছোট ব্যবসায়ী? দিন-আনা-দিন-খাওয়া শ্রমিক? ফসলের উপযুক্ত দাম না পাওয়া কৃষক? বেকার যুবক-যুবতী? এঁরা কেন বিজেপিকে ভোট দিলেন? একটাই ব্যাখ্যা। ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ এদের অন্ধ করে রেখেছিল।

অতীতে বারবার দেখা গেছে, ধর্মীয় উন্মাদনা কিংবা উগ্র জাতীয়তাবাদ মানুষের শুভবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানকে নষ্ট করে দেয়। তার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয়। এই কাজটা নাৎসিরা করেছিল, সাম্প্রতিককালে আইসিস করেছে। কিন্তু, ইতিহাস সাক্ষী, এর ভবিষ্যৎ ফল কখনও ভাল হয় না। আমাদের উদ্বেগ এইজন্য।

(৩)

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী নির্দেশ দিয়েছেন, মেক ইন ইন্ডিয়া, ভারতে তৈরি কর। কী তৈরি করব? আমাদের দেশে কত কিছুই তো তৈরি হয়, আবার কত কিছু হয়ও না, মোদীজী কাদের কথা বলছেন? স্বাধীনতার পর থেকে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমরা সব কিছু নিজেরাই তৈরি করতাম, ফলে আশির দশকেও চলত পঞ্চাশ দশকের গাড়ির মডেল। বলা হত, বিদেশিদের দিশি বাজারে ঢুকতে দিলেই তারা দেশের শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বন্ধ করে দেবে। সারা দেশটা তিরিশ-চল্লিশ বছর পিছিয়ে ছিল আর তার সুবিধে নিত কতিপয় অদক্ষ, অপদার্থ দিশি শিল্পপতি, সরকারি বাণিজ্য নীতি যাদের বিদেশি প্রতিযোগিতার ঝড়-ঝাপটা থেকে আগলে রাখত। সাধারণ ক্রেতাদের কথা কেউ ভাবত না।

সেসব দিন আর নেই। নব্বই দশক থেকে আমরা পৃথিবীর সামনে আমাদের দরজা-জানলা অনেকটাই খুলে দিয়েছি আর তখন থেকেই আমাদের বাজারে মুক্ত প্রতিযোগিতার হাওয়া লেগেছে। তার জেরে কিছু কিছু জিনিস আমরা আর তৈরি করি না, কারণ সেগুলো বিদেশিরা আরও ভাল করে তৈরি করতে পারে। আমরা শুধু সেগুলোই তৈরি করছি যেগুলোতে আমাদের আপেক্ষিক দক্ষতা আছে। এটাই মুক্ত বাজারের নিয়ম। এর ফলে সাধারণ ক্রেতাদের সরাসরি উপকার হয়েছে। মেক ইন ইন্ডিয়া বলতে মোদীজী নিশ্চয় বোঝাচ্ছেন না যে সেই অন্ধকার দিনগুলোতে আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে যখন পারি না পারি সব কিছুই আমরা তৈরি করার চেষ্টা করতাম।

বস্তুত, মেক ইন ইন্ডিয়ার মর্মার্থ বোঝার আগে মুক্ত বাজারের তাৎপর্যটা ভাল করে বোঝা দরকার। মুক্ত বাজারের ফলে ক্রেতাদের যে সরাসরি সুবিধে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এছাড়াও বাধাহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কিছু দীর্ঘমেয়াদি ফল আমাদের দেশে লক্ষ করা যায় যার সারাংশ হল দরজা-জানলা খুলে দেওয়ার ফলে আমাদের দেশে বিদেশি জিনিসের আমদানি যত বেড়েছে, বিদেশে আমাদের জিনিসের রপ্তানি ততটা বাড়েনি। নামী বহুজাতিকের ছাপ মারা মোটরগাড়ি, ফ্রিজ-টিভি-মোবাইল-ল্যাপটপ, ডিজাইনার কামিজ-পাৎলুন, প্রসাধনী সবই আজকাল হাতের নাগালে চলে এসেছে এবং ক্রেতারা সেইসব জিনিসপত্র হামলে পড়ে কিনছেন। তুলনায় বিদেশে বেচার মত জিনিস বলতে সেই সনাতন মণিরত্ন ও গয়নাগাঁটি, চামড়ায় তৈরি টুকিটাকি, সামান্য কিছু হালকা এবং সাদামাটা যন্ত্রপাতি। অর্থাৎ বিশ্বায়নের আগে আমাদের

রপ্তানির চেহারাটা যেরকম ছিল এখনও প্রায় সেরকমই রয়ে গেছে। শুধু কিছু পরিষেবা রপ্তানি, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে, আগে ছিল না, ইদানীং হয়েছে।

একটু তলিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁরা বলবেন, রপ্তানি যদি তেমন করে না বাড়ে তাহলে কীসের বিনিময়ে আমরা আমদানি করা জিনিসগুলো কিনছি? কেউ তো আর অমনি অমনি বিদেশ থেকে আমাদের জিনিসপত্র পাঠাচ্ছে না। এটা ঠিক যে, আমদানি এবং রপ্তানির মধ্যে একটা ফারাক থেকেই যাচ্ছে, অর্থনীতির কেতাবে যার নাম ট্রেড ডেফিসিট বা বাণিজ্য ঘাটতি। বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে গেলে বিদেশ থেকে ডলার আসতে হবে। রপ্তানি ছাড়া, বিদেশ থেকে ডলার আসার মোটামুটি তিনটে রাস্তা আছে—বিদেশিদের দান-খয়রাতি, ভারতের মাটিতে দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি বিনিয়োগ এবং দেশের শেয়ার বাজারে ডলারের প্রবেশ। প্রথম দুটো রাস্তা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, এসব রাস্তায় একবার ডলার ঢুকলে চট করে আবার বেরিয়ে যাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, গত এক দশকে এই রাস্তায় বিদেশি মুদ্রা ঢুকেছে কম, যে বিদেশি টাকা দেশে ঢুকেছে তার সিংহভাগই ঢুকেছে শেয়ার বাজারের পথে। শেয়ার বাজারে ঢোকা ডলার অত্যন্ত চঞ্চলমতি। একবার ঢুকে আবার কিছুদিনের মধ্যেই বেরিয়ে যেতে পারে। এর ওপর ভরসা করা যায় না। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে, টাকার দাম কমেছে, কখনও কখনও বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে ধার করতেও হয়েছে।

বলা দরকার, কিছুদিন আগে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি খানিকটা কম ছিল। এর কারণ, আমাদের প্রধান আমদানি যে-তেল, আন্তর্জাতিক বাজারে তার দাম কমে যাচ্ছিল। কিন্তু তখন কমে যাচ্ছিল বলে তেলের দাম চিরকাল কম থাকবে এমন মনে করার কারণ নেই। অর্থাৎ শেয়ার বাজারে ঢোকা ডলারের মত তেলের আন্তর্জাতিক দামও অতি অনিশ্চিত। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কম থাকবে ধরে নিয়ে ভোগ্যপণ্যের আমদানি বাড়ানো যায় না।

তাহলে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে, বিদেশি জিনিসপত্র কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অর্জন করতে হবে রপ্তানি থেকেই। এমন জিনিস আমাদের তৈরি করতে হবে যা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয়যোগ্য। আর এটাই মেক ইন ইন্ডিয়া-র প্রকৃত মর্মার্থ। এখানে অনিবার্যভাবে কয়েকটা প্রশ্ন উঠে আসে। এতদিন আমরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে এমন জিনিসপত্র খুব বেশি তৈরি করতে পারিনি কেন? কী করলে পারবো? পারলে, রপ্তানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থনীতিরও কি সার্বিক উন্নতি হবে? শেষ প্রশ্নটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন শিল্পকে দু'টি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়—নথিবদ্ধ উৎপাদন শিল্প এবং অনথিবদ্ধ উৎপাদন শিল্প। যে শিল্প সংস্থগুলিতে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় এবং দশ বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করেন অথবা যেখানে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় না কিন্তু কুড়ি বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করেন তারা নথিবদ্ধ উৎপাদন শিল্পের আওতায় পড়ছে। দেশের মোট কর্মসংস্থানের মাত্র ১১-১২ শতাংশ আসে উৎপাদন শিল্প থেকে। তার মধ্যে নথিবদ্ধ উৎপাদন শিল্প থেকে দুই-তিন শতাংশ-র বেশি কর্মসংস্থান আসে না। পক্ষান্তরে, জাতীয় আয়ে উৎপাদন শিল্পের অবদান ১০-১১ শতাংশ, কিন্তু তার সিংহভাগ (প্রায় সত্তর শতাংশ) অবদান নথিবদ্ধ উৎপাদন শিল্পের। অর্থাৎ কম লোক নিয়ে নথিবদ্ধ কল-কারখানাগুলি বেশি উৎপাদন করছে কারণ তাদের উৎপাদনশীলতা বেশি।

অনথিবদ্ধ উৎপাদন সংস্থাগুলি আসলে কোনওক্রমে টিকে আছে। কৃষিতে স্থানাভাব, জমি প্রায় নেই, যেটুকু ছিল পরিবার বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বহুধা-খণ্ডিত। তাই কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে ঘরের মধ্যে, বাড়ির আঙ্গিনায় কিংবা অস্থায়ী ছাউনির তলায় আদ্যিকালের প্রযুক্তি এবং অদক্ষ শ্রম দিয়ে যা তৈরি করা যায় সেটাই অনথিবদ্ধ উৎপাদনের বেশিটা জুড়ে আছে। স্বাভাবিক কারণেই এখানে উৎপাদনশীলতা কম। শুধু যে উৎপাদনশীলতা কম তাই নয়, এই উৎপাদনের মান অতি অনিশ্চিত, কখনও মোটামুটি, কখনও বেশ খারাপ। এরকম অনিশ্চিত মান, এরকম অচল প্রযুক্তি, অদক্ষ শ্রম ও নিম্ন ধরনের উৎপাদনশীলতা নিয়ে যদিবা জীবন-সমুদ্রে কোনমতে ভেসে থাকা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে এক মুহূর্তও টিকে থাকা যায় না। তাই রপ্তানি যদি

বাড়াতেই হয় তাহলে নথিবদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে তাকাতে হবে যেখানে শ্রমিকদের কিছু শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা আছে এবং যেখানে প্রযুক্তিও আপেক্ষিকভাবে আধুনিক।

আর এক ভাবে আমরা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সনাতন তত্ত্ব অনুযায়ী আর্থিক উন্নতির চিহ্ন হল নিম্ন উৎপাদনশীল ক্ষেত্র থেকে ক্রমাগত উচ্চ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যাত্রা। গরিব দেশগুলিতে কৃষির উৎপাদনশীলতা কম। তাই, যদি দেখতে পাই কর্মসংস্থানের দিক থেকে দেশে কৃষির গুরুত্ব কমছে, উচ্চ উৎপাদনশীল শিল্পের গুরুত্ব বাড়ছে, তখন ধরে নিতে হবে দেশের উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু জীবিকার তাগিদে মানুষ যদি কৃষি থেকে নিম্ন উৎপাদনশীল অনথিবদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করে, তাকে কখনওই প্রগতি বলা যাবে না।

অর্থাৎ মেক ইন ইন্ডিয়া কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য হল, যে অতি ক্ষুদ্র উচ্চ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রটি দেশে আছে তার প্রসার ঘটানো। এর ফলে যেমন একদিকে রপ্তানি বাড়বে তেমনি অন্য দিকে সার্বিকভাবে মানুষের অবস্থারও উন্নতি ঘটবে। প্রশ্ন হল, কী করলে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রটির প্রসার ঘটতে পারে? একটু খেয়াল করে দেখলে বোঝা যাবে, নথিবদ্ধ এবং অনথিবদ্ধ ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতার তফাতের পিছনে একটা বড় কারণ হল প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে শ্রমিকদের গড় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অনেকটাই কম। ২০০৪-০৫-এর ন্যাশানাল স্যাম্পল সার্ভে থেকে জানতে পারছি, নথিবদ্ধ উৎপাদন শিল্পে যেখানে ৪৩ শতাংশ শ্রমিক অন্তত মাধ্যমিক পাশ করেছেন, সেখানে অনথিবদ্ধ উৎপাদন শিল্পের ২০ শতাংশ শ্রমিকও মাধ্যমিক অব্দি পড়াশোনা করেননি। উল্টো দিক থেকে বলা যায়, আমাদের দেশে এখনও উচ্চ এবং মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষার প্রসার ততটা ঘটেনি বলেই উৎপাদনশীল ক্ষেত্রগুলির প্রসার ঘটছে না। উচ্চ উৎপাদনশীল শিল্পের প্রসার ঘটানোর জন্য অবশ্য রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, প্রশাসনিক দ্রুতি, উন্নত পুঁজির বাজার ইত্যাদি আরও কিছু কিছু পরিকাঠামো দরকার। কিন্তু সবার আগে দরকার মানব সম্পদ এবং সেই সম্পদ বৃদ্ধির জন্য উচ্চ এবং মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষার প্রসার যেটা স্বাধীনতার পর থেকে কাম্য হারে ঘটেনি।

নতুন কেন্দ্রিয় সরকার কি শিক্ষার প্রসারের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছেন? ২০১৪-১৫র বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হয়েছে মোট ব্যয়ের ৩.৪ শতাংশ। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৩-১৪ সালে ইউ পি এ সরকারের শেষ বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল মোট ব্যয়ের ৪.৫৭ শতাংশ। অর্থাৎ নতুন সরকার এসে যে দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ভারতবাসীকে শিক্ষিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, এমন কথা আদৌ বলা যাবে না। তাহলে কি আশা করা হচ্ছে মেক ইন ইন্ডিয়া অমনি অমনি হাওয়ার মধ্যে ঘটে যাবে?

আর একটা কথা। জনসংখ্যার বিন্যাসের দিক থেকে অর্ধেকের বেশি ভারতীয় যে এখন পঁচিশ বছরের কম বয়সী এই সত্যটাকে মোদীজী আমাদের বিপুল সুবিধা বলে দেশে-বিদেশে প্রচার করেছেন। কিন্তু এই বিরাট সংখ্যক অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের ঠিকমত শিক্ষিত করতে না পারলে, তাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান করা যাবে না। তখন সেই বিপুল সম্পদ একটা মস্ত বোঝায় পরিণত হবে।

গরিব দেশের গণতন্ত্র

গণতন্ত্র ও উন্নয়ন

গত বিশ-পঁচিশ বছর সারা পৃথিবী জুড়ে গণতন্ত্রের একটা ঢেউ এসেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কোনও না কোনও চেহারায় গণতন্ত্র রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। গণতন্ত্রের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রিডম হাউস নামক যে সংস্থাটির জন্ম হয়েছিল, তারা ১৯৭২ সাল থেকে বিশ্ব গণতন্ত্রের হাল-হকিকত নিয়ে একটি বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। তাদের দেওয়া হিসেব থেকে দেখতে পাচ্ছি, ১৯৮৯ সালে পৃথিবীর ১৬৭টি দেশের মধ্যে ৬৮টি দেশে, অর্থাৎ মোটামুটি ৪১ শতাংশতে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্যবর্তিতায় শাসনকর্তা বেছে নেওয়া হত। ২০১২ সালে পৌঁছে হিসেবটা অনেকটাই বদলেছে। ফ্রিডম হাউস জানাচ্ছে, ২০১২ সালে সারা পৃথিবীতে স্বাধীন দেশের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৯৫ এবং তাদের মধ্যে ১১৬টিতে, অর্থাৎ মোটামুটি ৬০ শতাংশ দেশে, এখন কোনও না কোনও ধরনের নির্বাচন হয়। সন্দেহ নেই, গণতন্ত্রের এই বিস্তার অংশত সফল হয়েছে সনাতন সমাজতন্ত্র তথা একনায়কতন্ত্রের প্রতি বিশ্বব্যাপী আস্থাহীনতার ফলে। কিন্তু সে যাই হোক, আরও দরকারি প্রশ্ন হল, গণতন্ত্রের এই আপাত □□গ্মি□□□□ সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা এবং সবার উপরে অর্থনৈতিক প্রগতিরও বিস্তার ঘটছে কি?

এই মুহূর্তে, ফ্রিডম হাউস এবং তার মতো আরও কয়েকটি সংস্থা প্রতি বছর বিভিন্ন সূচকের সাহায্যে বুঝতে এবং বোঝাতে চায় পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতন্ত্র কেমন চলছে। তারা এইসব সূচকের উপর নির্ভর করে প্রতিটি দেশের সঙ্গে এক-একটি করে গাণিতিক নম্বর জুড়ে দেয় এবং সেই নম্বরের ক্রম অনুযায়ী দেশগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে জিজ্ঞাসু জনের সামনে হাজির করে। সমস্যা হল, এক সংস্থার সঙ্গে অন্য সংস্থার মূল্যায়নে প্রায়শই আকাশ-পাতাল তফাত দেখা যায়। যেমন, বিলেতের দি ইকনমিস্ট নামক পত্রিকাটি যে 'ডেমক্রেসি ইনডেক্স' প্রতি বছর প্রকাশ করে থাকে তাতে প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী পৃথিবীর দেশগুলিকে 'পূর্ণ গণতন্ত্র', 'ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র', 'মিশ্র শাসনব্যবস্থা' এবং 'একনায়কতন্ত্র' এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। দেশগুলির শ্রেণিবিভাগ নির্ভর করে অনেকগুলি সূচকের ওপর। দেখা হয়, কত স্বচ্ছভাবে নির্বাচন হচ্ছে, কত জন ভোট দিচ্ছেন, সংবাদ-মাধ্যম কতটা মুক্তভাবে কাজ করতে পারছে, দুর্নীতি কতটা, সরকার কতটা নিরপেক্ষ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ২০১২ সালে দি ইকনমিস্ট ২১৪টি দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যার মধ্যে ১১৬টিতে নির্বাচনী গণতন্ত্র ছিল। এই ১১৬টি দেশের মধ্যে মাত্র ২৫টিকে (অর্থাৎ ২১.৬ শতাংশকে) 'পূর্ণ গণতন্ত্র' আখ্যা দিয়েছে দি ইকনমিস্ট। ৭৫টিকে (৬৪.৬ শতাংশকে) রাখা হয়েছে 'ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র'-এর শ্রেণিতে, আর বাকি ১৬টিতে (১৩.৮ শতাংশতে) বলা হচ্ছে কায়েম রয়েছে 'মিশ্র শাসনব্যবস্থা'। উল্লেখ করা যেতে পারে, দি ইকনমিস্ট-এর তালিকায় ভারত স্থান পেয়েছে 'ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র'-এর শ্রেণিতে।

পক্ষান্তরে, ফ্রিডম হাউস, যারা গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিচার করে রাজনৈতিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার কয়েকটি সূচক দিয়ে, তারা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে 'মুক্ত', 'আংশিক মুক্ত' এবং 'মুক্ত নয়' এই তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে থাকে। ২০১৩ সালে তাদের তালিকায় স্থান পেয়েছে ১৯৪টি দেশ যার মধ্যে ১১৬টি নির্বাচনী গণতন্ত্র। এই ১১৬টি দেশের মধ্যে ৮৯টিকে (৭৬.৭ শতাংশকে) 'মুক্ত' এবং বাকি ২৭টিকে (২৩.৩ শতাংশকে) 'আংশিক মুক্ত' শ্রেণিতে রাখা হয়েছে। ফ্রিডম হাউসের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী ভারত একটি 'মুক্ত' গণতন্ত্র।

এই দুটি সংস্থা ছাড়াও আরও কেউ কেউ পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলির নিয়মিত মূল্যায়ন করেন, কিন্তু উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের অস্বস্তিটা বোঝানোর জন্য উপরের দুটি উদাহরণই যথেষ্ট। আমাদের অস্বস্তির কারণ, বিভিন্ন মূল্যায়নের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব। সামঞ্জস্যের অভাব এতটাই যে, দি ইকনমিস্ট যেখানে মাত্র ২১.৬ শতাংশ নির্বাচনী গণতন্ত্রকে 'পূর্ণ' গণতন্ত্রের সার্টিফিকেট দিচ্ছে, ফ্রিডম হাউস সেখানে ৭৬.৭ শতাংশকে 'মুক্ত' বলে মানতে রাজি। এই বিপুল অসামঞ্জস্য থেকে বিশ্ব গণতন্ত্রের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কী ধারণা করব? অনুমান করা শক্ত নয়, গণতন্ত্রের বিভিন্ন মাপকাঠিগুলোর ওপরে যে যার নিজের মতো করে গুরুত্ব দিয়েছে। গণতন্ত্রের থেকে বিভিন্ন সংস্থাগুলির চাহিদাও আলাদা আলাদা। তাছাড়া, এক-একজনের নম্বর দেবার হাতও এক-একরকম। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা বেশ গুলিয়ে দেবার মতো।

কিন্তু বিভিন্ন মূল্যায়নের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব যতই থাকুক না কেন, একটা ব্যাপারে তাদের পুরোপুরি মিল আছে। প্রত্যেকটি মূল্যায়নেই দেখতে পাচ্ছি, গরিব দেশগুলো মোটের ওপর বড়লোক দেশগুলোর তুলনায় খারাপ ফল করেছে। অর্থাৎ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, বড়লোক দেশগুলোতে গণতন্ত্র যতটা ভাল ভাবে কাজ করছে, গরিব দেশগুলোতে ততটা করছে না। সুস্থ গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈভবের এই সরাসরি সম্পর্কের সম্ভাবনা লিপ্সেট তাঁর ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি আবার এই সম্পর্কের উৎস খুঁজে পেয়েছেন অ্যারিস্টটলের লেখায়। এই সম্পর্ক, পরবর্তীকালে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যারিস্টটল-লিপ্সেট অনুমান' ঠিক না ভুল তা নিয়ে সম্প্রতি অনেক লেখালিখি হয়েছে। তার মধ্যে কিছু লেখা বেরিয়েছে জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে, আবার কিছু স্বারস্বত পত্র-পত্রিকা বা গবেষণা গ্রন্থে, মূলত পণ্ডিত-সমাজের জন্য। যা স্বারস্বত পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে তার কিছু কিছু আবার সরলীকৃত হয়ে জনপ্রিয় মাধ্যমেও জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের পরবর্তী আলোচনার সুবিধের জন্য এখানে দু'তিনটে মৌলিক গবেষণা পত্র বা গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে রবার্ট ব্যারো গণতন্ত্রের মান এবং আর্থিক সাচ্ছল্য এই দুই-এর মধ্যে কোনও তথ্যভিত্তিক সম্পর্ক আছে কিনা খতিয়ে দেখেছেন। এটা দেখতে গিয়ে তিনি একদিকে ফ্রিডম হাউস সংকলিত রাজনৈতিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার সূচকের সঙ্গে আরও দু'একটি তথ্যপঞ্জী মিলিয়ে গণতন্ত্রের একটা আরও সার্বজনীন সূচক তৈরি করেছেন। অন্যদিকে আর্থিক সাফল্য মাপা হয়েছে মাথাপিছু আয়, জনসংখ্যায় প্রাথমিক স্কুল পাশ করা ছেলে ও মেয়েদের অনুপাত, দুটি অনুপাতের মধ্যে নৈকট্য ইত্যাদির সাহায্যে তৈরি আর একটি সূচক দিয়ে। ব্যারো পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যে, গণতন্ত্রের মান এবং আর্থিক সাচ্ছল্যের এই দুই সূচকের মধ্যে একটা সংখ্যাগতভাবে উল্লেখযোগ্য সরাসরি সম্পর্ক আছে।

একই ভাবে ড্যারন অ্যাসিমোগলু এবং জেমস রবিনসন তাঁদের সাম্প্রতিক একটি গ্রন্থে দেখিয়েছেন জীবনযাত্রার মান এবং গণতন্ত্রের উৎকর্ষ এই দুই-এর মধ্যে পরিষ্কার সম্পর্ক রয়েছে। অ্যাসিমোগলু-রবিনসন ফ্রিডম হাউসের তথ্যাবলী এবং পলিটি ইনডেক্স নামক বিস্তৃততর একটি তথ্যপঞ্জী থেকে উদ্ভূত দুটি গণতন্ত্রের সূচককে আলাদা করে ১৯৯০ দশকে বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে এবং সেই সব দেশের গড় শিক্ষার ব্যাপ্তির সঙ্গে, অর্থাৎ গড়ে কত বছর নাগরিকরা ইস্কুল-কলেজে যাচ্ছেন তার সঙ্গে, তুলনা করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, যেসব দেশে গণতন্ত্রের সূচক ভাল, মোটের ওপর সেখানে আর্থ-সামাজিক সূচক দুটিও উন্নয়ন নির্দেশ করছে। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে, ১৯৬০-১৯৯৫ এই পঁয়ত্রিশ বছর গণতন্ত্রের মান অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে ওইসিডি দেশগুলি সব থেকে ওপরে রয়েছে। তার নীচে রয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি, তারও নীচে এশিয়া এবং সব থেকে নীচে আফ্রিকা। তবে আশার কথা এই যে, ব্যবধানগুলো ক্রমশ কমছে।

আর একটি গবেষণা গ্রন্থে প্রেজওরস্কি, অ্যালভ্যারেজ, লিমঙ্গি ও চেইবাব একটু সতন্ত্র রাস্তা নিয়েছেন। তাঁরা পৃথিবীর দেশগুলিকে গণতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক এই দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। গণতন্ত্র হিসেবে

গণ্য হবার জন্য রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার ছাড়াও আর একটি শর্ত এঁরা আরোপ করেছেন। এঁরা বলছেন, একটি দেশে যদি কখনও রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন না হয়ে থাকে তাহলে তাকে গণতন্ত্র বলা যাবে না। অর্থাৎ এঁদের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা বা বৎসোয়ানা গণতান্ত্রিক দেশ নয় যেহেতু সেখানে কখনও রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়নি। এঁরা দেখাচ্ছেন, সচ্ছল দেশগুলিতে শুধু যে গণতন্ত্রের মান অপেক্ষাকৃতভাবে উন্নত তাই নয়, গরিব দেশগুলির তুলনায় এসব দেশে গণতন্ত্র টিকে যাবার সম্ভবনাও অনেক বেশি। অন্যভাবে বলতে গেলে, গরিব দেশগুলিতে, যেখানে এখন গণতন্ত্র আছে, সেখানে ভবিষ্যতে সামরিক শাসন বা একনায়কতন্ত্র চলে আসার সম্ভবনা প্রবল, যেটা বড়লোক দেশে নেই বললেই চলে।

উপর্যুক্ত গবেষণাগুলি সবই তথ্যভিত্তিক, এখানে কোনও তত্ত্বের অবতারণা করে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়নি। কোথাও বলবার চেষ্টা করা হয়নি কেন গরিব দেশগুলোতে গণতন্ত্র ঠিকমত চলছে না। কিছু কিছু গবেষণা থেকে এমনকি এটাও স্পষ্ট নয় যে, গণতন্ত্র ঠিক মতো না চলার কারণ দারিদ্র, নাকি দারিদ্রের অন্যতম কারণ গণতন্ত্র ঠিক মতো না চলা, নাকি দুটোই। অর্থাৎ উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের মধ্যে কে কারণ এবং কে ফল সেটা এইসব গবেষণা থেকে আদৌ স্পষ্ট নয়। বস্তুত, একটু আগে উল্লিখিত ব্যারো-র প্রবন্ধে দেখতে পাচ্ছি তিনি খেদ করেছেন, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের মধ্যে যে সরাসরি সম্পর্ক আছে তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এখনও তেমন নেই।

গণতন্ত্রের আর্থ-সামাজিক তত্ত্ব

কিন্তু তাই বলে গণতন্ত্রের কোনও আর্থ-রাজনৈতিক তত্ত্ব নেই তা মোটেই নয়। উল্টোটাই বরং সত্যি। তত্ত্ব যা আছে তা অনেক ও বহুমুখী। আমাদের আলোচনায় তার সবটা প্রাসঙ্গিক হবে না। কিন্তু যেটুকু প্রাসঙ্গিক সেটুকু বলা দরকার। অ্যান্টনি ডাউন্স ১৯৫৭ সালে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার যে তাত্ত্বিক রূপরেখা তৈরি করেছিলেন এবং পরবর্তী পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর তার ওপর ভিত্তি করে যে তত্ত্বাবলী গড়ে উঠেছে, তাদের কথা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে, কারণ আর্থ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণের এটাই মূলস্রোত।

ধরা যাক দুটি রাজনৈতিক দল আছে, একটি ক্ষমতাসীন, একটি বিরোধী। দুজনের একটাই লক্ষ—ক্ষমতায় থাকা। একটা সরল রেখা কল্পনা করা যাক যার এক-একটি বিন্দু এক-একটি আর্থ-সামাজিক নীতিকে নির্দেশ করে। বামতম বিন্দুটি নির্দেশ করে বামতম আর্থ-সামাজিক নীতি, তারপর সরল রেখাটি ধরে যত দক্ষিণে যাওয়া যাবে ততই নীতি হয়ে উঠবে দক্ষিণপন্থী। এইভাবে সরল রেখার মধ্যবিন্দুটিকে বলা যায় মধ্যপন্থী নীতি আর দক্ষিণতম বিন্দুটিকে উগ্রতম দক্ষিণপন্থা। ভোটাররা সংখ্যায় অগুন্তি, তাঁরা তাঁদের সর্বাধিক পছন্দের নীতি অনুযায়ী এই সরল রেখার ওপর বিস্তৃত এই অর্থে যে, সরল রেখার ওপর প্রতিটি ভোটারের একটি সর্বাধিক পছন্দের বিন্দু আছে। নির্বাচনের আগে দুটি রাজনৈতিক দল তাদের ভবিষ্যত নীতি ঘোষণা করে (এবং ধরে নেওয়া হয়, ভবিষ্যতে ক্ষমতায় এলে তারা সেই নীতি অনুযায়ী কাজ করবে)। নীতি ঘোষণার পর নির্বাচন। সেই নির্বাচনে প্রতিটি ভোটার সেই দলকেই ভোট দেবে যার ঘোষিত নীতির থেকে ভোটারটির দূরত্ব (ডান কিংবা বামদিকে) সব থেকে কম। গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার এই অতি-সরলীকৃত বৃত্তান্তের মূল সিদ্ধান্ত হল, রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নীতি হিসেবে ওই সরল রেখার ওপর এমন একটি মধ্যবিন্দু বেছে নেবে যার নিরিখে বাম-মনস্ক ভোটারের সংখ্যা এবং দক্ষিণ-মনস্ক ভোটারের সংখ্যা সমান সমান। সংখ্যাতত্ত্বের ভাষায় বললে, ভোটারদের মধ্যে মধ্যমা বিন্দুটিতে যে ভোটারের অবস্থান তার সর্বাধিক পছন্দ নীতিটিকেই রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ঘোষিত নীতি হিসেবে বেছে নেবে। এই সিদ্ধান্তের পোষাকি নাম 'মিডিয়ন ভোটার থিয়োরেম'।

এর তাৎপর্য একাধিক। প্রথমত, এই তত্ত্বে অনুমান করা হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলি, ভোটে জেতার জন্য, মোটের ওপর একই ধরণের নীতি গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রে জয়িষ্ণু রাজনীতিক দলগুলি একটা মধ্যপন্থা নেবে, চরম দক্ষিণপন্থী বা চরম বামপন্থী নীতি কখনই অবলম্বন করবে না। তৃতীয়ত, বেশিরভাগ ভোটারের যে নীতিটি পছন্দ তারই আশেপাশে একটা নীতি গ্রহণ করবে দলগুলি। এর অর্থ হল, গরিব

দেশগুলিতে গণতন্ত্র থাকলে সেখানে রাজনৈতিক দলগুলো গরিব মানুষের কথা ভেবেই নীতি গ্রহণ করবে যেহেতু সেসব দেশে গরিব মানুষই সংখ্যায় বেশি।

বলাই বাহুল্য, এইসব ভবিষ্যৎবাণীর কোনওটাই আমরা বাস্তবে ঘটতে দেখি না। দেখার কথাও নয়, যেহেতু ডাউন্সীয় তত্ত্বটি অতি-সরলীকৃত। কিন্তু এই তত্ত্বের উপযোগিতা এই যে একে অনায়াসেই একটু আধটু বাড়িয়ে নিয়ে বাস্তবমুখী করে তোলা সম্ভব। যেমন আসার লিন্ডবেক ও জন ওয়াইবুল তাঁদের ১৯৮৭ এবং ১৯৯৩ সালের দুটি গবেষণা পত্রে ডাউন্সীয় সরল পৃথিবীটাকে আর একটু বাস্তবানুগ করে নিয়েছেন। তাঁরা ধরে নিচ্ছেন শুধু রাজনৈতিক দলগুলির ঘোষিত নীতিই নয়, ভোটারদের পছন্দ-অপছন্দ নির্ভর করে পদপ্রার্থীর সঙ্গে তাদের জাতি, ধর্ম, শ্রেণি বা ভাষাগত নৈকট্যের ওপর। তাছাড়া কোনও বিশেষ পার্টি বা পরিবারের প্রতি একজন ভোটারের ব্যক্তিগত আনুগত্য থাকতেই পারে। উপরন্তু সব ভোটারের যে একই রকম রাজনৈতিক সচেতনতা থাকবে এমন নয়। সেক্ষেত্রে, রাজনৈতিক প্রার্থী বা দলগুলির ঘোষণা কিংবা কার্যকলাপ থেকে এক-একজন ভোটার এক-একরকম মানে করতেই পারেন। সব মিলিয়ে, লিন্ডবেক ও ওয়াইবুল ধরে নিচ্ছেন ভোটারদের ব্যবহারে কিছু অনিশ্চয়তা থাকবে। ফলে ভোটের ফল অংশত রাজনৈতিক দলগুলির ঘোষিত নীতির ওপর নির্ভর করলেও, পুরোপুরি তা দিয়ে নির্ধারিত হবে না।

এর থেকে দু'একটা দরকারি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যেতে পারে। এক, গরিব দেশগুলোতে গরিব মানুষদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবের কারণে রাজনৈতিক দলগুলি গরিবদের স্বার্থবিরোধী কাজ করেও পার পেয়ে যায়। ফলে, বছরের পর বছর গরিবরা গরিবই থেকে যায়। দুই, গরিব মানুষদের রাজনৈতিক অজ্ঞানতার সুযোগ নেয় বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী। তারা রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রচারের জন্য টাকার যোগান দেয় এবং রাজনৈতিক দলগুলি সেই প্রচার দিয়ে অসচেতন মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের ভোট আদায় করে। বিনিময়ে নির্বাচনে জিততে পারলে দল তার সাহায্যকারী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধে পাইয়ে দেয়। এই বিষয় নিয়ে ডাউন্সীয় তত্ত্বের চমৎকার প্রয়োগ দেখতে পাই দীক্ষিত ও লন্ড্রিগান-এর ১৯৯৫ সালের এবং গ্রসম্যান ও হেল্পম্যান-এর ১৯৯৫ সালের গবেষণা পত্রগুলিতে।

এসবের সারাংশ করে বলতে পারি, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ডাউন্সীয় তত্ত্বের সঙ্গে যদি কিছুটা সচেতনতার প্রসঙ্গ মিশিয়ে দেওয়া যায়, যদি বলা যায়, গরিব মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা কম তাই তাঁরা রাজনৈতিক খবরাখবরও কম রাখেন বা কম বোঝেন, তাহলে এটাও বলা যায়, গণতন্ত্র থেকে তাঁরা বিশেষ কিছু পাবেন না। গণতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও বড়লোকরা দশকের পর দশক ধরে গরিব মানুষকে তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবেন। এইভাবে গরিব দেশে গণতন্ত্র কেন ঠিকঠাক কাজ করছে না তারও একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হল, গরিব মানুষ কি সত্যি-সত্যিই রাজনৈতিক খবরাখবর কম রাখেন বা কম বোঝেন? সত্যিই কি তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতা কম? আমরা দেখাব যে তা তো নয়ই, বরং তার উল্টোটাই সত্যি। এবং গরিবরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও একটি গরিব দেশের গণতন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার আগে আধুনিক আর্থ-রাজনীতি চর্চার আরেকটি ধারার কথা বলে নিতে হবে।

অ্যাসিমোগলু-রবিনসন এবং অন্যান্য কয়েকজন গবেষক অন্য একটি প্রশ্ন তুলছেন। তাঁরা বুঝতে চাইছেন, কোন অবস্থায় একটি দেশ অগণতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উন্নীত হতে পারে, কিংবা কোন অবস্থায় একটি গণতান্ত্রিক দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গিয়ে একনায়কতন্ত্র কায়েম হয়ে যায়। এই গবেষকরা মনে করছেন, একটা দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানটি আসবে কি আসবে না কিংবা থাকবে কি থাকবে না সেটা সব থেকে বেশি নির্ভর করবে সেই দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অসাম্যের ওপর। এটা শুধু গরিব-বড়লোকের ভিতরে অসাম্য নয়; গরিব-বড়লোকের মধ্যে আয়ের অসাম্য তো আছেই, তাছাড়া আছে ধর্ম জাতি ও সম্প্রদায় ভিত্তিক অসাম্য। তবে আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা গরিব-বড়লোকের মধ্যে আয়ের অসাম্য-র দিকেই

নজর দেব। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা এটাও ধরে নেব যে, একটি দেশে দু'টো মাত্র গোষ্ঠী আছে, নাগরিক ও নগরপালক, এবং প্রথমোক্ত গোষ্ঠীটি দ্বিতীয়টির তুলনায় গরিব।

অ্যাসিমোগলু-রবিনসনরা বলছেন, অসাম্য এবং গণতন্ত্রায়নের মধ্যে সম্পর্কটির চেহারা খানিকটা উল্টোনো ইংরেজি ইউ অক্ষরটির মতো। অর্থাৎ অসাম্য খুব কম থাকলে অগণতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উন্নিত হবার সম্ভাবনা কম আবার অসাম্য খুব বেশি থাকলেও অগণতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে পৌঁছনোটা শক্ত। অসাম্য মাঝামাঝি একটা জায়গায় থাকলে গণতন্ত্রায়নের সম্ভাবনাটা সব থেকে বেশি হবে। যখন অসাম্য খুব কম, নাগরিকদের সামাজিক আন্দোলনের পথে হাঁটবার তেমন চাড় নেই কারণ তাঁরা এমনিতে ভালই আছেন। এর উদাহরণ সিঙ্গাপুর, যেখানে এখনও গণতন্ত্র এল না, কিংবা দক্ষিণ কোরিয়া, যেখানে গণতন্ত্র খুব দেরিতে এসেছে। আবার যেখানে অসাম্য খুব বেশি, যেমন ল্যাটিন আমেরিকার এল সালভাডোর বা প্যারাগুয়েতে, সেখানে গণতন্ত্র এলে নগরপালদের এতটাই ত্যাগ করতে হবে যে তাঁরা সর্ব শক্তি দিয়ে গণতন্ত্রকে আটকে রাখছেন। মাঝামাঝি জায়গায়, এই জায়গাটা বেশ বিস্তৃত, অসাম্য এতটাই কম নয় যে নাগরিকদের দিক থেকে সামাজিক আন্দোলনের কোনও সম্ভাবনা নেই, আবার গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে নগরপালকরা এতটাই বেশি কিছু পাচ্ছেন না যাতে করে গণতন্ত্র এলে তাঁদের বিরাট একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। এই অবস্থায় নাগরিক ও নগরপালকদের মধ্যে একটা সামাজিক চুক্তি হিসেবে গণতন্ত্র আসবে এবং টিকেও থাকবে। ব্রিটেনে, যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা আর্জেন্টিনায় যেমন এসেছে এবং টিকে আছে। এই তত্ত্বের প্রচারকরা বলবেন, যে দেশে প্রভূত অসাম্য সেখানে সাধারণ নাগরিকদের দারিদ্র্য বেশি এবং সেখানেই অগণতন্ত্রের প্রাবল্য। এই অর্থে দারিদ্র্য এবং অগণতন্ত্রের মধ্যে একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে।

এই যুক্তি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না কারণ একথা জোর দিয়ে বলা চলে না যে, দারিদ্র্যের সঙ্গে অসাম্যের একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ মোটের ওপর গরিব দেশে বড়লোক দেশগুলির থেকে অসাম্য বেশি। টমাস পিকেটির সাম্প্রতিকতম গ্রন্থটি অপর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে উন্নত দেশগুলিতে আয় ও সম্পদের অসাম্য গরিব দেশগুলির থেকে কিছু কম নয় এবং সেই অসাম্য গত তিন সাড়ে তিন দশক ধরে বেড়েই চলেছে। তাহলে অসাম্য দিয়ে আমরা কেমন করে গরিব দেশের ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রগুলির কারণ ব্যাখ্যা করব?

অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্র, আইনি শাসন ও গণতন্ত্র

ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রের সঙ্গে দারিদ্র্যের যে সরাসরি যোগটা সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা যাচ্ছে, আমরা তার একটা স্বতন্ত্র ব্যাখা দেব। আমাদের ব্যাখ্যার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গরিব দেশের অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রে আইনি শাসনের অভাব। ব্যাপারটা খুলে বলি। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, উন্নত দেশগুলির তুলনায় গরিব দেশগুলোতে অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। অর্থাৎ গরিব দেশের মোট জাতীয় আয়ের অনেকটাই আসে তার অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে। আরও দরকারি কথা হল, গরিব দেশগুলিতে বিধিবদ্ধ শিল্প বা পরিষেবা ততটা পরিব্যপ্ত নয় বলে সেখানে কর্মসংস্থানের জন্য একটা বিরাট সংখ্যক মানুষকে অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। এক কথায় বলতে গেলে গরিব দেশগুলোতে অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের গুরুত্ব অসীম। এর সঙ্গে গণতন্ত্রের কী যোগ?

যোগটা কী আমরা অবশ্যই বলব, কিন্তু তারও আগে বলা দরকার আমরা অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্র বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছি। আমরা অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের কোনও গাণিতিক সংজ্ঞা দেব না। তার বদলে অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রকে এই বলে বর্ণনা করব যেখানে আইনের শাসন আলগা, যেখানে উৎপাদন হয় এমন সব ছোট-ছোট কারখানায় যেগুলির নাম সরকারি খাতায় নেই, যেগুলির বেশিরভাগ মালিকের বাসস্থানের একটা অংশে অবস্থিত, যেগুলি কর-টর বিশেষ দেয় না, দেশের শ্রম-আইনেরও ধার ধারে না। অনেক ক্ষেত্রে যে জমির ওপর বসে এরা ব্যবসা করে তাতে তাদের কোনও আইনি অধিকার নেই, যেমন শহরের রাস্তার হকার। আবার কখনও কখনও এই ক্ষেত্রের মানুষ জবরদখল করা জমিতে বসবাস করে, গ্রাম থেকে রোজ শহরে কাজে আসার

জন্য ট্রেনে চড়ে কিন্তু টিকিট কাটে না। অনেকেই গুন্ডা-বদমায়েশ-পেশিবাজদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। গরিব মানুষের কাছে আইনের সাহায্য নেওয়া এক মস্ত বিলাসিতা। এক কথায় বলতে গেলে, অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের মালিক-শ্রমিক, স্বনিযুক্ত কেউই পুরোপুরি আইনি শাসনের আওতায় নয়। আইন এদের শাস্তিও দেয় না, আবার রক্ষাও করে না।

কিন্তু যেহেতু দেশে আইন একটা আছে তাই সেই আইনের চোখে এরা অপরাধী, তা সে যত ছোটখাট অপরাধই হোক না কেন। এদের তাই একটা রক্ষাকবচ দরকার। আবার একই সঙ্গে সমাজবিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যেও এদের কারোর না কারোর ছাতার তলায় থাকা দরকার। গরিব দেশগুলোতে এই অসংখ্য নিরাপত্তাহীন অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের মানুষকে তাদের রাজনৈতিক আনুগত্যের বিনিময়ে রক্ষাকবচ যোগায় রাজনৈতিক দলগুলো। গরিব দেশের গণতন্ত্রের এটাই মূল রাজনীতি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই সমাজকে নাম দিয়েছেন রাজনৈতিক সমাজ, কারণ এই সমাজের মানুষকে কেবল বেঁচে থাকার জন্যই কোনও না কোনও রাজনৈতিক ছাতার তলায় আশ্রয় নিতে হয়।

রাজনৈতিক আনুগত্য মানে শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় ভোট দেওয়া নয়। যে রাজনৈতিক দলের ছাতা একজন অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের ভোটারকে আশ্রয় দিচ্ছে তাকে ভোটারটি ভোট তো দিচ্ছেই, তার ওপর সেই দলের হয়ে সে মিটিং মিছিলে যাচ্ছে, এমনকি ভোটের দিনে দরকার পড়লে নিজের পেশিশক্তি ধার দিচ্ছে, জাল ভোট দিতে সাহায্য করছে। পরিবর্তে রক্ষাকবচ ছাড়া এই ভোটার কিছু ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধেও পাচ্ছে, বিশেষ করে তার রক্ষাকর্তা দলটি যখন ক্ষমতায় থাকছে। প্রশ্ন হল, এর ফলে গণতন্ত্রের মান কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

খাতায় কলমে গণতন্ত্র নামক প্রতিষ্ঠানটির মূল আকর্ষণ এই কারণে যে, এই ব্যবস্থায় কোনও ক্ষমতাসীন সরকার অপটুভাবে দেশ চালালে পরবর্তী নির্বাচনে তার বদলে অন্য কাউকে নিয়ে আসা যায়। এক্ষেত্রে কিন্তু সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটাই গণতন্ত্র করতে পারছে না। যে রাজনীতির কথা বললাম সেখানে ভোটারদের একটা বড় অংশ সরকারের সার্বিক কাজ বিচার করে মোটেই ভোট দিচ্ছেন না, ভোট দিচ্ছেন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং লাভের আশায়। ফলে একটা বড় অংশ ভোটারের কাছে সরকারের সার্বিক কাজকর্মের মানটা একেবারেই গৌণ হয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্র যখন খারাপ কাজকর্মকে শাস্তি দিচ্ছে না তখন ক্ষমতাসীন সরকারের খেটেখুটে কাজ করার উৎসাহটাও চলে যাচ্ছে। কাজেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গণতন্ত্রের মান।

আরও একটা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গণতন্ত্রের মান। যেহেতু ক্ষমতায় থাকলে নিরাপত্তা দেবার কাজটা বেশি ভাল করে করা যায়, ছোট-খাট পাইয়ে দেবার কাজটাও, অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের ভোটাররা সেই দলকেই ভোট দিতে চাইবেন যার জেতার সম্ভাবনা বেশি, অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষ যাকে ভোট দিচ্ছেন। এর মানে হল, অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের ভোটারদের ভোট দেবার ব্যাপারটা বেজায় ছোঁয়াচে। ক্ষমতাসীন দলের প্রতি দলে দলে এঁরা আকৃষ্ট হন। ক্ষমতা বদল হলে আনুগত্য বদলাতেও এঁদের সময় লাগে না। যেহেতু বেশিরভাগ ভোটার ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থন করছে, তাই যে-কোনও নির্বাচনে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা বিশেষভাবে কমে যায়। ফলে ক্ষমতাসীন দলেরও ভাল কাজ দেখিয়ে পরবর্তী ভোটে জিতে আসার তাগিদটা থাকে না। নেমে যায় গণতন্ত্রের মান।

আমাদের তত্ত্বের সমর্থনে আমরা ৮২টি দেশের গণতন্ত্রের গড় সূচকের মান এবং সেই দেশগুলির জাতীয় আয়ে তাদের অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের অনুপাত তুলনা করে দেখেছি। গণতন্ত্রের সূচক নেওয়া হয়েছে 'গ্লোবাল ডেমক্রেসি
র‍্যাঙ্কিং, ২০১২' নামক রিপোর্ট থেকে। এই রিপোর্ট ফ্রিডম হাউস সহ আরও কয়েকটি প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। রিপোর্টে গণতন্ত্রের সূচক তৈরি করতে গিয়ে ২৫ শতাংশ জোর দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক অধিকারের ওপর এবং আরও ২৫ শতাংশ নাগরিক স্বাধীনতার ওপর। লিঙ্গ বৈষম্যের ওপর জোর পড়েছে ২৫ শতাংশ, ১০ শতাংশ পড়েছে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর, আরও ১০ শতাংশ

দুর্নীতি নিয়ে মানুষ কী ধারণা করছে তার ওপর এবং বাকি ৫ শতাংশ ওই দেশে শেষবার শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল কিনা তার ওপর। পক্ষান্তরে, দেশগুলির অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের অনুপাতের সংখ্যাগুলি নেওয়া হয়েছে বিশ্বব্যাঙ্কের একটি ২০১০ সালের রিপোর্ট থেকে। পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের অনুপাত যত বাড়ছে ততই কমছে গণতন্ত্রের মান। সংখ্যাতাত্ত্বিক কোরিলেশনের হিসেবে এই দুই-এর কোরিলেশন কোয়েফিসিয়েন্ট -০.৬৭। যেহেতু, গরিব দেশে অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের অনুপাত বড়লোক দেশের তুলনায় বেশি, আমরা অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের অনুপাতের মধ্য দিয়ে, বা আরও পরিষ্কার করে বললে, অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের রাজনীতির মধ্য দিয়ে, উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের মানের মধ্যে সম্পর্কের কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারছি।

উপসংহার

উপসংহারে দু'টো কথা বলব। এক, নিরাপত্তা ও সুবিধে দেবার রাজনীতিতে শুধু যে প্রাকৃতজনরাই সামিল হচ্ছেন তা নয়। তথাকথিত এলিট, যাঁদের ক্ষমতার লোভ আছে এবং যাঁরা সেই ক্ষমতা পাবার জন্য ক্ষমতাসীন দলের কথা অনুযায়ী যে-কোনও কাজ করে দিতে প্রস্তুত, তাঁরাও এই রাজনীতিতে অনায়াসে সামিল হয়ে যান। এর ফলে, যোগ্যরা তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী জায়গা পাননা, এবং আরও নেমে যায় গণতন্ত্রের মান। এতে অবশ্য ক্ষমতাসীন দলের কিছু যায় আসে না, কারণ, আগেই বলেছি, পরবর্তী নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা ক্ষমতাসীন দলের কাজকর্মের ওপর নির্ভর করে না। দুই, উপরে বর্ণিত রাজনৈতিক অবস্থায় ক্ষমতার পরিবর্তন বিরল হলেও অসম্ভব নয়। এর জন্য অবশ্য একটা বিরাট কোনও ঘটনা ঘটতে হবে, যেমন সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামে ঘটেছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় গরিব দেশটি একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী

অ্যাসিমোগ্লু, ড্যারেন ও জেমস রবিনসন, ২০০৬, ইকনমিক অরিজিনস অফ ডিকটেটরশিপ অ্যান্ড ডেমক্রেসি, কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস।

ব্যারো, রবার্ট, ১৯৯৯, দি ডিটারমিনেন্টস অফ ডেমক্রেসি, জারনাল অফ পলিটিকাল ইকনমি, ১০৭, পৃ এস ১৫৮- এস ১৮৩।

ডেমক্রেশি ইনডেক্স, ২০১২, দি ইকনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট।

দীক্ষিত, অবিনাশ ও জন লড্রিগান, ১৯৯৫, রিডিসট্রিবিউটিভ পলিটিক্স অ্যান্ড ইকনমিক এফিসিয়ান্সি, অ্যামেরিকান পলিটিকাল সায়েন্স রিভিউ, ৮৯, পৃ ৮৫৬-৮৬৬।

ডাউন্স, অ্যান্টনি, ১৯৫৭, অ্যান ইকনমিক থিয়োরি অফ ডেমক্রেসি, হারপার অ্যান্ড রো।

ফ্রিডম হাউস, www.fredomhouse.org

গ্রসম্যান, জিন ও এলহানন হেল্পম্যান, ১৯৯৬, ইলেক্টোরাল কম্পিটিশন অ্যান্ড স্পেশাল ইন্টারেস্ট পলিটিক্স, রিভিউ অফ ইকনমিক স্টাডিস, ৬৩, পৃ ২৬৫-৮৬।

লিন্ডবেক, আসার ও জরগেন ওয়াইবুল, ১৯৮৭, ব্যালেন্সড বাজেট রিডিস্ট্রিবিউশন অ্যাজ দি আউটকাম অফ পলিটিকাল কম্পিটিশন, পাবলিক চয়েস, ৫২, পৃ ২৭৩-২৯৭।

—, ১৯৯৩, এ মডেল অফ পলিটিকাল ইকুইলিব্রিয়াম ইন এ রেপ্রেসেন্টেটিভ ডেমক্রেসি, জার্নাল অফ পাবলিক ইকনমিক্স, ৫১, পৃ ১৯৫-২০৯।

লিপসেট, সেমোর, ১৯৫৯, সাম সোশাল প্রিরিকুইজিটস ফর ডেমক্রেসিঃ ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পলিটিকাল লেজিটিমেসি, অ্যামেরিকান পলিটিকাল সায়েন্স রিভিউ, ৫৩, পৃ ৬৯-১০৫।

প্রেজওরস্কি, অ্যাডম মাইকেল অ্যালভ্যারেজ, ফার্নান্ডো লিমঙ্গি ও হোসে চেইবাব, ২০০০, ডেমক্রেসি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস।

সরকার, অভিরূপ, ২০০৬, পলিটিকাল ইকনমি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল : এ পাজল অ্যান্ড এ হাইপথিসিস, ইকনমিক এন্ড পলিটিকাল উইকলি, জানুয়ারি, ২০০৬।

নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান ও তার পরিকাঠামো

এমন কিছু দরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে না দিলে গণতন্ত্রের মানকে ধরে রাখা যায় না। বস্তুত, এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনায়াসে গণতন্ত্রের চৌকিদার বলা চলে। 'চৌকিদার' কথাটা অবশ্য ইদানীং রাজনৈতিক তর্জায় ব্যবহৃত হতে হতে একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে। কিন্তু রাজনৈতিক তর্জার প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে, আগে প্রতিষ্ঠানের কথা বলি। প্রশ্ন, গণতন্ত্র ঠিকঠাক চালাতে গেলে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কেন দরকার?

আমাদের দেশে বা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে, একটা রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জিতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্ষমতায় আসে। সেই নির্দিষ্ট সময়টা পেরিয়ে গেলে ক্ষমতাসীন দলকে আবার নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হয়, মানুষের কাছে নিজেদের কাজকর্মের পরীক্ষা দিতে হয়। এটাই গণতন্ত্রের নিয়ম। এর ফলে, প্রত্যেক নির্বাচিত জন-প্রতিনিধির ওপর একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছু কাজ করে দেখানোর চাপ থাকে। নির্বাচিত থাকার সময় তিনি কী কী করলেন তার একটা বিশ্বাসযোগ্য তালিকা পরবর্তী নির্বাচনের আগে মানুষের সামনে তাঁকে খাড়া করতেই হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, একজন নির্বাচিত জন-প্রতিনিধির ভাবনা বা পরিকল্পনার পরিধিটা মূলত স্বল্প-মেয়াদি। দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার ফুরসত বা বিলাসিতা প্রায়শই তাঁর থাকে না।

এটা গণতন্ত্রের একটা মৌলিক সমস্যা। কারণ, বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দেশের স্বল্পমেয়াদি স্বার্থ আর দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যতের মধ্যে সংঘাত রয়েছে। দেখা যায়, একটা নীতি সাময়িকভাবে কিছু সমস্যার সমাধান করলেও পরে পাকাপাকিভাবে সেটা দেশের ক্ষতি করছে। একজন জন-প্রতিনিধিকে যদি অনেক দিনের জন্য নির্বাচিত করা যেত তাহলে হয়ত তিনি দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারতেন। কিন্তু জন-প্রতিনিধিরা অনেক দিনের জন্য নির্বাচিত হলে অন্য সমস্যা দেখা দিত। তখন তাঁদের কাজ করার তাগিদটাই চলে যেত, যেহেতু একবার নির্বাচনের বৈতরিণী পার হয়ে যেতে পারলে তাঁদের চট করে আর জনগনের কাছে পরীক্ষা দিতে হতো না। তাই চার-পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন হওয়াটা গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জরুরি। আবার স্বল্প দিনের জন্য নির্বাচিত হলে জন-প্রতিনিধিদের মধ্যে দূরদৃষ্টিহীনতার সম্ভাবনাটাও থেকে যাচ্ছে।

এই উভয়সঙ্কট থেকে রক্ষা পাবার জন্য সমাজে কিছু স্বাধীন, চিরন্তন এবং নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান থাকাটা দরকার, যে প্রতিষ্ঠানগুলি হবে মোটের ওপর রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, এবং রাজনৈতিক পালাবদল ঘটলেও যাদের অস্তিত্ব ও চরিত্র পাল্টাবে না। এই প্রতিষ্ঠানগুলিরই দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষা করার কথা। দরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকাটা ছোট নয়—সামরিক শক্তি, পুলিশ, আইনি ব্যবস্থা, প্রশাসন, ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারের তথ্য-পরিসংখ্যান বিভাগ, দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ক—সবই এই তালিকাভুক্ত। গণতন্ত্রের সাফল্য-অসাফল্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই মেনে নেন যে, উন্নত দেশগুলিতে গণতন্ত্রের প্রহরী এই প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত সজাগ ও সক্রিয় বলে সেসব দেশে গণতন্ত্রের মানও উন্নত। তুলনায় গরিব দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল, তাই সেখানকার গণতন্ত্রও নিম্নমানের।

সামরিক শক্তি, পুলিশ, আইনি ব্যবস্থা কিংবা প্রশাসনের নিরপেক্ষ থাকার প্রয়োজনীয়তাটা সকলেই বোঝেন, এ-নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু গণতন্ত্রের স্বার্থে কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তথ্য-পরিসংখ্যান কিংবা কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ককে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে, সেটা কিছুটা ব্যাখ্যা করে বলা দরকার। বিশেষ করে

এই কারণে যে, আমাদের দেশে কিছুদিন ধরেই এই প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ প্রভাব বিস্তার করছে।

গণতন্ত্রের মান একটা কাঙ্ক্ষিত স্তরে পাকাপাকিভাবে ধরে রাখতে গেলে মুক্ত, সংস্কারহীন ও অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বস্তুত অপরিসীম। যাঁরা ভোট দিয়ে জন-প্রতিনিধিদের নির্বাচন করবেন, দেশের ভালমন্দ নিয়ে তাঁদের দূরদৃষ্টি থাকাটা জরুরি, যে দূরদৃষ্টি একটা উদার শিক্ষার বাতাবরণেই তৈরি হতে পারে। আমাদের গরিব দেশে শিক্ষার দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্রের। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, গত চার-পাঁচ বছর যাবত শিক্ষায় কেন্দ্রিয় সরকারের বরাদ্দ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইতিহাস-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-দর্শন সব কিছু নিয়েই একটা অশিক্ষা মানুষের মনে চারিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে কেউ কেউ বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, বহুদিন আগেই ভারতবর্ষে এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল যেহেতু পুরাকালে রাবণরাজা পুষ্পক রথে চড়ে আকাশ পথে ভ্রমণ করতেন। কিংবা বহু যুগ আগেই ভারতবাসীরা প্লাস্টিক সার্জারির বিদ্যা জেনে ফেলেছিল যেহেতু শিবের প্রকোপে খসে যাওয়া গণেশের মুণ্ডের জায়গায় শিবেরই প্রসাদে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল হাতির মাথা। এইসব কারও কারও হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা গভীর উদ্বেগের। একটা অশিক্ষা থেকে জন্ম নিচ্ছে আরেকটা অশিক্ষা, সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধতা, ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদ। ভারতের ইতিহাস নিয়ে একটা মিথ্যা গরিমা তৈরি হচ্ছে যার থেকে শাসক দল তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সুবিধে পাচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি বিচারে এর ফল প্রকৃতই মারাত্মক।

আমাদের দ্বিতীয় আশঙ্কা সরকারি পরিসংখ্যান নিয়ে। ২০১৫ সালে যখন ২০১১-১২কে ভিত্তিবর্ষ ধরে জাতীয় আয়ের নতুন সিরিজ বেরোল, আর দেখা গেল নতুন সিরিজ অনুযায়ী ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার পুরোনো সিরিজের তুলনায় হঠাৎ লাফ দিয়ে অনেকখানি বেড়ে গেছে, তখন থেকেই সরকারি পরিসংখ্যান তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে শুরু করেছে। নতুন সিরিজ নিয়ে তার পর থেকে একটার পর একটা সমস্যা। যেমন, সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিকাল অর্গানাইজেশন সম্প্রতি জাতীয় আয়ের পরিমার্জিত যে হিসেব বার করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ২০১৬-১৭তে, অর্থাৎ নোট বাতিলের বছরে, জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার এক দশকের মধ্যে সব থেকে বেশি। উদ্দেশ্য এটাই বোঝানো যে, নোট বাতিলের ফলে ভারতীয় অর্থনীতির কোনও ক্ষতি হওয়া দূরের কথা, উল্টে বিস্তর উপকার হয়েছে। একই সঙ্গে কোনও পরিসংখ্যান সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে চেপে দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ, ন্যাশানাল স্যাম্পল সার্ভের ২০১৭-১৮ সালের জাতীয় কর্মসংস্থান সমীক্ষার রিপোর্ট। এই ধরনের সমীক্ষা এর আগে হয়েছিল ২০১১-১২ সালে। সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে যাওয়া খবরে প্রকাশ, ২০১৭-১৮ সালের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ২০১১-১২-র তুলনায় ২০১৭-১৮তে বেকারদের সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গেছে। বলাই বাহুল্য, ভোটের ঠিক আগে এই ধরনের তথ্য প্রকাশিত হলে ক্ষমতাসীন দল অস্বস্তিতে পড়ত। তাই এই রিপোর্টটি প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি, যদিও জাতীয় স্ট্যাটিস্টিকাল কমিশন আগেই একে প্রকাশের জন্য ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছিল। সরকারি পরিসংখ্যানের অপস্রিয়মাণ বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতিবাদে সম্প্রতি ১০৮ জন অর্থনীতিবিদ, সংখ্যাতত্ত্ববিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী একটি যৌথ বিবৃতিতে সাক্ষর করেছেন। এর উত্তরে সরকার পক্ষের ১৩১ জন চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সই দিয়ে জানিয়েছেন সরকারি পরিসংখ্যানে কোনও গলদ নেই, অর্থনীতিবিদদের বিবৃতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ভয় হয়, অচিরেই হয়ত দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের দিয়ে অর্থনীতি, সংখ্যাতত্ত্ব কিংবা সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতায় সরকারি হস্তক্ষেপের আর একটা উদাহরণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী। সরকার চেয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার ঋণনীতি শিথিল করুক, অনাদায়ী ঋণের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যাওয়া ব্যাঙ্কগুলির প্রতি আরও নরম মনোভাব দেখাক, তাদের আয়ের একটা বড় অংশ সরকারকে দিয়ে দিক, যাতে নির্বাচনের আগে অর্থনীতিটা চাঙ্গা হয় আর সরকারের হাতেও কিছু পয়সা আসে। দীর্ঘমেয়াদি কুফলের কথা ভেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর কোনওটাই করতে চায়নি। কিন্তু আমরা জানি, সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হার হয়েছে, সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দখল নিয়ে নিয়েছে। কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপের দীর্ঘমেয়াদি ফল যে ভাল হয় না সেটা তো নানা দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আগেই জানা ছিল।

আসল কথা হল, গণতন্ত্রে একটা নির্বাচিত সরকারের হাতে অসীম ক্ষমতা থাকে, সে চাইলে অনেক কিছুই করতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো করতে নেই। গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থেই করতে নেই। জানি না, বর্তমান সরকার সেকথা বোঝে কিনা। গত নির্বাচনের মরসুমে চৌকিদার চোর না সাধু তা নিয়ে খুব তর্জা চলছিল। আমরা সে তর্জায় ঢুকব না। শুধু ক্ষমতাধারীদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করব, চৌকিদারের ওপর চৌকিদারি করা যে প্রতিষ্ঠানগুলির মৌলিক দায়িত্ব, দয়া করে তাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিন।

(২)

ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, স্বাধীন ভারত নানা দিকে উন্নতি করলেও, আইনি পরিকাঠামোর দিক থেকে বিলক্ষণ পিছিয়ে আছে। এর ফলে শুধু যে সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার পেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে তাই নয়, আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য, যাকে অনেক রকম চুক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়, ক্রমাগত মার খেয়ে যাচ্ছে। চুক্তি থাকলে চুক্তি-খেলাপেরও সম্ভাবনা থাকে, আর চুক্তির খেলাপ ঘটলে আদালতই ভরসা। কিন্তু আদালতের কাজকর্ম যদি শ্লথগতি হয় তাহলে আদালতের সাহায্য নিয়ে চুক্তিভঙ্গকারিকে চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করানো বেশ সময় ও খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। এই ভবিষ্যৎ খরচের কথা মাথায় রেখে অনেক বিনিয়োগকারি, বিশেষ করে বিদেশি বিনিয়োগকারিরা, এদেশে বিনিয়োগ করতে দ্বিধা করেন। 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' বা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসা করতে পারার সুযোগের নিরিখে একেবারে লাস্ট বেঞ্চিতে বসে আছে আমাদের দেশ।

আইনি পরিকাঠামোর এই বেহাল অবস্থার কারণ কী? এটা পরিষ্কার যে, আদালতে যত মামলা রুজু করা হচ্ছে তার তুলনায় বিচারকের সংখ্যা কম। ফলে মামলার পর মামলা জমে যাচ্ছে, ন্যায়বিচার পেতে মানুষের দেরি হয়ে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, একদিকে যেমন প্রায় তিন কোটি মামলা বিচারের অপেক্ষায় দেশের বিভিন্ন আদালতে জমে রয়েছে, তেমনি অন্য দিকে ২১ হাজার বিচারক পদে আপাতত আসীন রয়েছেন ১৬ হাজার বিচারক। অর্থাৎ ৫ হাজার বিচারক পদ খালি পড়ে আছে। সুপ্রিম কোর্টের দু'টি সাম্প্রতিক রিপোর্ট জানাচ্ছে, দেশের আইনি ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে গেলে খালি পদগুলি ভর্তি করা ছাড়াও আরো অন্তত ১৫ হাজার বিচারক নিয়োগ করা দরকার। প্রতি ১০ লক্ষ দেশবাসীর জন্য দরকার অন্তত ৫০ জন বিচারক।

কিন্তু শুধু বিচারক বা আদালতের সংখ্যা বাড়ালেই কি আমাদের আইনি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে? বছরে কতদিন খোলা থাকে আদালত, কিংবা মামলা এজলাসে উঠলেও কতটা দ্রুততার সঙ্গে তার নিষ্পত্তি ঘটে, এসব প্রশ্নগুলো অবশ্যই জরুরি, কিন্তু আরো জরুরি আইনি ব্যবস্থার ভেতরে ঢুকে তার জটিলতাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা। এখানে একটা তুলনা এসে পড়ে। ভারতে যত জমি আছে তার মস্ত বড় অংশতে চাষবাস হয়। বস্তুত, পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই মোট জমির তুলনায় কর্ষিত জমির অনুপাত ভারতের মতো এতটা বেশি নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সমস্ত দেশবাসীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করতে পারি না কেন? পারি না তার কারণ, কৃষিতে আমাদের উৎপাদনশীলতা কম। অর্থাৎ দেশে খাদ্যাভাব দূর করতে গেলে, কর্ষিত জমির পরিমাণ বাড়ানোর থেকে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোটাই বেশি জরুরি। একই কথা কি আইনি অব্যবস্থার ব্যাপারেও প্রযোজ্য নয়? বিচারক বা আদালতের সংখ্যা বাড়ানোর তুলনায় বিচার ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দক্ষতা বাড়ানোটা কি কম জরুরি?

দেশে জনসংখ্যার তুলনায় কিংবা আদালতে জমে থাকা মামলার তুলনায় বিচারকের সংখ্যা কম কিনা, আর কম হলে কতটা কম এসব বোঝার জন্য একটা আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত দরকার। জানা দরকার, অন্যান্য দেশে এইসব অনুপাতগুলো কেমন। সম্প্রতি কেন্দ্রিয় আইন মন্ত্রক জানিয়েছে, আমাদের দেশে এখন প্রতি ১০ লক্ষ মানুষ পিছু ১৮ জন বিচারক আছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সূত্র থেকে জানতে পারছি, যুক্তরাষ্ট্রে

এই সংখ্যাটা ৭, সিঙ্গাপুরে ২১, জাপানে ২৯। অর্থাৎ এই উন্নত দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকায় মানুষ পিছু বিচারকের সংখ্যা ভারতের তুলনায় কম আর অন্যগুলোতে খানিকটা বেশি হলেও মারাত্মক রকমের বেশি নয়। আবার উল্টোদিকে ল্যাটিন আমেরিকার চিলিতে সংখ্যাটা ১০৪, ইকোয়েডরে ১০০, আফ্রিকার অনুন্নত দেশ বুরুন্ডিতে ৪৩, টোগোতে ৩৪। এর পাশাপাশি জার্মানি এবং ফ্রান্সে প্রতি ১০ লক্ষ মানুষের জন্য রয়েছেন যথাক্রমে ২৪৬ এবং ৯০ জন বিচারক। পরিসংখ্যানগুলি ২০১৫ সালের। সংখ্যাগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় উন্নয়ন কিংবা আইনি ব্যবস্থার দক্ষতার সঙ্গে জন-প্রতি বিচারকের সংখ্যার তেমন জোরালো কোনো সম্পর্ক নেই।

একই ধরনের গোলমেলে চিত্র দেখতে পাই বিচারক প্রতি জমে থাকা মামলার দিকে তাকালে। ভারতে এই মুহূর্তে বিচারক প্রতি জমে থাকা মামলার সংখ্যা ১৮৩। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব অধিকার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি জার্নালে ২০১৪ সালের একটি প্রবন্ধে লেখিকা মারিয়া ডাকোলিয়াস জানাচ্ছেন, চিলি ও ইকোয়েডরে বিচারক প্রতি জমে থাকা মামলার সংখ্যা যথাক্রমে ৮১৮৭ ও ৭৭৬৮। আবার জার্মানি, ফ্রান্স ও সিঙ্গাপুরে সংখ্যাগুলো ১০০, ৭৯ এবং ৫৬। অর্থাৎ এখানেও জন-প্রতি বিচারকের সংখ্যার সঙ্গে জমে থাকা মামলার তেমন একটা সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে না।

তাহলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হচ্ছে যে, শুধুমাত্র বিচারকের সংখ্যা দিয়ে একটা দেশের আইনি ব্যবস্থার উৎকর্ষ বা সীমাবদ্ধতার ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ইতিহাস, যার মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয় দেশের আইন, তাকে বুঝতে হবে। ভারত এর ব্যতিক্রম নয়। তাই ভারতীয় আইন ব্যবস্থার জটিলতাগুলোকে বুঝতে গেলে ব্রিটিশ আমলের ঔপনিবেশিক আইন বা তারও আগেকার হিন্দু এবং মুসলিম আইনগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর তীর্থঙ্কর রায় এবং উইলিয়ামস কলেজের আনন্দ স্বামী সম্প্রতি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের আইনি বির্বতন নিয়ে একটি চমৎকার গবেষণা গ্রন্থ লিখেছেন (ল অ্যান্ড দ্য ইকনমি ইন কলনিয়াল ইণ্ডিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ২০১৬)। ভারতীয় আদালতগুলির বর্তমান স্থবিরতা কতটা তাদের ঔপনিবেশিক অতীত দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, সেটাই লেখকদের গবেষণার বিষয়। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ঔপনিবেশিক ইতিহাস কেন গুরুত্বপূর্ণ তার একটা হদিশ লেখকরা দিয়েছেন। ইংরেজরা যখন প্রথম এদেশে আসে তখন ধর্মভিত্তিক কিছু আইন দেশে চালু ছিল। হিন্দুদের জন্য ছিল একরকম আইন, মুসলিমদের জন্য অন্য আর একরকম। তাছাড়া এক-একটা অঞ্চলে এক-এক ধরনের রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। প্রথা-রীতিনীতি-ধর্মকে একেবারে বাদ দিয়ে ব্রিটিশদের পক্ষে আইন প্রণয়ন সম্ভব ছিল না। আবার প্রশাসনের স্বার্থে কিছু নতুন আইনেরও প্রয়োজন ছিল। তাই আমাদের ঔপনিবেশিক প্রভুরা পুরোনো আইনগুলো মোটামুটি বজায় রেখে তার ওপরে যখন যেমন দরকার সেই মত ব্রিটিশ কমন ল-র কিছু কিছু অধ্যায় চাপিয়ে দিলেন। ফলে বিভিন্ন আইনের মধ্যে সামঞ্জস্য রইল না, কিছু ক্ষেত্রে স্ববিরোধ তৈরি হল, কোনও কোনও বিষয় চলে এল একাধিক আইনের আওতায় এবং এক-একটি প্রদেশ তাদের স্থানীয় রীতিনীতি অনুযায়ী এক-একরকম আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে থাকল। বাদী বা বিবাদীর কপালে, কোনো একটি আইনের কারণে নিম্ন আদালতে বিরূপ রায় জুটলে, তাঁরা অন্য কোনও আইনের আশ্রয় নিয়ে আবার লড়াই করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। আপিল করার প্রবণতা বাড়ল, আদালতে মামলা জমতে থাকল। অপরিকল্পিত এবং অসতর্ক আইন প্রণয়নের একটা উদাহরণ চুক্তি আইন, যার ওপর ব্যবসা বাণিজ্য অনেকটাই নির্ভর করে। চুক্তি আইনকে শুধু যে ১৮৭২ সালের ইন্ডিয়ান কন্ট্র্যাক্ট অ্যাক্ট-এর ছত্রছায়ায় আনা হল তাই নয়, চুক্তির ওপর সিভিল প্রসিডিয়োর, নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস, ল অন ওয়েজার অ্যান্ড গেম ইত্যাদি অন্য নানারকম আইন প্রয়োগের কারণে চুক্তি আইন ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল।

সনাতন রীতিনীতির ওপর বাইরে থেকে নতুন আইন চাপিয়ে দেবার ফল যে সব সময় ভাল হয় না তার প্রমাণ উনিশ শতকে পুনা ও আহমেদনগরের দাঙ্গা। ইংরেজরা আসার আগে, ভারতের অন্য অঞ্চলের মতো এখানেও কৃষকরা ঋণের জন্য স্থানীয় মহাজনের ওপর নির্ভর করত। মহাজন চড়া সুদ নিত নিশ্চয়, কিন্তু কোনও বছর ফসল খারাপ হলে ঋণ ফেরতের জন্য পরের বছর অব্দি অপেক্ষা করত। এতে মহাজন সুদটাও বেশি পেত আবার কৃষক মহাজনের কাছ থেকে একরকম বীমা ও নিরাপত্তা উপভোগ করত যার মূল্য বা প্রিমিয়াম চড়া সুদ। ইংরেজরা আসার পর ঋণদাতাদের দেওয়ানি আদালতে মামলা করে ঋণ ফেরত পাবার সুযোগ হল, ঋণদাতার সংখ্যা বাড়ল, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ল। কিন্তু কৃষক-মহাজনের ব্যক্তিগত সম্পর্কটা ভেঙে গেল আর যে নিরাপত্তাটা কৃষক উপভোগ করত সেটাও আর রইল না। ১৮৮৫ সালে বাজারে কৃষিপণ্যের দাম মারাত্মক পড়ে যাবার পর অসংখ্য কৃষক আইনের চোখে ঋণখেলাপি হয়ে গেল, তাদের নামে আদালতে মামলা রুজু হল, শেষে কৃষকদের অসন্তোষ একটা ভয়াবহ দাঙ্গার চেহারা নেয়।

ঔপনিবেশিক আইনের সব থেকে বড় সীমাবদ্ধতা ভূমি সংক্রান্ত আইন যার কুফল বর্তমানেও অনুভব করা যায়। ইংরেজদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভূমি থেকে রাজস্ব আদায় করা। এই লক্ষ্যে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য বিশেষ স্বচ্ছতা ও নির্মমতার সঙ্গে রাজস্ব জমা দেবার আইনটি তৈরি করা হয়েছিল। অর্থাৎ রাজস্ব জমা দেবার ব্যাপারে ভূস্বামীর দায়বদ্ধতা নিয়ে আইনে কোনো জটিলতা বা অস্পষ্টতা ছিল না। কিন্তু এর বেশি গভীরে ইংরেজরা ঢুকতে চায়নি। জমি সংক্রান্ত জটিলতাগুলো, বিশেষ করে জমির সত্ব ও উত্তরাধিকার নিয়ে, ভাগচাষির অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে কিংবা জমিদাররের সঙ্গে প্রজাদের বিরোধ নিয়ে নানা আইনি অস্পষ্টতা ঔপনিবেশিক আইনে থেকে গিয়েছিল যার প্রভাব থেকে ভারতীয় আইন আজও মুক্ত নয়।

ঔপনিবেশিক আইনের কুপ্রভাব থেকে ভারতীয় আইন ব্যবস্থা কীভাবে বেরিয়ে আসতে পারে সেটা আইনজ্ঞরা ঠিক করবেন। আমরা শুধু বলতে চাইছি, আইনি সংস্কার মানে শুধুমাত্র আদালত বা বিচারকের সংখ্যা বাড়ানো নয়, আইনের ভিতরে ঢুকে তাকে স্বচ্ছ, স্ববিরোধহীন, নির্ভার ও যুক্তিসঙ্গত করে তোলা। এমনটা ঘটলে আপনা থেকেই আদালতের গতি বেড়ে যাবে।

আর্থিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠান

গরিব দেশে কিছুই ঠিক মতো কাজ করে না। ব্যবসা করতে গেলে হাজার নিয়মের বেড়াজাল, চাকরির ইন্টারভিউ দেবার পর কাগজে নাম বেরোলেও স্থিরতা থাকে না শেষ অব্দি চাকরি হবে কিনা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য ধরতে হয় ইউনিয়নের দাদা, সরকারি অনুদান পেতে গেলে ঠিক জায়গায় কিছু অর্থব্যয় করতেই হয়, এমন কি গাড়ির ট্যাক্সো জমা দেবার মতো সামান্য কাজও দালাল ছাড়া হবার উপায় নেই। এসব নিয়ে সাধারণ মানুষ সরকারকে দোষ দেয়। কিন্তু ভোট হলে দেখা যায় হয় সেই সরকারই আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে অথবা নতুন যারা এসেছে তারাও ঠিক আগের মতোই অপদার্থ। আসলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যার প্রধানতম কাজ সরকারের মূল্যায়ন ও শুদ্ধিকরণ, ভাল সরকারকে পুরস্কার দেওয়া আর খারাপ সরকারকে ক্ষমতা থেকে তাড়ানো, সেটাই গরিব দেশে ভাল করে কাজ করে না।

গণতন্ত্র নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম গবেষকটি পর্যন্ত সকলেই একমত যে, বড়লোক দেশগুলিতে গণতন্ত্রের মান গরিব দেশগুলির তুলনায় ঢের বেশি। গণতন্ত্রের নানান সূচকের ওপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়েছে। দেখা হয়েছে, একটা দেশে কতটা স্বচ্ছভাবে নির্বাচন হচ্ছে, কত জন ভোট দিচ্ছেন, সংবাদ-মাধ্যম কতটা মুক্তভাবে কাজ করতে পারছে, দুর্নীতি কতটা, রাষ্ট্র কতটা নিরপেক্ষ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইসব মাপকাঠির ভিত্তিতে দেশগুলিকে নম্বর দিলে দেখা যাচ্ছে, যেসব দেশের মাথাপিছু আয় কম তারা সম্পন্ন দেশগুলোর তুলনায় ধারাবাহিকভাবে কম নম্বর পাচ্ছে।

একইভাবে দেখা যাচ্ছে, শাসনব্যবস্থার মানও গরিব দেশে তুলনামূলকভাবে খারাপ। শাসনব্যবস্থার পৃথিবীব্যাপী মান নিয়ে প্রতি বছর বিশ্বব্যাঙ্কের এক সংস্থা একটি রিপোর্ট বার করে। সেখানে ছ'টি আলাদা আলাদা মাপকাঠিতে একটি দেশের শাসনব্যবস্থার মান বিচার করা হয়। এই মাপকাঠিগুলি হল : নাগরিকদের বাকস্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও শান্তি, সরকারের কার্যকারিতা, সরকারি নিয়ন্ত্রণের মান, আইনের শাসন এবং দুর্নীতির অনুপস্থিতি। প্রতি বছর দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি মাপকাঠিতেই গরিব দেশগুলি স্বচ্ছল দেশগুলির তুলনায় পিছিয়ে আছে। এসব নিয়ে আরও সমীক্ষা আছে। সেসব সমীক্ষায় দেখা গেছে, শুধু গণতন্ত্র বা শাসনব্যবস্থার মান নয়, অন্য যে প্রতিষ্ঠান বা কাঠামোগুলোর ওপর নির্ভর করে স্বচ্ছল দেশগুলির সমাজ ও অর্থনীতি চলছে, যেমন নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা, খোলা বাজার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, শিক্ষা ও সম্পদের অধিকার, সামরিক শক্তির ওপর অসামরিক নিয়ন্ত্রণ, গরিব দেশে সেগুলিরও অভাব।

গণতন্ত্র সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আর্থিক উন্নয়নের কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, আর্থিক উন্নয়নই উন্নত প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার কারণ ও পূর্বশর্ত, আবার কারও কারও মতে প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নত বলেই একটা দেশে আর্থিক উন্নতি ঘটেছে। কেউ কেউ আবার মনে করেন, প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়নের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কটা উভগামী, অর্থাৎ উন্নত প্রতিষ্ঠান যেমন আর্থিক উন্নতির অনুঘটক, তেমনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল একটা পরিবেশে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সহজে গড়ে উঠতে পারে। কার্যকারণ সম্পর্ক যেমনই হোক, উন্নত প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক উন্নতি যে একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটা সকলেই মানছেন। ইংরেজ, স্প্যানিশ ও পর্তুগিজরা যখন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নতুন মহাদেশে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তখন তারা তাদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধগুলি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী তিন-চারশ' বছরে কেন উত্তর আমেরিকায় ক্রমশ একটা উন্নত

অর্থনীতির জন্ম হলো আর কেনই বা দক্ষিণ আমেরিকা আটকা পড়ে রইল একটা পিছিয়ে পড়া সমাজে, এর উত্তর পেতে গেলে দুই অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক ভিন্নতার দিকেই তাকাতে হবে।

কয়েক দশক হল, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি বলে অর্থশাস্ত্রের একটা শাখা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯৯৭ সালে তিন অর্থনীতিবিদ, রোনাল্ড কোস, ডগলাস নর্থ এবং অলিভার উইলিয়ামসন পত্তন করেন নতুন প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ। এঁদের মধ্যে রোনাল্ড কোস ১৯৯১ সালে এবং ডগলাস নর্থ ১৯৯৩ সালে, অর্থাৎ এই মঞ্চ তৈরি করার আগেই, নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। অলিভার উইলিয়ামসনও পরে, ২০০৯ সালে, নোবেল পান। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতির পরিবর্তন ও উত্তরণকে প্রাতিষ্ঠানিক বিবর্তনের চশমা দিয়ে দেখেন। তাঁরা মনে করেন, একটা দেশের আর্থিক উন্নতি বা স্থবিরতা অনেকাংশে নির্ভর করে সেই দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর।

ডগলাস নর্থ মারা গেলেন ২০১৫ সালে, পঁচানব্বই বছর বয়সে। দুই সহযোগী, জন ওয়ালিস ও ব্যারি ওয়াইনগাস্টকে সঙ্গে নিয়ে লেখা তাঁর শেষ বই, ভায়োলেন্স অ্যান্ড সোশাল অর্ডারস, ২০০৯ সালে প্রথম বেরিয়েছিল। পরে ২০১৩ সালে এর একটা বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণও বেরিয়েছে। গণতন্ত্র, আইনের শাসন ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলো স্বচ্ছল দেশগুলোতে কাজ করলেও কেন অনুন্নত দেশগুলোতে তেমন ভালভাবে করে না, সে-ব্যাপারে এই গ্রন্থে কিছু হদিশ দেওয়া হয়েছে।

অর্থনীতির মূল ভিত্তি রাজনীতি—এই অনুমান স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে নর্থ ও তাঁর সহযোগীরা আলোচনা শুরু করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে, একটা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোটা বুঝতে গেলে আগে সে-দেশের রাজনীতিটা বুঝতে হবে। সব দেশেই রাজনীতির উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল, কিন্তু ক্ষমতা দখলের প্রণালীটা এক-এক দেশে এক-এক রকম। এই প্রণালীর ওপর নির্ভর করে লেখকরা দু'ধরনের সমাজকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম ধরনের সমাজে নাগরিকদের জন্য সব দরজাগুলো খোলা থাকে, যে কোন আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপে সমস্ত নাগরিকের মুক্ত প্রবেশাধিকার থাকে। তাঁরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, রাজনীতি সব কিছুতেই অবাধে অংশ নিতে পারেন। নর্থ ও তাঁর সহযোগীরা একে বলছেন ওপেন অ্যাক্সেস সোসায়টি; আমরা একে মুক্ত সমাজ বলব। অন্য ধরনের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ ও সিদ্ধান্তের অধিকার শুধুমাত্র কতিপয় অভিজাত নাগরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাকিরা অভিজাতদের তল্পিবাহক, অভিজাতদের জীবনযাপন মসৃণ করাই এদের কাজ, কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা অথবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এদের নেই। লেখকরা এই সমাজের নাম দিয়েছেন রেস্ট্রিক্টেড অ্যাক্সেস সোসায়টি; আমরা বলছি, বদ্ধ সমাজ। লেখকরা মনে করিয়ে দিয়েছেন, মানব সভ্যতার দশ হাজার বছরের ইতিহাসের আটানব্বই শতাংশতেই পৃথিবী জুড়ে বদ্ধ সমাজ বিরাজমান ছিল এবং এখনও পৃথিবীর পঁচাশি শতাংশ দেশে এই বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থাই কায়েম আছে। বদ্ধ সমাজ থেকে মুক্ত সমাজে উত্তরণকেই উন্নয়ন বলা হচ্ছে।

লেখকদের মতে, মুক্ত সমাজে ক্ষমতা দখল কিংবা ক্ষমতার পরিবর্তন হয় অবাধ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যবর্তিতায়। এই প্রতিযোগিতায় যে-কোনও নাগরিকই অংশ নিতে পারেন। পাকাপাকিভাবে কোনও ব্যক্তি বা পরিবার ক্ষমতায় আসে না, ফলে ক্ষমতায় থাকা অভিজাতদের দলটি ক্রমাগত বদলায়। পক্ষান্তরে, বদ্ধ সমাজে ক্ষমতার উৎস বাহুবল। বাহুবল সকলের থাকে না, যে অল্প কয়েকজনের থাকে তারা তার সাহায্যেই সমাজে তাদের একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধেগুলো ধরে রাখে। এই সুযোগ-সুবিধেগুলো আবার পরিবারের মধ্যে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হয়। বদ্ধ সমাজে যাদেরই বাহুবল আছে তারাই অভিজাত, তবে সব অভিজাত ক্ষমতায় থাকতে পারে না। কিন্তু যারা ক্ষমতায় নেই তারা ক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্যে ক্ষমতাধারীদের আক্রমণ করার শক্তি রাখে। সেরকম কোনও সংঘর্ষ ঘটলে যারা ক্ষমতায় আছে এবং যারা ক্ষমতায় নেই দু'দলেরই ক্ষতি। তাই সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য ক্ষমতায় থাকা এবং না থাকাদের মধ্যে একটা অলিখিত বোঝাপড়া দেখা যায়। এই বোঝাপড়া অনুযায়ী ক্ষমতাধারী অভিজাতরা ক্ষমতায় না থাকা

অভিজাতদের সঙ্গে একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধেগুলো, বলা যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাজনাগুলো, ভাগ করে নেয়। কখনও কখনও আবার এই অলিখিত জোট ভেঙে যায়, তখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। অন্য সময়, ওপর ওপর একটা শান্তি বজায় থাকে বটে, কিন্তু সেই শান্তির আড়ালে প্রতিনিয়ত জেগে থাকে হিংসার সম্ভাবনা।

বদ্ধ সমাজের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এই সমাজের সম্পর্কগুলি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিনির্ভর। বদ্ধ সমাজের একজন নাগরিক সামাজিক সোপান বেয়ে কতটা উন্নতি করতে পারবে সেটা বহুলাংশে নির্ভর করে তার সামাজিক স্থানাঙ্কের ওপর, এবং ক্ষমতার অলিন্দে যারা আছে তাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির ওপর। একই ভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির গুরুত্বও ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্কের ওপর নির্ভর করে।

ব্যক্তিনির্ভর সমাজের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্মণ আছে। প্রথমত, এখানে রাজনৈতিক মুরুব্বি না ধরলে সামাজিক সোপান বেয়ে ওঠা যায় না। বস্তুত, কোনও শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ছাতার তলায় আশ্রয় না নিলে বহু সাধারণ মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ক্ষমতাবানেরা ক্ষমতায় টিকে থাকে মূলত রাজনৈতিক প্রসাদ বিতরণ বা রাজনৈতিক আশ্রয়দানের মধ্যবর্তিতায়। রাজনৈতিক প্রসাদ বিতরণ করতে গিয়ে রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠানগুলি নিরপেক্ষতা হারায়, স্বজনপোষণের যন্ত্র হয়ে ওঠে। এর ফলে দক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তি তার যোগ্যতার মূল্য পায় না, গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অযোগ্য লোকে ভরে যায়, ব্যহত হয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীনির্ভর সমাজে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি খুব বেশিদিন টিকতে পারে না। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষমতা হারালে, তার পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট প্রতিষ্ঠানটিও প্রাসঙ্গিকতা হারায়। আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্থায়িত্ব না থাকলে কিংবা তাদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে নাগরিকদের সংশয় থাকলে, যে-কোনও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লেনদেনে অনিশ্চয়তা বাড়ে, ফলে লেনদেনগুলোই বহু ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না। মানুষ স্বল্পমেয়াদে চিন্তা করে, স্বল্পমেয়াদে চুক্তি করে। আর্থিক উন্নতির শর্ত যে-দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, সেটাই প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তৃতীয়ত, যেহেতু বদ্ধ সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি হিংসা, তাই এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা ও ধরে রাখার প্রধান হাতিয়ার হল সামরিক শক্তি। ফলে কখনও কখনও দেখা যায়, সামরিক শক্তিই রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সামরিক প্রধানই হয়ে উঠেছেন রাজনৈতিক প্রধান। সামরিক প্রধান রাজনৈতিক প্রধান হয়ে উঠলে, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর জবাবদিহি করার দায় থাকে না। দেশ অবাধ দুর্নীতি ও স্বজনপোষণে ভরে ওঠে। মাঝে-মধ্যে সাধারণ নির্বাচন হয় বটে, কিন্তু সেসব নেহাতই লোক দেখানো ব্যাপার।

নর্থ ও তাঁর সহযোগীদের মতে, মুক্ত সমাজের লক্ষ্মণগুলো ঠিক এর বিপরীত। এখানে প্রতিষ্ঠানগুলি নৈর্ব্যক্তিক, স্বাধীন এবং মোটের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত। ফলে এই সমাজে মেধা, যোগ্যতা ও পরিশ্রম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। প্রতিযোগিতা এই সমাজের মূল ভিত্তি। তাছাড়া এই সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত বলে রাজনীতিতে পালাবদল ঘটলেও কোনও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব-সংকট ঘটে না। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় আর্থিক বিনিময় সহজতর হয়, দেশে সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতা বজায় থাকে। আবার বাইরে থেকে কখনও কোনও বিরূপ আঘাত এলেও সমাজ ভেঙে পড়ে না, তার দীর্ঘমেয়াদি প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর ভর করে ফের উঠে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে সামরিক শক্তির ওপর সদা সতর্ক অসামরিক নিয়ন্ত্রণ জীবনযাপনকে শান্তিপূর্ণ ও নিরুদ্বেগ রাখে।

সামাজিক এই শ্রেণিবিভাগের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। নর্থ ও তাঁর সহযোগীরা বলছেন, বদ্ধ সমাজে স্বাধীন, নৈর্ব্যক্তিক কোনও প্রতিষ্ঠান বাঁচতে পারে না। তাই যেসব প্রতিষ্ঠান মুক্ত সমাজে বহুদিন রয়েছে এবং চমৎকার কাজ করছে সেগুলোকে রাতারাতি কোনও বদ্ধ সমাজে এনে বসিয়ে দিলে কিছুদিন পরেই দেখা

যাবে তারা নষ্ট হয়ে গেছে, যে ফল তারা মুক্ত সমাজে দিতে পারে তার একটা বিকৃত, দূষিত রূপ বদ্ধ সমাজে দেখা যাচ্ছে। এই শিকড় উপড়ে আনা ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানগুলির অনেক উদাহরণ ইতিহাসে আছে। ঘটা করে ভেঙে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রৈকা হল, পশ্চিমি গণতন্ত্রকে শিকড় সুদ্ধু তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হল ভূতপূর্ব সমাজতন্ত্রের মাটিতে। কিন্তু সেই মাটি গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে আবার সেই কেজিবি-শাসিত দিনগুলি ফিরে এসেছে। নির্বাচন যেটা হচ্ছে সেটা প্রহসন মাত্র। একই করুণ অভিজ্ঞতা সম্প্রতি ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মার্কিনিদের হয়েছে। তাই আপাত দৃষ্টিতে গত বিশ-পঁচিশ বছর পৃথিবী জুড়ে গণতন্ত্রের একটা ঢেউ এলেও, অর্থাৎ অনেক নতুন নতুন দেশ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনে উদ্যোগী হলেও, বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে প্রকৃত গণতন্ত্রের তেমন একটা প্রসার ঘটেনি। নর্থ ও তাঁর সহযোগীরা বলবেন, এর মূল কারণ বেশিরভাগ দেশে এখনও গণতন্ত্রের জন্য দরকারি জমিটাই তৈরি হয়নি।

একই ভাবে, ওপর থেকে মুক্ত প্রতিযোগিতা বদ্ধ সমাজের ওপর চাপিয়ে দিয়ে দেখা গেছে একটা আধাখেঁচড়া বাজার অর্থনীতি তৈরি হয়েছে যেখানে তলায় তলায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীদের খাজনা আদায়, রাজনীতিপুষ্ট সিন্ডিকেটদের অত্যাচার সবই রয়ে গেছে। ভারত সহ আরও অনেক উন্নতিশীল দেশ এই ধরনের চাপিয়ে দেওয়া এবং মাঝপথে হারিয়ে যাওয়া আর্থিক সংস্কারের সাক্ষী। নর্থ ও তাঁর সহযোগীরা বলছেন, এইসব সংস্কারের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করার আগে বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাদের খতিয়ে দেখা উচিত ছিল যেখানে আর্থিক সংস্কার করা হচ্ছে সেখানকার সমাজ আর্থিক সংস্কারের উপযুক্ত হয়েছে কিনা।

গণতন্ত্র বা মুক্ত প্রতিযোগিতা ঠিকঠাক কাজ করার জন্য সবার আগে দরকার নিরপেক্ষ ও স্বাধীন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যা রাজনীতির পট পরিবর্তন হলেও টিকে থাকবে। আর দরকার সামরিক শক্তির ওপর অসামরিক নিয়ন্ত্রণ। সৌভাগ্যবশত, আমাদের দেশে দ্বিতীয়টি জন্মলগ্ন থেকেই আছে। কিন্তু প্রথমটির অভাব বারবার অনুভূত হয়। যে দল ক্ষমতায় থাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে সে তার পছন্দের লোকেদের বসিয়ে সমাজ ও নাগরিকদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। বহুক্ষেত্রে মেধা তার যোগ্য মর্যাদা পায় না। দেশ জুড়ে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার একটা উদাহরণ। আমলাতন্ত্রের রাজনীতিকরণ আর একটা।

নর্থ-ওয়ালিস-ওয়াইনগাস্ট-এর এই গবেষণা গ্রন্থটি মানুষের লিপিবদ্ধ ইতিহাসকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এই ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণের মুন্সিয়ানা সবই প্রচুর পরিমাণে আছে, তবু শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনে কয়েকটা মৌলিক প্রশ্ন থেকে যায়। পশ্চিম ইয়োরোপ, উত্তর আমেরিকা বা দূর প্রাচ্যের যে দেশগুলিকে মুক্ত সমাজের আওতায় আনা হচ্ছে, লেখকদের বর্ণনা পড়ে ভ্রম হতে পারে সেগুলি রামরাজ্য। সেখানে যেন দুর্নীতি নেই, স্বজনপোষণ নেই, ক্ষমতাবানদের মধ্যে সমাজ থেকে খাজনা আদায়ের প্রবণতা নেই। কথাটা ঠিক নয়। আজ পর্যন্ত বহু দৈত্যাকার কেলেঙ্কারি উৎঘাটিত হয়েছে যার উৎস তথাকথিত মুক্ত সমাজ। বস্তুত, ওলসন, টুলক, বুখানন ইত্যাদি অর্থনীতিবিদরা পশ্চিমের গণতন্ত্রে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষি দল ও তাদের খাজনা-লোভী মনবৃত্তির দাপট যথেষ্ট পরিমাণেই দেখতে পেয়েছেন। তাছাড়া গত শতাব্দীতে দু'-দু'টি রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপ ও দূর প্রাচ্যের মুক্ত সমাজ। অতএব এখানে হিংসা নেই এটা বলা যাবে না। নর্থরা অবশ্য বলবেন, এসব সত্ত্বেও মুক্ত সমাজে মোটের ওপর একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়া বজায় আছে যেটা বদ্ধ সমাজে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু গরিব দেশেও যে দু'চারটে স্বাধীন, রাজনীতির প্রভাবমুক্ত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান চোখে পড়ে না এমন নয়। নর্থ ও তাঁর সহযোগীরা বলছেন, বদ্ধ সমাজের নানা স্তর আছে। এক প্রান্তে যেমন রয়েছে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রিকার কোনও দেশ যেখানে সামরিক বলই একমাত্র শক্তি, যেখানে বাহুবলের সাহায্যে ঘন ঘন সরকার পালটায়, যেখানে অভিজাতদের জীবনযাপন লজ্জাজনকভাবে বিলাসবহুল অথচ দেশের অধিকাংশ মানুষ দু'বেলা

দু'মুঠো খেতে পায় না। এসব দেশে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রায় চোখেই পড়বে না। আবার অন্য প্রান্তে রয়েছে মেক্সিকো বা আর্জেন্টিনার মতো দেশ, যারা মুক্ত সমাজের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে, যেখানে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান অবশ্যই বেশ কিছু দেখতে পাওয়া যাবে। আমাদের মনে হয়, যদি পৃথিবীর দেশগুলোকে মুক্ত সমাজ ও বদ্ধ সমাজ এই দুই আঁটোসাঁটো কৌটোয় ভাগ না করে বলা হত, পৃথিবীর সব দেশেই একটা মুক্ত সমাজ একটা বদ্ধ সমাজের পাশাপাশি যুগপৎ অবস্থান করে, তাহলে ভালো হতো। বলাই বাহুল্য, উন্নত দেশগুলোতে মুক্ত সমাজের অংশটা বদ্ধ সমাজের তুলনায় অনেক বড়, পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতে এর ঠিক উল্টো। আর উন্নয়নের লক্ষ্য হল, সমাজের মুক্ত অংশটাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া।

দু'একটা দরকারি প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পেলাম না। বদ্ধ থেকে মুক্ত সমাজে যাওয়াটা কি নিছকই একটা কাকতালীয় নাকি অবশ্যম্ভাবী বিবর্তন? এই যাওয়ার কি কোনও সহজ পন্থা আছে?

ধর্ম ও জাতপাতের রাজনীতি, অর্থনীতি

সারা পৃথিবী জুড়ে অন্তঃরাষ্ট্রীয় হানাহানি বেড়ে চলেছে। ইন্সটিটিউট অফ ইকনমিক্স অ্যান্ড পিস নামক একটি সংস্থা বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সংঘাত নিয়ে গবেষণা করে। পৃথিবীর দেশগুলিকে তাদের অভ্যন্তরীণ শান্তির ক্রম অনুযায়ী চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি প্রতি বছর প্রকাশ করে গ্লোবাল পিস ইন্ডেক্স বা বিশ্ব শান্তি সূচক। সংস্থাটি জানাচ্ছে ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাপী হানাহানির ফলে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ১৩.৩ শতাংশ নষ্ট হয়েছে। নষ্ট হওয়া উৎপাদনের পরিমাণ সেই বছর সারা পৃথিবীর মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ১১ গুণ। আর ২০১৪-১৫তে অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ফলে সারা পৃথিবীতে প্রাণ হারিয়েছেন তিন লক্ষ মানুষ। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৬ সালে অভ্যন্তরীণ শান্তির নিরিখে ভারতের অবস্থান ছিল ১৬৩টি দেশের মধ্যে ১৪১তম। আরও লক্ষণীয় যে, গত আট বছরে বিশ্ব শান্তি সূচক অনুযায়ী আমাদের ধারাবাহিক অবনতি ঘটেছে। ২০০৮ সালে ভারতের অবস্থান ছিল ১২৩ নম্বরে।

কার্ল মার্ক্স ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, মনুষ্য সমাজে সংঘাতের ভিত্তি হবে অর্থনৈতিক। যাদের আছে আর যাদের নেই মূলত এই দুই দলের মধ্যেই সংঘাত ঘটবে। মার্ক্স-এর সেই ভবিষ্যৎবাণী খাটেনি। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী হানাহানির পেছনে অর্থনৈতিক বৈষম্য নয়, ধর্মীয় ভেদাভেদের ভূমিকা সব থেকে বেশি। ইন্সটিটিউট অফ ইকনমিক্স অ্যান্ড পিস-এর অন্য একটি রিপোর্ট থেকে জানতে পারছি, ২০১৩ সালে সারা পৃথিবীতে যত অন্তঃরাষ্ট্রীয় সশস্ত্র সঙ্ঘাত ঘটেছে তার ৬০ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে ধর্ম অন্যতম কারণ। ধর্মীয় কারণে হানাহানির ব্যাপারে ভারত আবার অন্য অনেক অশান্ত দেশের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে যে অতি সম্প্রতি একটা হিন্দুত্বের অভ্যুত্থান ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কিছুদিন আগেও উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিজেপির ক্ষমতা প্রসারিত ছিল। দেশের ১৩টি রাজ্যে ছিল সরাসরি বিজেপি শাসন, আরও চারটি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতাসীন দলের শরিক। ভারতের মানচিত্রে বিজেপি শাসিত অঞ্চলগুলিকে গেরুয়া রঙে চিহ্নিত করলে দেখা যেত ভারতীয় ভূখন্ডের সিংহভাগ গৈরিক। এ-ছাড়া কেন্দ্রের ক্ষমতা তো ছিলই, যা এখনও রয়েছে। যেহেতু বিজেপির মূল শক্তি তার সংগঠন আর এই সংগঠন দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন একটা মতাদর্শের ওপর যাকে হিন্দুত্ব ছাড়া আর কিছু ভাবা শক্ত, তাই বিজেপির ক্রম-বর্দ্ধমান রাজনৈতিক আধিপত্যকে হিন্দুত্বের উত্থান হিসেবেই দেখতে হবে।

ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুত্বের অস্তিত্ব অনেকদিন ধরেই ছিল, কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা আগে কখনও এতটা প্রভাব বিস্তার করেনি। স্বাধীনতোত্তর ভারতে বহুদিন পর্যন্ত রাজত্ব করে গেছে কংগ্রেসের মত একটা মধ্যপন্থী দল। কংগ্রেসি মধ্যপন্থার প্রতিস্পর্ধী হিসেবে বহু চরমপন্থী দলের আবির্ভাব হয়েছে বটে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দলগুলি হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা নিজেদের চরমপন্থী অবস্থান থেকে ক্রমশ মধ্যপন্থার দিকে সরে এসেছে। রামরাজ্য পরিষদ, হিন্দু মহাসভা কিংবা জনসঙ্ঘ-এর মতো হিন্দুত্ববাদী দলগুলি আর নেই। অল ইন্ডিয়া শিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন বিলুপ্ত। ডিএমকে বা আকালি দলের মতো পার্টিগুলি তাদের অতীতের বিচ্ছিন্নতাবাদী অবস্থান থেকে অনেকটাই মধ্যপন্থার দিকে সরে এসেছে। একইভাবে সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজবাদী পার্টি বা জনতা দল, যারা একসময় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়া নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমানদের একত্রিত করেছিল, তারাও ধীরে ধীরে মধ্যপন্থার দিকে তাদের অবস্থান বদলেছে। এমনকি বিজেপি, রাম জন্মভূমির রাজনীতি করে প্রথম দফায় ক্ষমতায় আসার পর, তাদের হিন্দুত্বের কর্মসূচিগুলি

রূপায়ণ করার ব্যাপারে তেমন একটা উৎসাহ দেখায়নি। এতদিন ধরে যে ভারতীয় দলগুলি একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এসেছে তার কারণ আছে।

মূল কারণ, ভারতীয় সমাজের বহুত্ব ও বহুমাত্রিকতা। ভারতীয় সমাজে নানাবিধ বিভাজক। ধর্ম একটি বিভাজক, ভাষা আর একটি, জাত আরেক বিভাজক, শ্রেণি আরেক। এই বহু বিভাজকের প্রভাবে ভারতীয় সমাজ বহুমাত্রিক। আবার প্রত্যেকটি বিভাজকের মধ্যে রয়েছে বহুত্ব। ধর্ম নামক বিভাজকের ভিতরে রয়েছে নানা ধর্ম, ভাষার মধ্যে নানা ভাষা, জাতির মধ্যে নানা জাতি। তাই ভারতীয় সমাজে পাকাপাকিভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে কিছু নেই। ধর্মের নিরিখে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ আছে। কোনও দল হিন্দুত্বের পাটাতনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের একত্র করতে গেলে প্রতিস্পর্ধী অন্য কেউ শুধুমাত্র নিম্নবর্গীয়দের সমর্থনে অন্য একটি দল তৈরি করে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ফাটল ধরাতে পারে। আবার কেউ শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলন করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করতে গেলে হয়ত ভাষাভিত্তিক কোনও আন্দোলন, যা নানা শ্রেণির মানুষকে এক মঞ্চে নিয়ে আসছে, শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলনের ভিতটা দুর্বল করে দেবে। ফলে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে সব দলকেই এমন একটা বৃহৎ ছাতা তৈরি করতে হয়েছে যার নিচে নানা পরিচয়ের মানুষ আশ্রয় নিতে পারে। অর্থাৎ সংকীর্ণ চরমপন্থার থেকে ক্রমশ উদার মধ্যপন্থার দিকে, সবাইকে নিয়ে চলার দিকে, রাজনৈতিক দলগুলিকে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের বহুত্ব ও বহুমাত্রিকতা। এখানেই ধাঁধা। কেমন করে এই বহুমাত্রিক ভারতীয় সমাজে হিন্দু চরমপন্থীদের অভ্যুত্থান ঘটল?

হিন্দুত্বের অভ্যুত্থানের ব্যাপারে একটা ধারণা জনমানসে চালু আছে। ধারণাটিকে বিজেপিও সমর্থন করে। ধারণাটি এই যে, তথাকথিত ধর্মনিমরপেক্ষ দলগুলি, শুধুমাত্র ভোট নিশ্চিত করার জন্য, ধারাবাহিকভাবে সংখ্যালঘুদের তোষণ করে গেছে। হিন্দু ধর্ম সহিষ্ণুতা শেখায়, তাই বহুদিন অব্দি হিন্দুরা এই তোষণ সহ্য করেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সমস্ত সহ্যের বাঁধ ভাঙছে এবং প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিন্দুত্বের উত্থান ঘটেছে। ধারণাটা ভাল করে বিচার করা দরকার।

প্রশ্ন হল, যদি সত্যি সত্যি বহু দিন ধরে সংখ্যালঘুদের তোষণ করা হয়ে থাকে, তাহলে তুলনামূলকভাবে সংখ্যালঘুদের অবস্থার উন্নতি হয় না কেন? সাচার কমিটির রিপোর্ট জানাচ্ছে, বর্ণ হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের শিক্ষার হার কম, সরকারি চাকরিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব নেহাতই সামান্য, হিন্দু-প্রধান গ্রামগুলির তুলনায় মুসলমান-প্রধান গ্রামগুলির পরিকাঠামো অনেক খারাপ। এছাড়াও আমরা জানি, উচ্চশিক্ষায় মুসলমানদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো, সুযোগ-সুবিধের অভাবে তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা অনেক বেশি, কলকাতার মতো 'উদারমনস্ক' শহরেও একটি মুসলমান পরিবারের পক্ষে দু'একটি বিশেষ অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও বাড়ি ভাড়া পাওয়া শক্ত। অর্থাৎ মুসলমানদের সমস্ত অর্থেই প্রান্তিক বলা চলে, বস্তুত তফসিলি জাতির মানুষদের কাছাকাছি তাদের মাথাপিছু ব্যয়। অথচ নিম্নবর্ণের প্রান্তিক হিন্দুদের মতো ইস্কুলে-কলেজে, সরকারি চাকরিতে কোনও বাড়তি সুবিধে তাঁরা পান না। তাহলে মুসলমান তোষণ হল কোথায়? আরও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, এই প্রান্তিক, ক্ষমতাহীন সংখ্যালঘুদের ভয়ে বা বিরোধিতায় হিন্দুরা জোটবদ্ধ হবে কেন?

আমাদের মতে, হিন্দুত্বের অভ্যুত্থান ঘটছে দুটি প্রধান কারণে, যার একটি অভ্যন্তরীণ, অন্যটি আন্তর্জাতিক। হিন্দুত্বের পাটাতনে যে বহুদিন অব্দি সমস্ত হিন্দু ভোটারদের একত্রিত করা যায়নি তার বড় কারণ নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা দেখেছিল আলাদা করে নিজেদের সংগঠিত করতে পারলে তাদের লাভ আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাতার নীচে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সেই লাভ তারা দফায় দফায় আদায়ও করে নিয়েছে। এখন যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদের অধিকারগুলি স্বীকৃত, তাই নিম্নবর্গীয় হিসেবে রাজনৈতিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাড়তি কোনও লাভ তাদের নেই বললেই চলে। কাজেই বিজেপি যখন একটু একটু করে বৃহৎ হিন্দুত্বের ছাতার

তলায় তাদের নিয়ে আসার চেষ্টা করছে তখন পুরোনো সংকীর্ণ আত্মপরিচয় ছেড়ে বৃহত্তর হিন্দুত্বের আত্মপরিচয় গ্রহণ করতে আর তাদের বাধা নেই।

আন্তর্জাতিক কারণটা অবশ্য আরও জোরালো। বেশ কিছুদিন হলো দুর্বৃত্তরা সারা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এরা কাপুরুষ কারণ মূলত নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের ওপরেই এরা আক্রমণ চালায়। দুর্ভাগ্যবশত, এরা নিজেদের মুসলিম চরমপন্থী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে যদিও ইসলামের মানবিকতা এদের মধ্যে নেই। এদের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইয়োরোপে ও আমেরিকায় এখন প্রতিস্পর্ধী, জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয় ও বর্ণবিদ্বেষী চরমপন্থীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বলা দরকার, ইসলামীয় চরমপন্থাও একটা প্রতিক্রিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘ দিনের মার্কিনি অত্যাচার ও দাদাগিরির প্রতিক্রিয়া। এই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়ার ঢেউ থেকে ভারতও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। ভারতীয় পার্লামেন্ট আক্রমণ, দেশ জুড়ে অসংখ্য জঙ্গী হানা, মৃত্যুর মিছিল এইসবের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুত্বের অভ্যুত্থান ঘটেছে। আবার উল্টোদিকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস কিংবা গুজরাত দাঙ্গার মতো ঘটনা মুসলিম চরমপন্থীদের ইন্ধন জুগিয়েছে। একটা মৌলবাদ থেকে জন্ম নিয়েছে আর একটা মৌলবাদ। যে বহুত্ব ও বহুমাত্রিকতা ভারতীয় মূলস্রোতের রাজনীতিকে মধ্যপন্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল, আন্তর্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাত, পৃথিবী জুড়ে চরমপন্থার বিস্তার, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদী প্রতিক্রিয়া ও তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ার ঢেউ সেই বহুমাত্রিকতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। হিন্দুত্বের উত্থানকে এই আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দরকার।

হিন্দুত্বের সামনে আর একটা চ্যালেঞ্জ অবশ্য আসতে পারত। যদি গরিব মানুষ মনে করতেন বিজেপি সরকার তাঁদের সঙ্গে নেই, তাহলে শুধুমাত্র হিন্দুত্বের মতাদর্শ দিয়ে নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়া যেত না। কিন্তু নোট বাতিলের ফলে গরিব মানুষ, অন্তত সাময়িকভাবে, মনে করছেন এই সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত কালো টাকার মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। অতএব এই সরকার তাঁদের দিকে। বলা শক্ত, এই ধারণা কতদিন টিকবে। কিন্তু আপাতত, মানতেই হবে, নোট বাতিলের ফাটকা বিজেপিকে প্রচুর রাজনৈতিক সুবিধে দিয়েছে, তার অর্থনৈতিক পরিণাম যা-ই হোক।

পরিশেষে দু'টো কথা। এক, আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যাপনে অর্থাৎ ভাষায়, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, সাহিত্যে, আইন-ব্যবস্থায়, রন্ধন-শৈলীতে, পোশাক-পরিচ্ছদে ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই যাঁরা ভারতকে শুধুমাত্র হিন্দু রাজ্য হিসেবে দেখতে চান, তাঁরা ভারতের ইতিহাসকে অস্বীকার করছেন। দুই, মৌলবাদের উত্তরে বিপরীত কোনও মৌলবাদের উত্থান ঘটলে অশান্তি বাড়বে বই কমবে না। সেই ক্রমবর্দ্ধমান ধর্মান্ধতার ঋতুতে হিন্দু, মুসলমান কেউই নিরাপদ নয়।

(২)

শ্রীনরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গে এসে বলেছিলেন, গুজরাতের মুসলিমরা পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের তুলনায় ঢের ভাল আছে। প্রমাণ হিসেবে তিনি নানারকম তথ্য পেশ করেছিলেন যার মূল সূত্র সাচার কমিটির রিপোর্ট। রীতিমত পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় গুজরাতি মুসলমানদের গড় আয় বেশি, সঞ্চয়ও বেশি। গুজরাতি মুসলিমদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা যতটা ছড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের মধ্যে ততটা ছড়ায়নি। সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের উপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় গুজরাতে অনেক বেশি যদিও গুজরাতের মোট জনসংখ্যায় মুসলমানদের অনুপাত পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক কম।

মোদিজির তথ্য ও পরিসংখ্যানে দু'একটা ছোটখাট ভুলভ্রান্তি আছে। যেমন, আমাদের দেশে আয়ের কোনও নির্ভরযোগ্য হিসেব পাওয়া যায় না বলে মাথাপিছু ব্যয় দিয়েই একটি পরিবারের কিংবা একটি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করতে হয়। মোদিজি হয়ত আয় বলতে ব্যয়কেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু আয়ের বদলে ব্যয়ের দিকে তাকালেও দেখতে পাব পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের তুলনায় গুজরাতি মুসলিমরা অনেকটাই সচ্ছল, অর্থাৎ তাদের তুলনামূলক মাথাপিছু ব্যয় অনেকটাই বেশি। তেমনই, মোদিজির দেওয়া অন্যান্য পরিসংখ্যানগুলিতে যে অল্পবিস্তর গাণিতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সেগুলোকে শুধরে নিলেও দেখা

যাবে, তাঁর মূল প্রতিপাদ্যটি কিছু ধসে পড়ছে না, বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও জোরদার হচ্ছে। অতএব পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের তুলনায় গুজরাতি মুসলিমরা অর্থনৈতিকভাবে যে সুবিধেজনক অবস্থায় রয়েছেন, মোদিজির এই দাবি আমাদের মেনে নিতেই হবে। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমাদের দু'টি বক্তব্য আছে। প্রথমত, মোদিজি যদি আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চান যে, গুজরাতের মুসলমানদের আর্থিক সচ্ছলতার পেছনে তাঁর নিজের একটা মস্ত ভূমিকা রয়েছে, আমাদের পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া শক্ত। দ্বিতীয়ত, সচ্ছল হলেই যে ভাল থাকা যায় না গুজরাতের মুসলমান সমাজ তার মস্ত বড় উদাহরণ। আমাদের বক্তব্য দু'টিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার।

তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক উতোর-চাপানের বাইরে গিয়ে যদি একটু ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে গুজরাতি-বাঙালি মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক তফাতের রহস্য অনেকটা বোঝা যাবে। আসল কথাটা খুব সহজ। আমরা বলতে চাইছি, দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত মুসলমানদের প্রায় সকলেই সদ্যোজাত পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। এর একটা কারণ অবশ্যই ভাষার সুবিধে, আর একটা কারণ, ভৌগলিক নৈকট্য। এছাড়াও তৃতীয় একটা কারণ আছে। পুব বাংলা থেকে হিন্দু মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরা দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার ফলে পুব বাংলায় একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, উচ্চ পদগুলি ভরাট করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, কাজেই সচ্ছল ও শিক্ষিত মুসলমানদের সামনে বহু নতুন সুযোগ এসে পড়েছিল। এতদিন হিন্দু প্রতিযোগিতার চাপে পুব বাংলায় সচ্ছল ও শিক্ষিত মুসলমানেরা খানিকটা দমে ছিলেন, হিন্দুরা চলে যাবার ফলে তাঁদের উন্নতিতে আর কোনও বাধা রইল না। এপার বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরা ওপার বাংলায় নতুন সুযোগের সন্ধান পেলেন।

পশ্চিমবঙ্গের গরিব মুসলমানদের জন্য কিন্তু ওপার বাংলায় চলে যাওয়াটা ততটা আকর্ষণীয় ছিল না। তাঁদের একে টাকার জোর নেই, তার ওপর শিক্ষা-দীক্ষাও তেমন নেই যে নতুন দেশে নতুন পরিবেশে নতুন করে জীবন শুরু করার ঝুঁকি নিতে পারবেন। সব থেকে বড় কথা, তাঁদের জীবিকার মূলে যে কৃষিক্ষেত্র, পুব বাংলায় সেটা তখনই যথেষ্ট ভীড়াক্রান্ত, নতুন করে আসা পরিযায়ীদের চাপ নিতে সে অক্ষম। কাজেই, এদেশের গরিব মুসলমানেরা মোটের ওপর এদেশেই রয়ে গেলেন। কিন্তু এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের চেহারাটা একেবারে হতশ্রী হয়ে পড়ল, সে সমাজে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত তেমন করে আর রইল না, কেবল পড়ে রইল অসংখ্য গরিব মানুষ।

গুজরাতের ব্যাপারটা অন্যরকম। দেশভাগের পর পুব কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানে পাকাপাকিভাবে চলে যাওয়ার কোনও উৎসাহ সেখানকার সচ্ছল মুসলিমদের ছিল না। ছিল ভাষার ব্যবধান এবং দূরত্বের ব্যবধান। তাছাড়া সেখানে বোহরা-খোজা-মেমন সম্প্রদায়ের মতো উচ্চবিত্ত মুসলমানেরা, যাঁরা পুরুষানুক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন, নিজেদের দেশেই যথেষ্ট সুবিধেজনক অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা নতুন জায়গায় নতুন করে জীবন শুরু করার ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন? এর ফলে গুজরাতি মুসলমান সমাজের চেহারাটা তেমন একটা বদলাল না যেমন পশ্চিমবঙ্গে বদলেছিল। গুজরাত ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস নির্ধারিত সেই তফাতটা এখনও পুরোমাত্রায় বজায় রয়েছে, এ-ব্যাপারে শ্রীনরেন্দ্র মোদির কোনও ভূমিকা বা কৃতিত্ব নেই।

আমাদের বিশ্লেষণ ঠিক হলে দেখা যাবে, গুজরাতের মতো ভারতের অন্যান্য রাজ্য, যেখান থেকে দেশভাগের পর অবস্থাপন্ন মুসলমানেরা ভাষা, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে পাকিস্তানে চলে যেতে উৎসাহ বোধ করেননি, সেখানকার মুসলিমদের অবস্থাও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের তুলনায় ভাল। তুলনার জন্য দক্ষিণের রাজ্যগুলির দিকে তাকানো যেতে পারে। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৪-০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে মুসলমানদের মাথাপিছু মাসিক খরচ ছিল এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মাথাপিছু মাসিক খরচের ৬২ শতাংশ। তুলনায় দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে এই অনুপাত বেশি। তামিলনাডুতে ৮৭ শতাংশ,

অন্ধ্রপ্রদেশে ৭১ শতাংশ, কেরলে ৭৯ শতাংশ এবং কর্নাটকে ৭০ শতাংশ। উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, গুজরাতে এই অনুপাত ৭১ শতাংশ-এর কাছাকাছি। এই সংখ্যাগুলি আমাদের তত্ত্বকে সমর্থন করে।

এবার আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্যে আসি। হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে শ্রীনরেন্দ্র মোদি আসল কথাটা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তিনি একবারও বলেননি, গুজরাতের মুসলমানেরা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের তুলনায় অবস্থাপন্ন হলেও তাঁরা সতত নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। কারণ সেখানে ঘন ঘন দাঙ্গা বাধে এবং সেইসব দাঙ্গায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের ক্ষতি হয় বেশি। অনির্বাণ মিত্র এবং দেবরাজ রায়ের একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধ (ইমপ্লিকেশনস অফ অ্যান ইকনমিক থিয়রি অফ কনফ্লিক্টঃ হিন্দু-মুসলিম ভায়োলেন্স ইন ইন্ডিয়া (২০১৪), জার্নাল অফ পলিটিকাল ইকনমি) থেকে জানতে পারছি ১৯৮৪-৯৮ এই চোদ্দ বছরে সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বলি হয়েছেন ১৫২২৪ জন। মোট দাঙ্গা-পীড়িতদের মধ্যে ৪৪৯৯ জন অর্থাৎ প্রায় ৩০ শতাংশ গুজরাতের এবং ৪০৩৩ জন অর্থাৎ ২৬ শতাংশ-এর কিছু বেশি মহারাষ্ট্রের। এখানে বলি বলতে দাঙ্গায় মৃত এবং আহত দুই-ই ধরা হয়েছে।

উক্ত প্রবন্ধের লেখকদের প্রতিপাদ্য হল, দাঙ্গার মূল উদ্দেশ্য লুটতরাজ, এবং যেহেতু ভারতে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু, লুটতরাজে তাঁরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। প্রবন্ধটিতে দেখানো হয়েছে, যখনই মুসলিমদের ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই দাঙ্গা ঘটবার প্রবণতা বেড়েছে। অর্থাৎ আহত-নিহত সহ দাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি এবং মুসলিমদের ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি এই দুই-এর মধ্যে একটা সরাসরি সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে। হিন্দুদের সম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে কিন্তু দাঙ্গার কোনও যোগাযোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অনির্বাণ মিত্র এবং দেবরাজ রায়ের বিশ্লেষণ মেনে নিলে বলতে হয়, গুজরাতি মুসলমানদের সচ্ছলতাই তাঁদের নিরাপত্তাহীনতা এবং দুঃখ-দুর্দশার কারণ। এর পরেও কি মোদিজি গুজরাতি মুসলমানদের সচ্ছলতা নিয়ে বড়াই করবেন?

মূল সমস্যাটা অবশ্য আরও গভীর। তাকে অর্থনৈতিক স্বার্থের ঘেরাটোপ দিয়ে পুরোটা ধরা যাবে না। দেখা যাচ্ছে, ১৯৮৪-৯৮ এই সময়ের মধ্যে দক্ষিণের চারটি রাজ্যের সম্মিলিত দাঙ্গা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৯২৪, অর্থাৎ মোট আক্রান্তের মাত্র ১২.৬ শতাংশ। অথচ আমরা আগেই দেখেছি দক্ষিণে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের অবস্থা গুজরাতি মুসলমানদের তুলনামূলক অবস্থার থেকে কিছু খারাপ ছিল না। প্রশ্ন উঠতেই পারে, দাঙ্গার উদ্দেশ্য যদি লুটতরাজই হয় তাহলে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ততটা দাঙ্গা হয়নি কেন?

আসলে সব দাঙ্গার পেছনেই একটা দীর্ঘ সাম্প্রদায়িক বৈরিতার ইতিহাস থাকে, যে ইতিহাস দক্ষিণে ততটা ছিল না যতটা গুজরাত-মহারাষ্ট্রে ছিল। উপরি-উক্ত প্রবন্ধের লেখকরাও এখানে ইতিহাসের ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা এই অবস্থার নাম দিয়েছেন প্রাইমোরডিয়াল হেট্রেড বা সনাতন ঘৃণা। গুজরাত-মহারাষ্ট্রে মুসলমানদের সচ্ছলতা দাঙ্গাবাজদের প্রলুব্ধ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেখানে সর্বব্যাপী ঘৃণার বাতাবরণ না থাকলে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাগুলো কখনই ঘটত না। মনে রাখতে হবে, গুজরাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই নিয়মিত দাঙ্গা হয়ে আসছে, ১৯৬৯ কিংবা ২০০২-এর দাঙ্গা সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। বস্তুত, এই বৈরিতার পরিব্যপ্ত জমিতেই জন্ম নিয়েছে রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, জনসঙ্ঘ এবং ভারতীয় জনতা পার্টি। শ্রীনরেন্দ্র মোদিও এই দীর্ঘ ঘৃণা ও বৈরিতাকে অতিক্রম করতে পারেননি, সম্ভবত কখনও চেষ্টাও করেননি। উল্টোদিকে, একথাও জোর দিয়ে বলা দরকার যে, যেসব সংখ্যালঘু উগ্রপন্থীরা দেশ জুড়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে, নির্বিচারে নিরীহ মানুষদের হত্যা করছে, তারাও এই সাম্প্রদায়িক ঘৃণার ঔরসে জাত।

এখানে বলে রাখি, ২০০২-এর পরেও কিন্তু গুজরাতে দাঙ্গার প্রবণতা কিছুমাত্র কমেনি। কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১০-১৩ এই সময়ের মধ্যে গুজরাতে দাঙ্গার বলি হয়েছেন প্রতি দশ লক্ষ মানুষে তেরো জন মানুষ। দাঙ্গায় এর থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ দেখা গেছে একমাত্র কর্নাটকে, প্রতি দশ লাখে ১৪.৩ জন, যে কর্নাটক ওই সময়ে বিজেপি-র শাসনেই ছিল।

আমরা জানি একটা ঘৃণা থেকে জন্ম নেয় আর একটা ঘৃণা, আর একটা ঘৃণা থেকে আরও একটা। এর কোনও শেষ নেই। গুজরাতের মুসলমানেরা ভাল আছেন শ্রীনরেন্দ্র মোদির এই দাবি সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে আরও ঘৃণার জন্ম দেবে যার প্রতিক্রিয়ায় দেশের সংখ্যাগুরু হিন্দুরাও শান্তিতে থাকতে পারবেন না। শেষ বিচারে, অর্থ নয়, সচ্ছলতা নয়, শান্তিটাই আসল কথা। কিন্তু এই সরল সত্যটা শ্রীনরেন্দ্র মোদি বুঝতে চাইবেন কি?

(৩)

গত ১৪ই জুলাই বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষে সারা দেশে ছুটি ছিল। ইস্কুল-কলেজ, সরকারি আপিস-কাছারি, ব্যাঙ্ক-ডাকঘর সব বন্ধ। ভাবলাম, উপরি ছুটির দিনটা বেলা অব্দি ঘুম দেব। কিন্তু প্রতিদিনের মতো সেই সাড়ে ছটায় কলিং বেলের শব্দ—জমাদার ময়লা নিতে এসেছে। ময়লার ব্যাগটা তার হাতে কোনোরকমে তুলে দিয়ে একটু চোখ বুঝেছি, আবার বেল। এবার এসেছে কাজের মাসি। দরজা খুলে দিয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা, ফের টুংটাং, এবার রান্নার মাসি। অর্থাৎ ঘুমের দফারফা। বাড়িতে সারাইয়ের কাজ চলছিল। ইতিমধ্যেই ধুমধাড়াক্কা শুরু হয়ে গেছে। বারান্দায় বেরিয়ে দেখি মিস্ত্রিরা ভারা বেয়ে আট তলায় উঠে ভাঙাভাঙির কাজ শুরু করে দিয়েছে। ঘুমটা জমলো না বলে মনে মনে এদের সবার ওপর খুব রাগ করতে যাব, হঠাৎ খেয়াল হল, এই জমাদার, কাজের মাসি, রান্নার মাসি, রাজমিস্ত্রি, এরা সকলেই সম্ভবত দলিত, পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির মানুষ। বাবাসাহেব আম্বেদকর এদের জন্যই সারাজীবন লড়াই করলেন, অথচ তাঁর জন্মদিনে এদের কারও ছুটি নেই তো। শুধু আমরাই, উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরা, আম্বেদকরের জন্মদিন পালনের ছুতোয় ছুটি ভোগ করছি।

এটা বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়, চারদিকে তাকালেই বোঝা যাবে সমাজের মাথারা সবকিছু দখল করে নিচ্ছে, সুযোগ-সুবিধে, বিষয়-সম্পদ, সুখ-শান্তি-নিরাপত্তা, এমনকি বাবাসাহেবের জন্মদিন পালনের অধিকারটুকুও। অর্থশাস্ত্রে এই প্রবণতার নাম দেওয়া হয়েছে এলিট ক্যাপচার। নির্বাচনের অশান্ত ঋতুতে এলিট ক্যাপচারের সমস্যাটি বিশেষ করে ভাবায়। হাজার হলেও আমাদের দেশে একটা গণতন্ত্র তো এখনো টিকে আছে। তার কল্যাণে কোটি-কোটি গরিব মানুষ ভোট দিয়ে তাঁদের ইচ্ছে মতো সরকার তৈরি করছেন। যদিও গরিব মানুষরাই সংখ্যায় বেশি, তবু তাঁদের ইচ্ছেগুলো প্রাধান্য পায় না কেন? কেন ১৯৫১ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর তেষট্টি বছর কেটে গেলেও গরিবদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো এখনও তেমনভাবে অবয়ব পেল না, সংখ্যালঘু এলিটদের প্রতিপত্তি এক ফোঁটাও কমল না? এটা একটা মস্ত রহস্য।

একটু খোঁজ নিয়ে দেখলে জানা যাবে, রহস্য যে শুধু আমাদের গণতন্ত্রেই আছে তা নয়, গণতন্ত্রের পীঠস্থান খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আছে। বেশ কয়েক বছর হল মার্কিন কম্পানিরা তাদের মার্কিন দেশের কল-কারখানাগুলো বন্ধ করে দিয়ে অপেক্ষাকৃত গরিব দেশে, মেক্সিকোয়, ব্রাজিলে, মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ডে, যেখানে শ্রমের দাম কম, কাঁচামাল পাওয়ারও সুবিধে, সেসব জায়গায়, নতুন কল-কারখানা পত্তন করছে। এটা সব থেকে বেশি ঘটেছে মোটর গাড়ি শিল্পে। একদা গাড়ি শিল্পের রাজধানী ডেট্রয়েট এখন শ্মশান। যেসব দক্ষ শ্রমিক ডেট্রয়েটের গাড়ি কারখানাগুলোতে কাজ করে আমেরিকান মধ্যবিত্তদের সমান আয় করতেন তাঁরা পেটের দায়ে নামমাত্র মজুরিতে এখন সুপারমার্কেট ইত্যাদি জায়গায় কাজ নিতে বাধ্য হচ্ছেন। মার্কিন পুঁজি ভিনদেশে পাড়ি দেওয়ার ফলে অবশ্য লাভ হয়েছে সেই সব দেশের যেখানে নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠেছে, কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। কিন্তু আরও বেশি লাভ হয়েছে মার্কিন পুঁজিপতিদের। তাঁরা উৎপাদনের খরচ কমিয়ে তাঁদের লাভ বহুগুণ বাড়িয়ে নিতে পেরেছেন। অর্থাৎ দেশ থেকে পুঁজি নির্গমনের ফলে একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মার্কিন শ্রমিক আর অন্যদিকে লাভবান হয়েছেন হাতে গোনা কয়েকজন পুঁজিপতি এবং কতিপয় শেয়ারহোল্ডার। এর ফলে গত পঁচিশ-তিরিশ বছরে মার্কিন দেশে আর্থিক অসাম্য অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার হল, এই সেদিন পর্যন্ত রিপাবলিকান বা ডেমক্র্যাট, যে দলই ক্ষমতায় থাকুক, কেউই তেমনভাবে পুঁজির এই বর্হিগমনের বিরোধিতা করেনি। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন সরকার লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করার বদলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী পুঁজিপতির স্বার্থ রক্ষা করাটাকেই শ্রেয় মনে করেছেন। এবং সেটা করেও ভোটে জিতেছেন। এটা একটা ধাঁধা, ভোটের কথা ভাবলে শ্রমিকদের স্বার্থচিন্তাটাই স্বাভাবিক ছিল। যেহেতু তাঁরা সংখ্যাগুরু, নির্বাচনে জিততে গেলে তাঁদের সমর্থনটা জরুরি। বেকারত্বের মরসুমে কীভাবে শ্রমিকদের সমর্থন আদায় করা সম্ভব হল? গণতন্ত্র কি তাহলে দুর্বল সংখ্যাগুরুদের বদলে শক্তিশালী সংখ্যালঘুদের স্বার্থই সর্বদা রক্ষা করে?

সংখ্যালঘু পুঁজিপতিদের অনেক টাকা, রাজনৈতিক দলগুলির ভোটের খরচ তাঁরা অনায়াসেই বহন করতে পারেন। বিনিময়ে দল ক্ষমতায় এলে সরকারি নীতিকে তাঁরা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগান, দরকার পড়লে প্রভাব খাটিয়ে বদলে দিতে পারেন সরকারি নীতি। এই অব্দি বোঝা শক্ত নয়, যেটা আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে না সেটা হল, সেই নীতি শ্রমিকস্বার্থের পরিপন্থী হলে, শ্রমিকরা তাকে মেনে নিচ্ছেন কেন?

এখানে য়ুরোপের গণতন্ত্র এবং আমেরিকার গণতন্ত্রের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য করা বাঞ্ছনীয়। আমেরিকায় সামাজিক চলিষ্ণুতা, ইংরেজিতে যাকে বলে সোশ্যাল মোবিলিটি, য়ুরোপের তুলনায় বেশি। গরিবের ঘরে জন্মেও একজন মার্কিন নাগরিক খুব স্বাভাবিকভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার, স্বচ্ছল হবার স্বপ্ন দেখতে পারেন এবং সেই স্বপ্ন সফল হওয়াও আশ্চর্য নয়। এটাই সেই বহু-চর্চিত অ্যামেরিকান ড্রিম। এই স্বপ্ন এবং তার সফল হবার সম্ভবনা আমেরিকার গরিব ভোটারকে ধনীদের প্রতি সহিষ্ণু করে তুলেছে। গরিব ভোটারটি ভাবছে আমিও তো একদিন ধনী হতে পারি, আমি না হতে পারি আমার ছেলে তো হতে পারে। কাজেই আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছতে চাইছি সেই স্বপ্নের জায়গাটা আকর্ষণীয় থাকলে ক্ষতি কী? অর্থাৎ, বলা যেতে পারে, প্রবল অসাম্য সত্ত্বেও, এই সামাজিক চলিষ্ণুতা, এই কুটীর থেকে প্রাসাদে উন্নীত হবার সম্ভবনা, আমেরিকান সমাজকে আজও ধরে রেখেছে। বলাই বাহুল্য, এর প্রতিফলন গরিব ভোটারদের ব্যবহারেও পড়েছে। মুক্ত প্রতিযোগিতা এবং খোলা বাজার, যা মার্কিনি পুঁজির বর্হিগমনকে সম্ভব করেছে, এবং যা শ্রমিকদের মেরে পুঁজিপতিদের রাজা করছে, তার প্রতিও গরিব ভোটাররা বিরূপ নন।

তুলনায় য়ুরোপে গরিব অবস্থা থেকে বড়লোক হবার সুযোগ কম। সেখানকার সমাজে এখনও লর্ড-ব্যারনদের প্রতিপত্তি, যা চেষ্টা করে হয় না, জন্মসূত্রে লাভ করতে হয়। অর্থাৎ একজন য়ুরোপীয় নাগরিক তাঁর জীবনে কতদূর উন্নতি করবেন সেটা বহুলাংশে নির্ভর করে তিনি কোন ঘরে জন্মেছেন তার ওপর। এই সামাজিক স্থবিরতার ফলে য়ুরোপে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে একটা স্থায়ী দূরত্ব তৈরি হয়েছে, কাজেই সেখানে রাজনৈতিক দলগুলিকে আলাদা করে গরিবদের জন্য ভাবতে হয়। ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রই জানেন, আমেরিকার তুলনায় য়ুরোপের দেশগুলিতে সরকারের কল্যাণমূলক কাজকর্ম অনেক বেশি। সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, সবেতেই সরকারি হস্তক্ষেপ। বেকার হলে দরাজ সরকারি সাহায্য। অর্থাৎ সেখানে সোশ্যাল ডেমক্র্যাটদের রমরমা। এককথায়, সেখানকার গণতন্ত্রে তেমন রহস্য নেই, আমজনতা যা চাইছে, সরকার তাই দিচ্ছে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এখানে মার্কিন দেশের মত সামাজিক চলিষ্ণুতা নেই। এখানে একবার গরিব হয়ে জন্মালে প্রজন্মের পর প্রজন্ম গরিবই থেকে যেতে হয়। তাই যে যুক্তি দিয়ে আমরা মার্কিনি গণতন্ত্রের রহস্য ব্যাখ্যা করেছি, তাই দিয়ে ভারতীয় ধাঁধার হদিশ পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে, কেউ কেউ অবশ্যই বলতে পারেন, গণতন্ত্রের চাপে বিভিন্ন সময়ের সরকার গরিব মানুষের জন্য কিছু কিছু কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে গরিব মানুষের অবস্থার ক্রমশ উন্নতি ঘটেছে, দারিদ্র্যের হার কমেছে, অসাম্যও কমেছে। কাজেই ভারতীয় গণতন্ত্র প্রত্যাশা মতোই কাজ করেছে, এখানে য়ুরোপের মতোই কোনও ধাঁধা নেই।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে যে দারিদ্র্যের হার কমেছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। প্ল্যানিং কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৩-৭৪ সালে ৫৪.৯ শতাংশ ভারতীয় দারিদ্র্যরেখার নীচে বাস করতেন। ২০০৪-০৫ সালে সেই অনুপাত কমে হয়েছে ২১.৭ শতাংশ। কিন্তু, চিন অথবা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশে, যেখানে কখনই গণতন্ত্র ছিল না, সেখানেও গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে দারিদ্র্য কমেছে, বস্তুত ভারতের থেকে অনেক বেশি হারেই কমেছে। তাই ভারতে যে-দারিদ্র্য কমেছে সেটা গণতন্ত্রের চাপেই কমেছে একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না।

উপরন্তু, যেভাবেই মাপি না কেন, আমাদের দেশে ধারাবাহিকভাবে অসাম্য কমার কোনও প্রমাণ তথ্য থেকে পাওয়া যাবে না। সরকারি হিসেব অনুযায়ী কখনও অসাম্য বেড়েছে, কখনও কমেছে। তাছাড়া, আমাদের দেশে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত আয়ের কোনও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তাই অসাম্য মাপা হয় ভোগের তথ্য দিয়ে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, ভোগের অসাম্যের তুলনায় আয়ের অসাম্য সর্বদাই বেশি হয় যেহেতু ধনীরা তাঁদের আয়ের একটা বড় অংশ সঞ্চয় করে থাকেন এবং গরিব মানুষ তাঁর আয়ের প্রায় সবটুকুই খেয়ে ফেলেন। অর্থাৎ অসাম্যের যে হিসেব সরকারিভাবে পাওয়া যায়, আসল অসাম্য তার থেকে ঢের বেশি।

মোটকথা, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে ধনী-নির্ধন সকলেরই অবস্থার উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিবদের তুলনায় সংখ্যালঘু বড়লোকদের উন্নতি হয়েছে অনেক বেশি। অসাম্য কমানোর যে কাজটা ভারতীয় গণতন্ত্রের করার কথা ছিল সেটা ঠিক মতো করা হয়নি। নইলে দেশে এখনও কম করেও চব্বিশ-পঁচিশ কোটি গরিব মানুষ বাস করবেন কেন? গণতন্ত্রের রহস্যটা তাহলে থেকেই যাচ্ছে।

এই রহস্যের সম্পূর্ণ সমাধান আমাদের জানা নেই। এটুকু বোঝা যায় যে, গরিব মানুষের অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে দশকের পর দশক তাঁদের ভুল বোঝানো হয়েছে এবং এ-ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রচারের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। বলাই বাহুল্য, প্রচারের টাকাটা আসে ধনীদের পকেট থেকে। যতদিন অশিক্ষা থাকবে ততদিন এলিট ক্যাপচারও চলবে। স্বাধীনতার পরে নিরক্ষরতা অবশ্যই কমেছে, কিন্তু নিরক্ষরতা কমা আর অশিক্ষা কমা এক জিনিস নয়। সমস্যা হল, অশিক্ষা কমানোর ব্যাপারে এলিটদের উৎসাহ বা স্বার্থ কোনওটাই নেই। তাই ধর্মীয় গোঁড়ামি কিংবা একটি বিশেষ পরিবারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের আড়াল তুলে গরিব মানুষের আসল চাহিদাগুলোকে সুকৌশলে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে।

নোটবন্দী

পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোট রাতারাতি বাতিল হয়ে যাবার ফলে সারা দেশের মানুষ যে অপরিসীম অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্যাঙ্কে এটিএম-এ লম্বা লাইন, মানুষ কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে কিছু ছোট নগদের আশায় সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। খবরে প্রকাশ, লাইনে দাঁড়ানোর ধকলে কেরালায় এক বৃদ্ধের ও এক প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে, নগদের অভাবে হাসপাতালে ভর্তি করা যায়নি বলে মহারাষ্ট্রে মারা গিয়েছে একটি সদ্যোজাত অসুস্থ শিশু। বাজারে মাছওলা, তরকারিওলা বেসাতি নিয়ে বসে আছে, বিক্রি করতে পারছে না, কারণ বাবুরা পাঁচশো-হাজারের নোট দিতে চাইছেন। বাবুরাও পকেটে পাঁচশো-হাজারের নোট ও হাতে শূন্য থলি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। বিয়ের মরসুমের কেনাকাটা ভীষণভাবে মার খাচ্ছে, হাসপাতাল ফিরিয়ে দিচ্ছে রুগিকে। ছোট নগদের অভাবে, জনমজুর, রাজমিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রিকে গৃহস্থ কাজ দিতে পারছে না। আর যাঁরা চার-পাঁচ ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুললেন, তাঁরা বেশিরভাগটাই পেলেন দু'হাজারি নতুন নোট যা ভাঙিয়ে বাজার থেকে দু'তিনশ টাকার জিনিস কেনা কার্যত অসম্ভব। এককথায় বলতে গেলে, সরকারের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফলে অর্থনীতির স্বাভাবিক লেনদেন থমকে গেছে। হয়রানি ছাড়াও কমে গেছে দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষের আয়।

সরকার বলছে, দেশের বাজার কালো টাকায় ছেয়ে যাচ্ছে। দেশ ও সমাজের দীর্ঘমেয়াদি উন্নতির জন্য এই টাকা উদ্ধার করা দরকার এবং তার জন্য মানুষকে খানিকটা কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার আগে জানা দরকার, কালো টাকা কাকে বলে। সরকারের কর ফাঁকি দিয়ে অথবা বেআইনি লেনদেনের মধ্য দিয়ে যে টাকা বা আয় অর্জন করা হচ্ছে, আমরা তাকে কালো আয় বা কালো টাকা বলছি। এই আয়ের একটা অংশ তাৎক্ষণিক ভোগের পেছনে খরচ হয়ে যাচ্ছে, একটা অংশ বাড়ি-গাড়ি-সোনাদানা ইত্যাদি সম্পদে পরিণত হয়ে সঞ্চিত থাকছে, একটা অংশ দেশের মধ্যেই কোথাও বেনামে খাটছে আর চতুর্থ একটা অংশ হাওয়ালার মাধ্যমে দেশের বাইরে, সুইটজারল্যান্ডে বা অন্য কোনও দেশে, যেখানে কর-ব্যবস্থার কড়াকড়ি নেই, সেখানকার ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে। এই সবের পরে যেটা পড়ে রইল সেটা নগদের আকারে সঞ্চিত হয়ে কালো টাকার মালিকের বাথরুমে বা চিলেকোঠার ঘরে স্থান পাচ্ছে। সরকারের বর্তমান জেহাদ এই জমে থাকা কালো নগদের বিরুদ্ধে।

মোট কালো আয়ের কত অংশ নগদে জমা আছে? ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া সিবিআই-এর বিবৃতি অনুযায়ী বিদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের জমা কালো টাকার পরিমাণ ৫০০ বিলিয়ান মার্কিন ডলার। ২০১৬ সালে এসে, বলাই বাহুল্য, পরিমাণটা আরও বেড়েছে। অপর পক্ষে, সরকারি বয়ান মোতাবেক এই মুহূর্তে বাজারে পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোট ছাড়া আছে মোট ১৪ লক্ষ কোটি টাকার অর্থাৎ ২০৯ বিলিয়ান মার্কিন ডলারের। এই নগদের কতটা অংশ কালো টাকা হিসেবে মজুত করা আছে, সেটা সঠিক কারোরই জানা নেই। জানার উপায়ও নেই। তবে মোট নগদের পরিমাণটা যেখানে বিদেশের ব্যাঙ্কে বেআইনিভাবে জমা সম্পদের অর্ধেকেরও কম, এটা অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় যে, দেশে গচ্ছিত কালো নগদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি কালো টাকা জমা রয়েছে বিদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরকারের বর্তমান পদক্ষেপ আসল সমস্যাটাকেই এড়িয়ে গেল। বিদেশে জমা কালো টাকা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কিছুই করল না। শুধুমাত্র দেশে জমা বেআইনি নগদ, যা মোট কালো আয়ের একটা সামান্য ভগ্নাংশ, সেটা উদ্ধার করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে অশেষ দুর্ভোগে ফেলল। এটা কি মেনে নেওয়া যায়?

গভীরতর একটা প্রশ্ন আছে। ধরা যাক, সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে অনেক পরিমাণ কালো নগদ তামাদি হয়ে গেল। প্রশ্ন হচ্ছে, এর ফলে সাধারণ মানুষের কিছু ভাল হল কি? একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে, কালো আয় সমাজ ও অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক মূলত এই কারণে যে, এই আয় যখন উদ্ভূত হচ্ছে তখন সরকার তার প্রাপ্য কর পাচ্ছে না। সরকারের হাতে প্রাপ্য কর পৌঁছলে তা দিয়ে সাধারণ মানুষের উন্নতি ঘটানো যেত। রাস্তাঘাট তৈরি করা যেত, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের পেছনে আরও ব্যয় করা যেত। সরকার রাজস্ব না পাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ সেইসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারের বর্তমান পদক্ষেপের ফলে সেই সুযোগ কি আবার ফিরে আসবে? সরকারের হাতে বাড়তি রাজস্ব আসবে কি?

কিছুদিন আগে সরকারের অর্থ দপ্তর একটা কালো আয় স্বেচ্ছাপ্রকাশ প্রকল্প চালু করেছিল। এই প্রকল্প অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি তার কালো আয় স্বেচ্ছায় সরকারের কাছে প্রকাশ করলে, সেই আয়ের ওপর ৪৫ শতাংশ কর কেটে নিয়ে বাকিটা বৈধ ঘোষণা করা হচ্ছিল। এই প্রকল্পে ৬৫ হাজার কোটি কালো টাকা উদ্ধার করা গিয়েছিল, কর আদায় হয়েছিল ২৯ হাজার কোটি টাকার। কিন্তু এক্ষেত্রে পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোট বাতিল করে দিয়ে তেমন কোনও রাজস্ব সরকার সরাসরি পাচ্ছে না। তাহলে এর থেকে সাধারণ মানুষের উপকার হবে কীভাবে?

কেউ কেউ বলবেন, সরাসরি না হোক পরোক্ষভাবে উন্নয়নের জন্য কিছু বাড়তি টাকা সরকার এখন খরচ করার সুযোগ পাবে। দেখা যাক কীভাবে। ১৪ হাজার কোটি টাকার বাতিল নোটের একটা অংশ ব্যাঙ্কগুলোতে জমা পড়বে এবং ব্যাঙ্কগুলোর মধ্য দিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ফিরে আসবে। এর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নতুন টাকা ছাপাতে হবে। বাকি যে অংশটা ফিরবে না সেটাই মোটের ওপর কালো টাকার পরিমাণ। এই পরিমাণ নগদটা বাজার থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে, এর জন্য প্রাথমিকভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কোনও নতুন নোট ছাপাতে হচ্ছে না। এখন, যেটাকে আমরা কালো টাকা বলছি, সরকার যদি মনে করে তাহলে ওই পরিমাণ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নিয়ে, অর্থাৎ নতুন করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দিয়ে ছাপিয়ে, উন্নয়নের খাতে খরচ করতে পারে। এর ফলে বাড়তি কোনও মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে না, যেহেতু বাজারে চালু মোট নগদ নোট বাতিলের আগে যা ছিল তাই থাকছে। এটাই পরোক্ষভাবে উন্নয়নের জন্য সরকারের বাড়তি সম্পদ লাভ।

ভাল করে ভেবে দেখলে কিন্তু বোঝা যাবে এই যুক্তিতে ফাঁক আছে। যে নগদটা কালো টাকা হয়ে কিছু লোকের সিন্দুক-বন্দী ছিল, সেটা কিন্তু বাজারে চালু ছিল না। অর্থনীতির পরিভাষায় সেটা স্টোর অফ ভ্যালু বা সম্পদ সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, মিডিয়ম অফ এক্সচেঞ্জ বা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নয়। এই নগদটা যদি এবার সরকারি উন্নয়ন খরচের মধ্য দিয়ে বাজারে ঢোকে তাহলে বাজারে চালু নগদের পরিমাণ বেড়ে যাবে, ফলে মুদ্রাস্ফীতিও বাড়বে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে উন্নয়নের খরচ তো এমনিতেই বাড়ানো যেত, তার জন্য রাতারাতি নোট বাতিল করে সাধারণ মানুষকে এত কষ্ট দেবার দরকার ছিল না।

রাতারাতি নোট বাতিল করার আর একটা সুবিধের কথা অবশ্য সরকারি মুখপাত্ররা বলছেন। বলা হচ্ছে, এই সরকারি পদক্ষেপ অসাধু নাগরিকদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেবে যে ভবিষ্যতেও এইরকম পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। ফলে এরা ভয় পেয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে কর-ফাঁকি কমবে। এটা যে একেবারে হতে পারে না তা বলছি না, কিন্তু এই বার্তার ফলে অসাধু নাগরিকরা ভয় পেয়ে রাতারাতি সাধু হয়ে যাবে নাকি তাদের কালো টাকা নগদে না রেখে অন্য কোনও ভাবে রাখার ফন্দী-ফিকির বার করবে, সেটা আদৌ স্পষ্ট নয়।

এসব সত্ত্বেও বলব, কালো টাকা উদ্ধারের প্রয়োজন অবশ্যই আছে এবং সে-ব্যাপারে সরকার যে তৎপর হয়েছে সেটা প্রশংশনীয়। কিন্তু যেটা অতিশয় নিন্দার সেটা হল, কোনরকম প্রস্তুতি না নিয়ে এবং চিন্তা-ভাবনা না করে সরকার রাতারাতি কালো টাকা উদ্ধারে নেমে পড়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। কী কী প্রস্তুতি নেওয়া যেত? প্রথমত, পর্যাপ্ত পরিমাণ নতুন নোট না ছাপিয়ে পুরোনো নোটগুলো

বাতিল করে দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে তাতে একশ টাকার নোটে খুব বেশি লেনদেন করা অসুবিধেজনক। সেক্ষেত্রে পুরোনো পাঁচশো টাকার নোট বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ নতুন পাঁচশো টাকার নোট বাজারে আসার দরকার ছিল। নতুন পাঁচশো টাকার নোট তো বাজারে এলই না, তার বদলে এল নতুন দু'হাজার টাকার নোট যা নেহাতই অকাজের, যা ভাঙিয়ে দোকান-বাজার করা অসম্ভব। বিশেষ করে যখন পাঁচশো এবং হাজারের নোট বাতিল হয়ে গেছে। আশঙ্কা হয়, কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত ব্যাঙ্কগুলো থেকে একশ টাকার নোট উধাও হয়ে যাবে। মানুষ তখন কী করবে?

দ্বিতীয়ত, পুরোনো নোট বাতিল করার আগে মানুষকে খানিকটা সময় দেওয়া দরকার ছিল। ঘোষণা করা যেতে পারত, আজ থেকে এক মাস বাদে পুরোনো পাঁচশো এবং এক-হাজারি নোট বাতিল হয়ে যাবে। এই এক মাসের মধ্যে জনসাধারণ যেন তাঁদের পুরোনো নোটগুলো বদলে নেন। এখন এক মাস, পুরোনো এবং নতুন দু'রকম নোটই বাজারে চলবে। কারো কারো মনে হতে পারে, এক মাস সময় দিলে কালো টাকার মালিকরা অনেকটা সময় পেয়ে যেত। সেই সময়ের মধ্যে নানারকম ফন্দি-ফিকির বার করে তারা তাদের কালো টাকাকে সাদা করে ফেলতে পারত। কিন্তু ফন্দি-ফিকির তারা এখনও বার করছে। জন-ধন যোজনার যে অসংখ্য শূন্য ব্যালেন্স একাউন্ট আছে সেগুলিতে এখন টাকা আসছে। আশঙ্কা, এর অধিকাংশই কালো টাকা। শোনা যাচ্ছে, কিছু কিছু পুরোনো অনাদায়ী ঋণও ব্যাঙ্করা ফেরত পেয়ে যাচ্ছে যার উৎস কালো টাকা। এককথায় বলতে গেলে, অসাধু নাগরিকরা কালো টাকা সাদা করার ফন্দি-ফিকির বার করবেই, কিন্তু সাধারণ মানুষকে আর একটু প্রস্তুত হবার সুযোগ দিলে ভাল হত।

(২)

নোট বাতিলের পর দু'মাস কেটে গেল, অবস্থা এখনও স্বাভাবিক হল না। ইতিমধ্যে নোটের লাইনে অপেক্ষা করতে গিয়ে একশ'র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস উঠেছে, নগদের অভাবে চাষবাসের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বারে বারে তাদের অবস্থান পাল্টাবার ফলে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা তলানিতে ঠেকেছে, এবং সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি ও আয়বৃদ্ধির হার একটা বড় ধাক্কা খেয়েছে। কেউ জানে না, আরও কতগুলো দু'মাস কাটলে অবস্থা স্বাভাবিক হবে।

যে-নগদহীন অর্থব্যবস্থার কথা প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়া বা সিঙ্গাপুরের মত বড়লোক দেশে তার উপকারিতা থাকতেই পারে। কিন্তু আমাদের মতো গরিব দেশের পরিকাঠামোতে সেটা চালাতে গেলে যে দেশের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হবে আর সাধারণ মানুষ যে অশেষ দুঃখকষ্টে পড়বে সেটা অর্থনীতিবিদরা বারবার বলেছেন। বাস্তবেও তেমনটাই দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রীর না বোঝার কথা নয়। তাহলে কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি নোট বাতিলের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন? বিশেষ করে সামনেই উত্তরপ্রদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের নির্বাচন। গরিব মানুষ কষ্ট পেলে তারা কি প্রধানমন্ত্রীর দলকে ভোট দেবে?

প্রধানমন্ত্রী কতটা অর্থনীতি বোঝেন বা সাধারণ মানুষের অবস্থা নিয়ে তাঁর কতটা উদ্বেগ আছে সে-ব্যাপারে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অথবা বিচারশক্তি বস্তুতই প্রশ্নের অতীত। তাই রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে, নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে আপাতদৃষ্টিতে একটা ধাঁধা মনে হতেই পারে, যেহেতু এই সিদ্ধান্ত অসংখ্য ভোটারকে অসুবিধেয় ফেলেছে। কিন্তু কোনও কোনও ব্যাখ্যাতা একেবারে উল্টো কথা বলছেন। তাঁরা বলছেন, এই সিদ্ধান্ত দেশের অর্থনীতির পক্ষে মারাত্মক হলেও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির দিক থেকে একেবারে ওস্তাদের মার। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে মহারাষ্ট্র, গুজরাত এবং চণ্ডীগড়ের সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো হচ্ছে। ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা দরকার।

প্রধানমন্ত্রীর একনিষ্ঠ সমর্থক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জগদীশ ভগবতী একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে নোট বাতিলের সমর্থনে এক উদ্ভট যুক্তি খাড়া করেছেন। তিনি বলছেন, পাঁচশ এবং হাজার টাকার নোট রাতারাতি

বাতিল হয়ে যাবার ফলে বড়লোকরা তাদের অঘোষিত নগদ টাকা গরিবদের নামে জমা করবে এবং এই কাজ করার জন্য তারা গরিবদের তিরিশ শতাংশ কমিশনও দেবে যেহেতু নিজের আয় হিসেবে ঘোষণা করলে বড়লোককে তিরিশ শতাংশ আয়করই দিতে হত। এর ফলে আয়ের একটা পুনর্বণ্টন ঘটবে এবং অসংখ্য গরিব মানুষ ক্ষমতাসীন সরকারকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। দু'টো কারণে উদ্ভট এই যুক্তি। প্রথমত, বড়লোকের সঙ্গে দর-কষাকষিতে গরিব চিরকালই অপারগ। বড়লোকের এক লাখ কালো টাকা সাদা করে দিলে গরিবের কপালে বড়জোর দু'-পাঁচ হাজার জুটতে পারে, তিরিশ হাজার নয়। অর্থাৎ এখানে খুব বড় আকারের পুনর্বণ্টনের সম্ভবনা নিতান্তই ক্ষীণ। দ্বিতীয়ত, যদি এইভাবে কিছুটা পুনর্বণ্টন হয়েও থাকে, সেটা আদৌ অভিপ্রেত নয়, যেহেতু কালো টাকা উদ্ধারের উদ্দেশ্যটাই এখানে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

নোট-বাতিলের রাজনীতিটা বোঝার জন্য আর একটু গভীরে যেতে হবে। আধুনিক গণতন্ত্রে নির্বাচন জেতার জন্য দু'টো জিনিস দরকার—নির্বাচনে খরচ করার মতো যথেষ্ট অর্থ আর খানিকটা স্বতস্ফূর্ত গণ-সমর্থন। আমাদের বিশ্বাস, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করছে এই দুটি ব্যাপারেই নোট-বাতিলের সিদ্ধান্ত তাদের সাহায্য করবে।

প্রথমে নির্বাচনের খরচের ব্যাপারটা বোঝা যাক। এটা সকলেই জানে যে ভারতের মতো বিরাট দেশে নির্বাচন লড়তে গেলে বিস্তর খরচ করতে হয় এবং এই খরচের সিংহভাগ আসে বেসরকারি উদ্যোগপতিদের থেকে। উদ্যোগপতিদের মধ্যে ছোট-বড় নানা রকমফের আছে। বিজেপির মতো সর্বভারতীয় দলকে ছোট-বড় সকলেই সাহায্য করতে চাইবে। কিন্তু আঞ্চলিক দলগুলির দিকে সত্যিকারের বড় উদ্যোগপতিদের ততটা নজর পড়ার কথা নয়, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটি যদি সর্বভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ততটা গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে থাকে। অর্থাৎ আঞ্চলিক দলগুলিকে নির্বাচনের টাকা তোলার জন্য মূলত আঞ্চলিক উদ্যোগপতিদের ওপর নির্ভর করতে হয় যাদের ব্যবসার আয়তন ছোট থেকে মাঝারি মাপের। এটা পরিষ্কার যে, নগদ বাতিলের সিদ্ধান্ত ছোট এবং মাঝারি ব্যবসাকেই সরাসরি আঘাত করেছে; বড় ব্যবসাকে, অন্তত প্রত্যক্ষভাবে, তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। ফলে আশঙ্কা হয়, এখন কিছুদিন আঞ্চলিক দলগুলি নির্বাচনের খরচ জোগাড় করতে অসুবিধায় পড়বে। এবং এই অসুবিধে বিজেপির হচ্ছে না যেহেতু সত্যিকারের বড় ব্যবসায়ীরা তাদের সঙ্গে পুরোদস্তুর রয়েছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে চাইছে বিজেপি।

কেউ কেউ বলতে পারেন, বিজেপির মূল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও তো একটি সর্বভারতীয় দল। অতএব তাদের ওপরেও নিশ্চয় বড় ব্যবসায়ীদের সুনজর আছে। নোট বাতিলের মাধ্যমে আঞ্চলিক দলগুলিকে প্যাঁচে ফেললেও বিজেপি তাদের মূল বিরুদ্ধ দল কংগ্রেসের তো কোনও ক্ষতি করতে পারছে না। তাহলে আর লাভ কী হল? এর উত্তরে বলা যায়, সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গেছে জাতীয় কংগ্রেস দল রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ক্রমশই আঞ্চলিক দলগুলির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বিজেপির মতো নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জনের ক্ষমতা ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে তাদের। এই অবস্থায় আঞ্চলিক দলগুলির ডানা ছেঁটে দিতে পারলে কংগ্রেসের ক্ষমতাও রীতিমত সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। বিজেপি ভাবছে, নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত এই লক্ষ্যে তাদের অনেকটা এগিয়ে রাখবে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ স্বতস্ফূর্ত গণসমর্থন। নোট বাতিলের ফলে নগদের সঙ্কট যখন তুঙ্গে, ব্যাঙ্ক-এটিএম-এর সামনে যখন ভোর থেকে সর্পিল লাইন, শহরে-গ্রামে-মফস্বলে যখন অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, তখনও কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল, সাধারণ গরিব মানুষের কেউ কেউ, হাজার অসুবিধে সত্ত্বেও, নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছে। কারণটা মনস্তাত্ত্বিক। সাধারণ মানুষ অর্থনীতির তত্ত্ব-টত্ব বোঝে না, শুধু দেখেছে চারদিকে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি। দেখেছে, দুর্নীতি করে, গুন্ডামি করে, লোক ঠকিয়ে তার আশেপাশে কিছু জঘন্য লোক হাতে মোটা সোনার চেন বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তিনতলা বাড়ি, দামী গাড়ি হাঁকিয়ে তারই ওপর চোটপাট করছে। এটা সারা ভারতের চিত্র, এটাই বাস্তব। যেসব বিরাট

বিরাট কালোবাজারি বিদেশে টাকা রাখে, বিলাসবহুল খামারবাড়ি কেনে, প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ওঠাবসা করে, সাধারণ মানুষ তাদের চেনে না। তাই তাদের ওপর সাধারণ মানুষের ততটা রাগ নেই। তার যত রাগ তার আশেপাশে যেসব ছোট ও মাঝারি দুর্নীতিবাজ আছে তাদের ওপর।

তাই নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত যে কালো টাকার রাঘব বোয়ালদের ছুঁতেও পারল না, তা নিয়ে গরিবের মাথাব্যথা নেই। তার শুধু এই কথা ভেবে ভাল লাগছে যে, আশেপাশে যেসব চোর-ডাকাতগুলো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা এবার বিপদে পড়ল। সিনেমার শেষ দৃশ্যে ভিলেন মার খেলে দর্শকের যেমন ভাল লাগে, এটা অনেকটা সেই ধরনের ভাল লাগা। তাছাড়া টাকাওয়ালাদের প্রতি গরিবদের একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ আছে। নগদ বাতিল হলে যাদের টাকা আছে তারাই জব্দ হবে এই সরল যুক্তিতে কিছু গরিব মানুষ নিশ্চয় নগদ বাতিলের সিদ্ধান্তকে প্রাথমিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিল। গরিব মানুষের এই স্বাভাবিক আবেগকে প্রধানমন্ত্রী কাজে লাগাচ্ছেন, গরিব মানুষের পরিত্রাতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছেন। সত্যি সত্যি কালোবাজারিরা কতটা জব্দ হল গরিব মানুষ তার খবর রাখে না, এ-নিয়ে প্রধানমন্ত্রীও খুব একটা উতলা হচ্ছেন বলে মনে হয় না। নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত মূলত একটা রাজনৈতিক কৌশল।

কিন্তু মানুষের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাটা তো ঠিক দর্শকের আসনে বসে সিনেমা দেখার মতো নয়। সিনেমার পর্দায় দুষ্টু লোক আগুনে পুড়ে গেলে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে বসে তা দিব্যি উপভোগ করা যায়। কিন্তু সেই আগুনের আঁচ দর্শকের নিজের গায়ে এসে লাগলে দুষ্টের দমন সে কতটা উপভোগ করবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা নিশ্চিত, অর্থনীতির ওপর থেকে নোট বাতিলের কুপ্রভাব সহজে যাবে না। ফলে যেসব মানুষ এখন গ্যালারিতে বসে প্রধানমন্ত্রীকে বাহবা দিচ্ছেন, আজ না হোক তো কাল, মন্দা-আক্রান্ত অর্থনীতির আঁচ তাদের গায়েও এসে লাগবে। তখনও কি তারা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাবে?

একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। নির্বাচনের পেছনে যতই অর্থব্যয় করা হোক না কেন মোটের ওপর জন-সমর্থন না পাওয়া গেলে কোনও দলই নির্বাচনে জিততে পারে না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে যথেষ্ট রাজনৈতিক ঝুঁকি আছে। এই ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারটা রাজনীতিবিদ হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর পূর্বসূরী মনমোহন সিংহ কিংবা অটলবিহারী বাজপেয়ীর তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণাত্মক রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদীর বিশ্বাস। স্থিতাবস্থা বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে দেশ শাসন তাঁর ধাতে নেই। শত্রুকে সরাসরি আক্রমণ করে তাকে ধরাশায়ী করার মধ্যেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান, যেমন গুজরাতে পেয়েছিলেন, এবং এই আক্রমণের মধ্যে যে ঝুঁকি আছে তা নিতে তিনি পেছপা নন। তাঁর আক্রমণের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাজনীতিতে তুলনামূলকভাবে অনভিজ্ঞ রাহুল গান্ধীর আছে বলে মনে হয় না। এই মুহূর্তে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখেন। বিজেপিও তাঁকেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছে।

(৩)

এক বছর আগে, পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোট রাতারাতি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিজেপি সরকার। সরকারের সেই আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফলে অর্থনীতির স্বাভাবিক লেনদেন একেবারে থমকে গিয়েছিল। হয়রানি ছাড়াও কমে গিয়েছিল দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষের আয়। তখন সরকার বলেছিল, দেশের বাজার কালো টাকায় ছেয়ে গেছে। দেশ ও সমাজের দীর্ঘমেয়াদি উন্নতির জন্য এই টাকা উদ্ধার করা দরকার এবং তার জন্য মানুষকে খানিকটা কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। এখন, নোট বাতিলের একবছর পর, খতিয়ে দেখার সময় এসেছে এই এক বছরে কালো টাকা কতটা উদ্ধার হল, সরকার কতটা সফল হল তার অভীষ্ট লক্ষ্যে। প্রশ্ন দু'টি। এক, কালো টাকা কতটা উদ্ধার হল? দুই, নোটবন্দীর ফলে সাধারণ মানুষের আদৌ ভাল হল কি?

প্রথমে কালো টাকা উদ্ধারের প্রসঙ্গে আসা যাক। কালো টাকার দু'টো মাত্রা, একটা যেটা অসাধু লোকের ঘরে মজুত হয়ে রয়েছে, অর্থনীতির ভাষায় যার নাম স্টক, আর একটা যেটা প্রত্যেক দিন নতুন নতুন তৈরি

হচ্ছে, তৈরি হয়ে স্টকের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছে, অর্থনীতিতে তাকে বলে ফ্লো। একবছর আগে সরকার দাবি করেছিল নোট বাতিলের ফলে কালো টাকার স্টক এবং ফ্লো দু'টোই কমবে।

প্রথমে দেখা যাক, মজুত করা কালো টাকার পরিমাণ অর্থাৎ স্টক এক বছরে কতটা কমল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, যত নোট বাতিল করা হয়েছিল তার নিরানব্বই শতাংশই বিভিন্ন ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। এর একটা মানে হতে পারে যে, কালো টাকার মালিকরা তাদের বেআইনি টাকা স্বেচ্ছায় ঘোষণা করে তার ওপর যা কর এবং জরিমানা ধার্য হয় সেটা দিতে রাজি হয়েছেন। কিছুদিন আগে সরকারের অর্থ দপ্তর একটা কালো আয় স্বেচ্ছাপ্রকাশ প্রকল্প চালু করেছিল। এই প্রকল্প অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি তার কালো আয় স্বেচ্ছায় সরকারের কাছে প্রকাশ করলে, সেই আয়ের ওপর ৪৫ শতাংশ কর কেটে নিয়ে বাকিটা বৈধ ঘোষণা করা হচ্ছিল। এই প্রকল্পে ৬৫ হাজার কোটি কালো টাকা উদ্ধার করা গিয়েছিল, কর আদায় হয়েছিল ২৯ হাজার কোটি টাকার। মনে হতে পারে, এটাও হয়ত খানিকটা সেই রকম। কিন্তু তাই যদি হত, তাহলে সরকার নিশ্চয় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানাত নোট বাতিলের জন্য ঠিক কত বাড়তি রাজস্ব সরকারের ঘরে ঢুকেছে। যেহেতু সেরকম কিছুই জানানো হয়নি, তাই ধরে নিতে হবে নিরানব্বই শতাংশ বাতিল নোট ব্যাঙ্কগুলোতে ফিরে আসার পিছনে অন্য কিছু আছে।

সরকার অবশ্য জানিয়েছে, নোটবন্দীর পর দেশে বেশ কিছু আয়কর দাতা তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার অন্য ব্যাখ্যা আছে। এটাই সম্ভব যে, নোট বাতিলের পর কালো টাকার মালিকরা তাদের বেআইনি নগদ তাদের পরিচিত বিভিন্ন লোকের নামে সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন। ফলে, একদিকে যেমন বিপুলভাবে কালো টাকা সাদা হয়েছে, ইংরেজিতে যাকে বলে মানি লন্ডারিং, তেমনি যাদের নামে টাকা জমা রাখা হয়েছে, সাময়িকভাবে তারা করদাতা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন, কিন্তু পরের বছরেই আর তাদের নাম করদতাদের তালিকায় থাকবে না। অর্থাৎ জমে থাকা কলো টাকার ওপর নোটবন্দীর নিট ফল বিপুল মানি লন্ডারিং, যে কারণে সরকারের রাজস্ব তেমন বাড়ল না।

এবার ফ্লো, অর্থাৎ নতুন নতুন কালো টাকা তৈরি হওয়ার প্রসঙ্গে আসি। সরকারি আশ্বাস ছিল, নোটবন্দীর ফলে দেশে একটা নগদহীন স্বচ্ছ অর্থব্যবস্থা তৈরি হবে, দেশের মানুষ ক্রেডিট কার্ড বা চেকের মাধ্যমে লেনদেন করবে, ফলে নতুন কালো টাকা তৈরির প্রক্রিয়াটাও বন্ধ হয়ে যাবে। কার্যত সেটা হল না। হল না তার কারণ, আমাদের দেশ এখনও নগদহীন অর্থব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত নয়। বেশিরভাগ গ্রামবাসীর কাছে এখনও ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছয়নি, ক্রেডিট কার্ড তো দূরের কথা। তাই যা অনিবার্য তাই হয়েছে, নোট বাতিলের পর আবার একটু একটু করে অর্থনীতিতে নগদের ব্যবহার আগের জায়গায় ফিরে আসছে। ফলে, নতুন কালো টাকা তৈরির প্রক্রিয়াটাও কোনও ভাবে ব্যহত হচ্ছে না।

আরও গুরুত্বপূর্ণ, নোট-বাতিলের দীর্ঘমেয়াদি ফল। কোনও আভাস-ইংগিত ছাড়া হঠাৎ নোট-বাতিলের ফলে বহু ছোট-ছোট সংস্থা দেউলিয়া হয়ে গেছে। পাওনাদারদের কাছ থেকে যে টাকা-পয়সা তারা পেত, হঠাৎ নোট বাতিল হয়ে যাবার ফলে পাওনাদারেরা সে টাকা তাদের দিতে পারেনি। এর ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বহু মানুষের আয় কমে গেছে, কারও কারও আয় বন্ধ হয়ে গেছে। এই কমে যাওয়া আয়ের প্রভাব জিনিসপত্রের চাহিদার ওপর পড়তে বাধ্য। আর জিনিসপত্রের চাহিদা কমে গেলে আর্থিক বৃদ্ধির চাকাটাই মন্থর হয়ে যাবে।

জিএসটি

লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও জিএসটি বিল পাস হয়ে গেল। সারাদেশে জিএসটি নিয়ে যে বেশ কিছুদিন হৈ-চৈ চলছে, তোলপাড় হচ্ছে লোকসভা-রাজ্যসভা, বিল পাস করানোর জন্য বিজেপি কংগ্রেসের সাহায্য চাইছে, সুযোগ বুঝে কংগ্রেসও বাড়িয়ে নিচ্ছে তার দর, এদিকে আবার তৃণমূল কংগ্রেস জিএসটিকে খোলাখুলি সমর্থন জানাচ্ছে—এসব খবর আমজনতার অজানা নয়। কিন্তু কী নিয়ে এত তাপ-উত্তাপ, এত উৎসাহ, এত দ্বিধা, এত রাজনৈতিক চাপান-উতোর সেটা খুব পরিষ্কার করে একজন সাধারণ নাগরিকের পক্ষে না জানাটাই স্বাভাবিক। অথচ জিএসটি চালু হলে সাধারণ মানুষকেই তার সুফল বা কুফল ভোগ করতে হবে। তাই জিএসটি বস্তুটা ঠিক কী, চালু হলে সাধারণ মানুষের ওপর কী বা তার সম্ভাব্য প্রভাব হতে পারে এইসব ব্যাপারে প্রতিটি নাগরিকেরই খানিকটা ধারণা থাকা দরকার।

জিএসটির পুরো নাম গুডস অ্যান্ড সারভিসেস ট্যাক্স বা বাংলা করে বললে, পণ্য ও পরিষেবা কর। নাম থেকে অবশ্য এর প্রকৃত চালচলন আন্দাজ করা সম্ভব নয়। জিএসটি-র এক পূর্বসূরী আছে, নাম ভ্যাট বা ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স, যা কয়েক বছর আগে চালু হয়েছিল। জিএসটিকে বোঝার আগে ভ্যাট জিনিসটাকে বোঝা দরকার কারণ জিএসটি আসলে ভ্যাটেরই পরিমার্জিত রূপ। ভ্যাটেরও আগে ছিল বিক্রয় কর। সবার আগে দেখতে হবে, বিক্রয় করের বদলে ভ্যাট আসার ফল কী হয়েছিল।

বিক্রয় কর এবং ভ্যাটের তফাতটা বোঝবার শ্রেষ্ঠ উপায় একটি সহজ উদাহরণের শরণাপন্ন হওয়া। ধরা যাক, দেশে দশ শতাংশ হারে বিক্রয় কর চালু আছে। এই অবস্থায়, একটি অন্তিম উৎপাদনকারী সংস্থা অপর একটি সংস্থার কাছ থেকে দশ টাকার কাঁচা মাল কিনল। এই দশ টাকার ওপর কর চাপল আরও এক টাকা, ফলে কর সমেত কাঁচা মাল কিনতে ক্রেতার খরচ হল এগারো টাকা। কাঁচা মাল কিনে তাতে আরও দশ টাকার মূল্য সংযোজন বা ভ্যালু অ্যাড করল অন্তিম উৎপাদনকারী। অর্থাৎ কাঁচা মাল, কাঁচা মালের ওপর কর, উৎপাদনকারীর নিজস্ব মূল্য সংযোজন, যার মধ্যে মুনাফা ও মজুরি দুই-ই আছে, সব মিলিয়ে জিনিসটার দাম গিয়ে দাঁড়াল একুশ টাকা। ভোক্তার কাছে বিক্রি করার সময় আবার তার ওপর দশ শতাংশ কর চাপল, ফলে জিনিসটার জন্য ভোক্তা খরচ করল তেইশ টাকা দশ পয়সা। অর্থাৎ উৎপাদন ও অন্তিম বিক্রয়ের শেষে কাঁচা মাল বিক্রেতা পেল তার সংযোজিত মূল্য দশ টাকা, উৎপাদনকারী পেল তার সংযোজিত মূল্য দশ টাকা আর কর বাবদ সরকারের ঘরে জমা হল তিন টাকা দশ পয়সা।

লক্ষণীয় যে, এখানে সরকার যদিও দশ শতাংশ হারে বিক্রয় কর ধার্য করছে, আসলে কিন্তু কুড়ি টাকা মূল্যের জিনিসটার ওপর সরকার কর নিচ্ছে তিন টাকা দশ পয়সা। অর্থাৎ প্রকৃত করের হার গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সাড়ে পনের শতাংশ। এর কারণ, সরকার কাঁচামালের ওপর দুবার কর পাচ্ছে, একবার সরাসরি, আর একবার পরোক্ষভাবে, অন্তিম উৎপাদনের ওপর করের অংশ হিসেবে—যেহেতু অন্তিম দ্রব্যের দামের ভেতর কাঁচা মালের দামও ধরা আছে। করের হার আরও বেড়ে যাচ্ছে কারণ কাঁচা মালের ওপর যে এক টাকা কর দেওয়া হল, চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে আবার তার ওপর দশ শতাংশ কর বসছে, অর্থাৎ সরকার একবার দেওয়া করের ওপর আবার কর পাচ্ছে।

ভ্যাট চালু হবার পর একই জিনিসের ওপর একাধিক বার কর চাপার সমস্যা খানিকটা কমল। আমাদের উদাহরণে ফিরে যাই। উদাহরণে, অন্তিম উৎপাদনকারী সংস্থাটি কাঁচা মালের ওপর যে এক টাকা কর দিয়েছিল, ভ্যাট চালু হবার পর সেটি সরকার তাকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছে। কর বসছে অন্তিম ভোগের সময়, শুধুমাত্র মোট সংযোজিত মূল্য কুড়ি টাকার ওপর। কাঁচা মালের ওপর কর ফেরত পেতে গেলে দাবীদারকে

কাঁচা মাল কেনার ক্যাশমেমো দেখাতে হচ্ছে, ফলে সাধারণভাবে কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা কমছে। একই সঙ্গে মোট কর কমে যাবার কারণে জিনিসের দাম কমছে, সাধারণ মানুষ একটু স্বস্তি পাচ্ছেন।

ভ্যাট কিন্তু সব সমস্যা মেটাতে পারেনি। মূলত দু'টো সমস্যা রয়ে গেছে যার ফলে সাধারণ ভোক্তাকে এখনও খানিকটা করের ওপর কর দিতে হয়। প্রথম সমস্যা, পরোক্ষ কর হিসেবে যেমন রাজ্যের ভ্যাট রয়েছে, তেমনি রয়েছে কেন্দ্রের আবগারি শুল্ক। আমাদের উদাহরণে কাঁচা মালের ওপর যে দশ শতাংশ কর ধার্য হয়েছিল, ধরা যাক, তার পাঁচ শতাংশ রাজ্যের কর আর বাকি পাঁচ শতাংশ কেন্দ্রের আবগারি শুল্ক। আরও ধরা যাক, অন্তিম পণ্যটি রাজ্যের মধ্যেই উৎপাদন ও ভোগ করা হচ্ছে। ভ্যাট ব্যবস্থায় যখন অন্তিম পণ্যের ওপর কর বসছে, তখন রাজ্য তার প্রাপ্য কর থেকে কাঁচা মালের ওপর প্রাপ্ত পাঁচ শতাংশ কর উৎপাদককে ফিরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আবগারি শুল্কের ওপর অন্তিম করটা থেকেই যাচ্ছে। সেটা উৎপাদককে কেউ ফিরিয়ে দিচ্ছে না। ফলে একটা করের ওপর আবার কর বসছে। তাছাড়া, যদি অন্তিম পণ্যের ওপরেও আবগারি শুল্ক থাকে তাহলে কেন্দ্রিয় সরকার কাঁচা মালের ওপর দু'বার করের বোঝা চাপাচ্ছে। একবার সরাসরি, আর একবার পরোক্ষভাবে, অন্তিম মূল্যের মধ্যে কাঁচা মালের মূল্যটাও ঢুকে আছে বলে।

দ্বিতীয় সমস্যা, আন্তঃরাজ্য পণ্য বিক্রি নিয়ে। আমাদের উদাহরণে ধরা যাক কাঁচা মাল কিনে উৎপাদন হল একটা রাজ্যে আর অন্তিম পণ্যটি বিক্রি করা হল আর একটা রাজ্যে। ভোক্তা রাজ্য অন্তিম পণ্যের ওপর কর পেল আর উৎপাদক রাজ্য কর পেল কাঁচা মালের ওপর। এবার ভোক্তা রাজ্য তার প্রাপ্ত কর থেকে কাঁচা মালের কর ফেরত দিতে যাবে কেন? কাঁচা মালের ওপর কর ভোক্তা রাজ্য তো পায়নি। এই জটিলতার জন্য করের ওপর কর চাপার সমস্যাটা থেকেই গেল, কাঁচা মালের ওপর দু'বার কর চাপার সমস্যাটাও।

জিএসটির প্রধান উদ্দেশ্য ভ্যাট ব্যবস্থায় কিছু কিছু মৌলিক পরিবর্তন এনে উপরি-উক্ত সমস্যা দু'টির সমাধান করা। জিএসটির আর একটা উদ্দেশ্য পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে পরিষেবাকেও ভ্যাটের আওতায় নিয়ে আসা। আমরা এখানে জিএসটির প্রধান উদ্দেশ্য নিয়েই আলোচনা করব। জিএসটি-র শ্বেতপত্রে তিন ধরনের জিএসটির কথা বলা হয়েছে। এসজিএসটি, যেটা রাজ্যগুলি আদায় করবে এবং রাজ্যের সমস্ত কর যার মধ্যে ঢুকে যাবে, সিজিএসটি যেটা কেন্দ্র আদায় করবে এবং যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে আবগারি শুল্ক সমেত কেন্দ্রের সমস্ত কর, এবং আইজিএসটি যেটা আন্তঃরাজ্য পণ্য বিক্রির ওপর কেন্দ্র আদায় করবে। এর বাইরে অবশ্য মদ, পেট্রপণ্য ইত্যাদি দু'চারটে জিনিস রাখা হয়েছে যার ওপর রাজ্যগুলো ইচ্ছে মতো কর বসাতে পারবে।

জিএসটি ব্যবস্থায় কাঁচা মালের ওপর কেন্দ্রের সিজিএসটি চাপলে সেটা অন্তিম স্তরে রাজ্য বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দেবে। পরে সেই অঙ্কের টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে ফেরত পেয়ে যাবে রাজ্য। আবার এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে পণ্য বিক্রি হলে তার ওপর যে আইজিএসটি বসবে সেটা যদিও সংগ্রহ করবে কেন্দ্রিয় সরকার, তার মধ্যে যেটা সিজিএসটি হিসেবে কেন্দ্রের প্রাপ্য সেটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে বাকিটা ভোক্তা রাজ্যকে কেন্দ্র ফিরিয়ে দেবে। এর ফলে উৎপাদক রাজ্যগুলি মার খাবে, লাভবান হবে ভোক্তা রাজ্য। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার জন্য আবার সেই উদাহরণে ফিরে যাওয়া দরকার।

ধরা যাক, মহারাষ্ট্রের কোনও সংস্থা নিজের রাজ্যে দশ টাকার কাঁচা মাল কিনে এবং আরও দশ টাকার মূল্য সংযোজন করে অন্তিম পণ্যটি পশ্চিমবঙ্গে বিক্রি করল। আরও ধরা যাক, কাঁচা মাল কেনার সময় তাকে পাঁচ শতাংশ এসজিএসটি এবং পাঁচ শতাংশ সিজিএসটি দিতে হল। সংস্থাটি যখন পশ্চিমবঙ্গে অন্তিম পণ্যটি বিক্রি করছে তখন সেই পণ্যটির সংযোজিত মূল্য কুড়ি টাকা। অতএব সেই কুড়ি টাকার ওপর আইজিএসটি বসল দশ শতাংশ যার মধ্যে ধারণাগতভাবে পাঁচ শতাংশ সিজিএসটি এবং পাঁচ শতাংশ এসজিএসটি। করের এই পুরো দু'টাকাই কিন্তু কেন্দ্র সংগ্রহ করছে। এক টাকা সিজিএসটি হিসেবে কেন্দ্র নিজে রেখে দিচ্ছে, বাকি এক টাকা এসজিএসটি হিসেবে দিয়ে দিচ্ছে ভোক্তা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে। একই সঙ্গে বিক্রেতা সংস্থাকে কেন্দ্র মোট এক টাকা ফেরত দিচ্ছে যেহেতু সংস্থাটি কাঁচা মালের ওপর এক টাকা কর দিয়েছিল। এর থেকে

আবার পঞ্চাশ পয়সা মহারাষ্ট্রের কাছ থেকে কেন্দ্র আদায় করে নিচ্ছে। অর্থাৎ এই উৎপাদন ও বিক্রয় থেকে কেন্দ্র পাচ্ছে মোট এক টাকা, ভোক্তা রাজ্য পাচ্ছে এক টাকা। উৎপাদক রাজ্য কিছুই পাচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে, কেন মহারাষ্ট্র-গুজরাত-তামিলনাড়ুর মত উৎপাদক রাজ্যগুলো জিএসটি নিয়ে আপত্তি করছিল বা এখনও আপত্তি করছে আর কেনই বা পশ্চিমবঙ্গের মতো মোটের ওপর ভোক্তা রাজ্যগুলো জিএসটির ব্যাপারে গোড়া থেকেই উৎসাহী।

জিএসটির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, এর ফলে যেহেতু সারা দেশে একটা অভিন্ন কর-ব্যবস্থা চালু হবে, তাই রাজ্যগুলি কর বসানোর ব্যাপারে তাদের স্বাধিকার হারাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কর বসানোর ব্যাপারে স্বাধিকার থাকলেই কি রাজ্যগুলির ভাল হত? আমরা দেখেছি, অতীতে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য রাজ্যগুলি কর কমানোর একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। এর ফলে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির লাভ হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে রাজ্য সরকারগুলির রাজকোষের। এর বদলে যদি রাজ্যগুলি এক সঙ্গে বসে কর-কাঠামো ঠিক করে তাহলে কর-ব্যবস্থায় একটা সমন্বয় আসবে যেটা রাজ্যগুলির দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পক্ষে নিতান্তই জরুরি।

সাধারণ মানুষ অবশ্য মূলত জানতে চায় নতুন ব্যবস্থার ফলে কোন কোন জিনিসের দাম কমবে আর কোন কোন জিনিসের দাম বাড়বে। দুর্ভাগ্যবশত, এই প্রশ্নের উত্তর এখনই পাওয়া যাবে না। এর জন্য বিভিন্ন পণ্যের ওপর ঠিক কত হারে জিএসটি ধার্য হল সেটা জানতে হবে। এখানে আমাদের একটা আশঙ্কা আছে। গত কয়েক বছর যাবত দেখা যাচ্ছে, রাজস্বের জন্য কেন্দ্রিয় সরকার ক্রমশ প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের দিকে ঝুঁকছে যেহেতু প্রত্যক্ষের চেয়ে পরোক্ষ কর সংগ্রহ করা অনেক সহজ। তাই ভয় হয় নতুন কাঠামোতে করের হার মাত্রাতিরিক্ত না হয়ে যায়। এরকম হলে কিন্তু জিএসটির মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির ওপর লাগাম পরানোর মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য সুরক্ষা ও কৃষি

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে, চাকরি-বাকরি নেই, শিল্পে বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ তলানিতে। এর সঙ্গে আছে ছোট-বড়-মাঝারি নানান মাপের চুরি-চামারি, তঞ্চকতা। এসব নিয়ে আমজনতা ভীত, বিরক্ত, কোনঠাসা। তবে সাধারণ মানুষকে সব থেকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে ধারাবাহিক মূল্যবৃদ্ধি। জানা দরকার, এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকারি নীতি বা দুর্নীতি কতটা দায়ী।

প্রথমে কিছু পরিসংখ্যান। সম্প্রতি ভারত সরকারের সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিকাল অফিস বা সিএসও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে তা রীতিমত উদ্বেগজনক। সিএসও জানাচ্ছে, নভেম্বর ২০১২ থেকে নভেম্বর ২০১৩ এই এক বছরে সার্বিকভাবে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার প্রায় ৮ শতাংশ। এর মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ২০ শতাংশ, ফলমূল ও শাকসব্জির সম্মিলিত মূল্যবৃদ্ধি ৫৩ শতাংশ, আর আলাদা করে শাকসব্জির মূল্যবৃদ্ধির হার ৯৫ শতাংশ। পেঁয়াজের পাইকারি দাম এক বছরে ১৯০ শতাংশ বেড়েছে, আলুর দাম বেড়েছে ২৭ শতাংশ। শীতের সব্জি বাজারে আসতে শুরু করার ফলে ইদানিং তরি-তরকারির দাম কিছুটা কমেছে বটে, কিন্তু অন্যান্য বছরের তুলনায় দাম এখনও চড়া। এই মূল্যবৃদ্ধি, যার মূল উপাদান খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, কেন ঘটছে?

একটা বড় অংশ মানুষের ধারণা, শাকসব্জি ও আলু-পেঁয়াজের দাম বাড়ার জন্য মজুতদারদের শয়তানি-ই মূলত দায়ী। একটু ভাল করে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ধারণাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। মজুতদারেরা জিনিসপত্র মজুত করেন লাভের আশায়। তাঁদের সেই আশা তখনই পুর্ণ হয় যখন তাঁরা কম দামে জিনিস কিনে বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন। অর্থাৎ যদি ধরে নিই, মজুতদারেরা মোটের ওপর লাভ করছেন, তাহলে এটাও ধরে নিতে হবে যে, তাঁরা আগে কম দামে কিনছেন এবং পরে বেশি দামে বিক্রি করছেন। কিন্তু কম দামের সময় কিনতে গিয়ে তাঁরা জিনিসের চাহিদা এবং দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন, আবার বেশি দামের সময় বিক্রি করতে গিয়ে জিনিসের যোগান ও দাম কমিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ মজুতদারেরা আছেন বলে জিনিসপত্রের দামে একটা স্থিতি আসছে, দাম ওঠানামা করছে না। তাছাড়া, অনির্দিষ্টকাল জিনিসপত্র মজুত করে রেখে কোনও লাভ নেই, লাভ করতে গেলে জিনিসপত্র বিক্রি করতেই হবে। কিন্তু বিক্রি করতে গেলেই তো জিনিসের দাম পড়বে। তাই বেশ কিছুদিন ধরে যদি জিনিসের দাম বাড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেই দাম বাড়ার পেছনে মজুতদারি ছাড়া অন্য কোনও কারণ আছে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, হঠাৎ অল্প কিছুদিনের জন্য দাম বেড়ে যাওয়ার পেছনে মজুতদারদের হাত থাকতেই পারে, কিন্তু যদি দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে দাম বেড়েই চলেছে তাহলে তার পেছনে আরও মৌলিক কোনও কারণ আছে, ধরে নিতে হবে।

মৌলিক কারণ মানে চাহিদা অথবা যোগানে কোনও মৌলিক পরিবর্তন। আমরা দেখাবার চেষ্টা করব, গত কুড়ি বছরে কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যের বাজারে কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং মূল্যবৃদ্ধির এটাই আসল কারণ। প্রথমে চাহিদার দিকটা দেখব। এটা সর্বজনবিদিত যে, ক্ষমতায় আসার পর থেকে কংগ্রেস সরকার বিরাট আকারের কয়েকটা জনহিতকর প্রকল্প শুরু করেছিল। তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান নিশ্চিতিকরণ বা চলতি কথায় একশ দিনের কাজের প্রকল্পটির জন্যই প্রতি বছর গড়ে তিরিশ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এর ফলে, সন্দেহ নেই, গ্রামের গরিব মানুষদের হাতে কিছু বাড়তি টাকা-পয়সা এসেছে। মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তর হাতে বাড়তি টাকা এলে তাঁরা নতুন মডেলের গাড়ি-টিভি-মোবাইল

কিনে থাকেন। গরিব মানুষের হাতে টাকা এলে তাঁরা কেনেন খাবার। অতএব, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে একশ দিনের কাজের প্রকল্পটির কারণে গ্রামে খাদ্যের চাহিদা বেড়েছে।

কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে ধারণাটা ধোপে টেকে না। একশ দিনের কাজের জন্য খাবারের চাহিদা কতটা বাড়তে পারে তার একটা মোটামুটি আন্দাজ করা সম্ভব। ২০১১ সালের সেনসাস অনুযায়ী ভারতের গ্রামে ৮৩ কোটি মানুষ বাস করেন। আবার জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ২০০৯-১০-এর একটা রিপোর্ট থেকে জানতে পারছি, প্রতি মাসে ভারতের গ্রামে মাথাপিছু গড়ে খাবারের পেছনে ৬০০ টাকা খরচ করা হয়। এই দুই পরিসংখ্যান থেকে হিসেব করা যাচ্ছে ভারতের গ্রামে এক বছরে খাবারের ওপর খরচ হয় মোটামুটি ৬ লক্ষ কোটি টাকা। অতএব যদি ধরে নিই, একশ দিনের কাজের পুরো ৩০ হাজার কোটি টাকাটাই খাবারের পেছনে খরচ হচ্ছে, তাহলেও দেখা যাচ্ছে সেই খরচ গ্রামে খাদ্যের ওপর মোট খরচের ৫ শতাংশের বেশি নয়।

৫ শতাংশের হিসেবটাও আবার অতিরঞ্জিত। প্রথমত, তিরিশ হাজার কোটি খরচ হলেও তার পুরোটা যে গরিব মানুষের হাতে পৌঁছচ্ছে না আমরা তা ভাল করেই জানি। দ্বিতীয়ত, গরিব মানুষের চাহিদার চিত্রটাও এখন বদলাচ্ছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার নানা সময়ের রিপোর্টগুলো পাশাপাশি রাখলেই দেখতে পাব একেবারে হত দরিদ্ররাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের ওপর খরচ কমিয়ে অন্যান্য সামগ্রীর ওপর খরচ বাড়াচ্ছেন। এসবের থেকে মনে হয়, একশ দিনের কাজের জন্য গ্রামে খাবারের ওপর খরচ ৫ শতাংশের অনেক কমই বেড়েছে। কাজেই এই বৃদ্ধি দিয়ে ২০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

যোগানের দিক থেকে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির খানিকটা একশ দিনের কাজ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তিরিশ হাজার কোটি টাকার সবটা গরিব মানুষের কাছে না পৌঁছলেও, ধরে নেওয়াই যায়, একশ দিনের কাজ প্রকল্পটির ফলে কিছু টাকা গ্রামের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির হাতে পৌঁছেচে। এর প্রমাণ, একশ দিনের কাজ প্রকল্পটি শুরু হবার পর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে গ্রামে শ্রমিকদের মজুরি। বস্তুত, ২০০৪-০৫-এর তুলনায় ২০১২-১৩ সালে কৃষির মজুরি বেড়েছে প্রায় ২.২৫ গুণ। যখন ইচ্ছে তখন ন্যূনতম মজুরিতে কাজ পাওয়া যাচ্ছে বলে গ্রামের অভাবি ভূমিহীনরা আর যে কোনও মজুরিতে চাষের কাজ করতে রাজি নয়। ফলে চাষের খরচ বেড়েছে, বেড়েছে কৃষিপণ্যের দাম। এখানে বলা দরকার, চাষের মজুরি বাড়াটা মোটেই অনভিপ্রেত নয়, যদি সেই মজুরি বাড়ার কারণ হয় শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ছাড়াই মজুরি বেড়েছে বলে যত সমস্যা।

কিন্তু সব থেকে বড় কথা, আমাদের দেশে তথাকথিত বাজারমুখি নীতি গ্রহণ করার পর থেকে, অর্থাৎ নব্বই দশকের গোড়া থেকে, কৃষিকে মোটের ওপর অবজ্ঞা করা হয়ে আসছে। পাদপ্রদীপের আলো পুরোপুরি শিল্প এবং আধুনিক পরিষেবার ওপর। এর পরিণতি হিসেবে দেখতে পাচ্ছি, গত কুড়ি-বাইশ বছরে জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে, কৃষিজাত খাদ্য-সামগ্রীর উৎপাদন বেড়েছে তার থেকে কম হারে। ফলে গত দু'দশক ধরে মাথাপিছু কৃষিজাত খাদ্যশস্যের যোগান ক্রমশ কমছে। কাজেই খাবারের দাম যে বাড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী।

কীভাবে কৃষির উৎপাদন আরও বেশি হারে বাড়ানো যেত ? মোট জমির তুলনায় ভারতে চাষ হওয়া জমির অনুপাত যথেষ্টই বেশি, এতটাই বেশি যে চাষের জমি আর বাড়ানো সম্ভব নয়। বরং শিল্পায়ন ও নগরায়নের চাপে ভবিষ্যতে চাষের জমি আরও কমতে পারে। সেক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর একমাত্র উপায় কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, অর্থাৎ একই জমিতে বেশি বার এবং বেশি করে ফসল ফলানো। বস্তুত, উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতের কৃষিতে উৎপাদনশীলতা লজ্জাজনকভাবে কম। অতএব উৎপাদনশীলতা বাড়ানো অবশ্যই সম্ভব।

কিন্তু উৎপাদনশীলতা বাড়বে কেমন করে, আমাদের কৃষিক্ষেত্রের একটা বড় অংশ যে এখনও আদিম যুগে পড়ে রয়েছে। মোট কৃষি জমির অর্ধেকের বেশিতে সেচের জল পৌঁছয়নি। অনাবৃষ্টি হলে সেখানে ফসল ফলে

না আর অতিবৃষ্টি হলে ফসল ফলেও পচে যায়। উৎপাদনের শৈলি, অধিকাংশ জমিতে, আজও অনাধুনিক। জমি বহুখণ্ডিত, আধুনিক যন্ত্রনির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত। ছোট ও মাঝারি কৃষক তাঁদের উৎপাদনের সঠিক দাম পান না। বাজারের চড়া দামের প্রায় পুরোটাই মধ্যসত্ত্বভোগীদের পকেটে চলে যায়। এই মধ্যযুগীয় বাতাবরণের থেকে বেরোতে না পারলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যাবে না।

সরকারি উদারনীতির একাধিক গলদ। প্রথমত, শিল্পের ওপর জোর দিতে গিয়ে সরকার দীর্ঘদিন যাবত কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের কথা ভুলতে বসেছে। দ্বিতীয়ত, 'শিল্পায়ন শিল্পায়ন' বলে গলা ফাটানো হচ্ছে, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রকে আধুনিক করার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করা হচ্ছে না। স্মরণ করা যেতে পারে, উন্নত দেশগুলোতে শিল্পের মতো কৃষিও বৃহৎ পুঁজির দ্বারা পরিচালিত। কৃষি-উৎপাদক কোম্পানিগুলি শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত। আমাদের দেশে সেই ধরণের পরিবেশ তৈরি হতে দেরি আছে, কিন্তু শুরুটা এখনই করা সম্ভব। বড় কোম্পানিগুলো কৃষিতে বিনিয়োগ করলে, শুধু যে মধ্যসত্ত্বভোগীদের দাপট কমবে তাই নয়, প্রযুক্তিরও দ্রুত উন্নতি ঘটবে। বোঝা দরকার, হস্ত এবং কুটির শিল্প থেকে বৃহৎ শিল্পতে উত্তরণকে আমরা যেমন উন্নতি বলে মেনে নিয়েছি, কৃষিতেও তেমনি আদিম, শ্রমনিবিড়, মধ্যযুগীয় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে আধুনিক, যন্ত্রনির্ভর, পুঁজিনিবিড় রূপান্তরকেই বিকাশের রাস্তা বলে মেনে নিতে হবে।

(২)

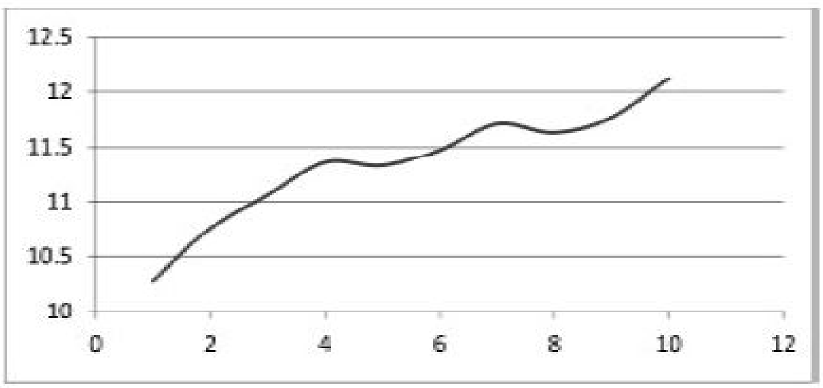
আসছে খাদ্য সুরক্ষা বিল। লোকসভায় খোলাখুলি বিতর্কের মধ্যে দিয়ে পাস হয়ে নয়, বাঁকা পথে, অর্ডিনান্স করে। রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সই দিয়েছেন। এখন বিলটির রূপায়িত হতে বোধকরি কেবল সময়ের অপেক্ষা। কংগ্রেস বলছে, গরিব মানুষের জন্য এমন উপকারী বিল আগে কখনও আসেনি। বিরোধীরা বলছে, এসবই রাজনৈতিক চাল, এতে গরিব মানুষের উপকার হওয়ার বদলে অপকারই হবে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, বিলটি বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে বাড়তি খরচ হবে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ কোটি টাকা। অর্থনীতির ওপর এই বিপুল পরিমাণ খরচের একটা বড় প্রভাব তো থাকবেই। প্রশ্ন হল, এই প্রভাবের ফলে মানুষের, বিশেষ করে গরিব মানুষের, ভালো হবে, না খারাপ?

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল ভারতীয়দের তিন ভাগে ভাগ করে নিচ্ছে। প্রথম ভাগে রয়েছেন সমাজের দরিদ্রতম মানুষ যাঁদের জন্য বিলে সব থেকে বেশি সুবিধে দেবার কথা বলা হয়েছে। বিল অনুযায়ী, এই শ্রেণির মানুষ রেশনের দোকান থেকে তিন টাকা কেজি দরে চাল, দু'টাকা কেজি দরে গম এবং এক টাকা কেজি দরে জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি নিম্নতর মানের শস্য মাসে মাথাপিছু মোট সাত কেজি কিংবা পরিবারপিছু পঁয়ত্রিশ কেজি কিনতে পারবেন। এর পরে রয়েছে আর একটি স্তরের মানুষ, রেশনের দোকান থেকে যাঁদের বরাদ্দ হবে মাসে মাথাপিছু তিন কেজি খাদ্যশস্য। যে মূল্যে সরকার কৃষকদের কাছ থেকে শস্য সংগ্রহ করেছেন তার অর্ধেক দামে এই দ্বিতীয় স্তরের মানুষ তাঁদের বরাদ্দ খাদ্যশস্য রেশনের দোকান থেকে কিনতে পারবেন। এই দুই শ্রেণীর বাইরে যাঁরা রয়ে গেলেন, খাদ্য সুরক্ষা বিল তাঁদের সমাজের ওপরতলার মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করছে। এঁরা রেশন ব্যবস্থা থেকে কোনও সুবিধেই পাবেন না। সুরক্ষা বিল বলে দিচ্ছে, গ্রামীন জনসংখ্যার পঁচাত্তর শতাংশ এবং শহুরে জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ খাদ্য সুরক্ষার আওতায় আসবেন। এর মধ্যে ছেচল্লিশ শতাংশ গ্রামের মানুষ এবং আঠাশ শতাংশ শহরের মানুষ দরিদ্রতম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রেশন ব্যবস্থা থেকে সব চেয়ে বেশি সুবিধে পাবেন। এছাড়াও বিলে গর্ভবতী এবং স্তনদায়িনী মায়েদের জন্য, শিশুদের জন্য এবং অতি-দরিদ্র, গৃহহীন ও নিরন্নদের জন্য বিশেষ খাদ্য-যোগানের কথা বলা হয়েছে।

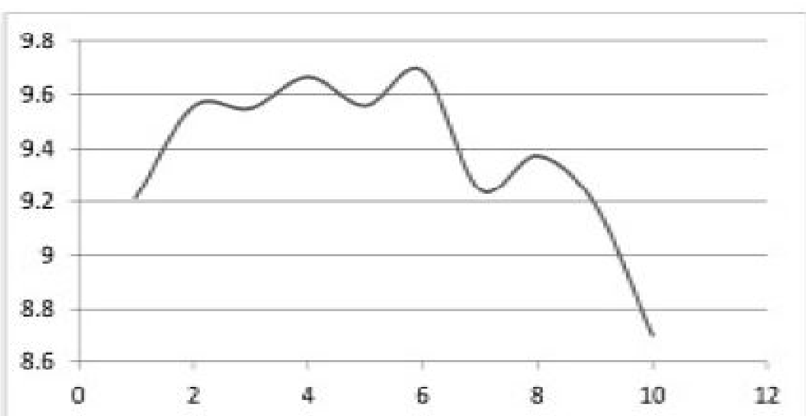
বলতেই পারেন, এ তো অতি চমৎকার প্রস্তাব। গরিব মানুষ, নিরন্ন মানুষ, এমনকি তুলনামূলকভাবে অস্বচ্ছল মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবেন তার থেকে ভালো আর কী হতে পারে? কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, বিল পাশ করা এবং তাকে কাজে করে দেখানোর মধ্যে অনেক ফারাক আছে। আমাদের সংশয়গুলো এক এক করে বলি। আমাদের প্রথম সংশয়, এই যে গরিব মানুষদের সস্তায় চাল-গম

দেবার কথা বলা হচ্ছে, তার জন্য যথেষ্ট খাদ্যশস্য আমাদের দেশে উৎপন্ন হবে তো? রেশনের দোকান থেকে কম দামে চাল-গম পাওয়া গেলে ক্রেতার হাতে কিছু টাকা বেঁচে যাবে। সেই বাড়তি টাকা দিয়ে গরিব ক্রেতাটি কি খানিকটা বাড়তি খাদ্যশস্য কিনবেন না?

হাতে বাড়তি টাকা এলে গরিব মানুষ 'প্লাস্টিকের চিরুনি, শ্যাম্পুর খুদে প্যাকেট, টিপের পাতা কিনছেন' ('নিরাপত্তা আর গরিবের পক্ষে নিরাপদ নয়' অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাতী ভট্টাচার্য, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮.৭.১৩) এমন নজির ভুরি ভুরি। এবং এর ফলে প্রয়োজনীয় পুষ্টির যে অভাব ঘটছে এটা ঠিক। কিন্তু হাতে বাড়তি টাকা এলে যে কিছু মানুষ সেই বাড়তি টাকার একটা অংশ বাড়তি খাদ্যশস্য কিনতে খরচ করেন, এটাও ঠিক। চিত্র ১ এবং চিত্র ২ যথাক্রমে গ্রাম ও শহর সম্পর্কিত। এন এস এস ও-র সাম্প্রতিকতম (২০০৯-১০) নমুনার ভিত্তিতে ছবি দুটি আঁকা হয়েছে। মাথাপিছু মাসিক খরচের ওপর ভিত্তি করে এন এস এস ও গ্রাম ও শহরের ভোক্তাদের দশটি মোটামুটি সমান ভাগে ভাগ করেছে। এক-একটি ভাগ এক একটি শ্রেণি, তাদের নম্বর দেওয়া হচ্ছে ১ থেকে ১০।



চিত্র ১ গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের খাদ্যশস্য ভোগ
(মাথাপিছু/প্রতি মাসে/কেজিতে)



চিত্র ২ শহরে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের খাদ্যশস্য ভোগ
(মাথাপিছু/প্রতি মাসে/কেজিতে)

মাসিক খরচের দিক থেকে নিম্নতম ১ নম্বর, উচ্চতম ১০ নম্বর। এক-একটি শ্রেণিতে পড়ছে মোটামুটি দশ শতাংশ করে মানুষ। গ্রামের মানুষদের ক্ষেত্রে যত উচ্চতর শ্রেণিতে যাচ্ছি মোটের ওপর তত বাড়ছে মাথাপিছু ভোগ। যেমন গ্রামে নিম্নতম শ্রেণির মাথাপিছু খাদ্যশস্যের ভোগ মাসে সাড়ে দশ কেজির কম, উচ্চতম শ্রেণির ভোগ ১২ কেজির ওপর। শহরের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কোনও নিয়ম খাটছে না। শহরে একেবারে নিম্নতম শ্রেণির ক্ষেত্রে আয় বাড়লে খাদ্যশস্যের ভোগ খানিকটা বাড়ছে বটে, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণির ক্ষেত্রে তেমন নির্দিষ্ট কিছু ঘটছে না, আর ৬ নম্বর শ্রেণি অর্থাৎ ৬০ শতাংশ-এর ওপরের মানুষদের থেকে খাদ্যশস্যের ভোগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে। গ্রামের তুলনায় শহরের গরিবদের কাছে শস্তার চিরুনি-সাবান-মোবাইলের হাতছানি অনেক বেশি, তাই তাদের খাদ্যশস্যের চাহিদাও খানিকটা এলোমেলো। আর শহরের অবস্থাপন্নরা ভাত-রুটির বদলে শাক-সব্জি, ফলমূল, মাছ-মাংস দিয়ে পেট ভরাচ্ছেন।

কিন্তু এইসবের থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, শহরে না হোক অন্তত গ্রামে মানুষের হাতে বাড়তি টাকা এলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়বেই। অর্থাৎ রেশনে শস্তায় চাল-গম দিলে গ্রামের মানুষের হাতে যে বাড়তি টাকাটা আসবে তার খানিকটা দিয়ে তাঁরা খোলা বাজারে আরও খাদ্যশস্য কিনতে চাইবেন। খাদ্যশস্যের সার্বিক চাহিদার ওপর এর প্রভাব উড়িয়ে দেওয়া যায় না যেহেতু শেষতম সেনসাস অনুযায়ী ভারতের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ এখনও গ্রামে বাস করেন। সমস্যা হল, চাহিদা বাড়লেও খাদ্যশস্য উৎপাদন রাতারাতি বাড়ানো অসম্ভব। বর্তমান অবস্থায়, যেখানে বিদেশি মুদ্রার প্রচণ্ড অভাব, সেখানে আমদানি করেও চাহিদা-যোগানের বৈষম্য মেটানো সম্ভব নয়। অতএব চাহিদার তুলনায় যোগানের ঘাটতি মেটানোর একমাত্র উপায় খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি।

এই মূল্যবৃদ্ধির আঁচ যে শুধুমাত্র অবস্থাপন্নদের ওপর পড়বে তা নয়। দরিদ্রতমরাও এর কবল থেকে বাঁচতে পারবেন না। লক্ষনীয় যে, গ্রামের দরিদ্রতম শ্রেণিকেও তাদের মাসিক ভোগের একটা অংশ খোলাবাজারে কিনতে হচ্ছে। গ্রামের দরিদ্রতম শ্রেণি নতুন ব্যবস্থায় রেশনে খাদ্যশস্য পাচ্ছেন মাসে মাথাপিছু ৭ কেজি আর চিত্র ১-এ দেখতে পাচ্ছি প্রতি মাসে মাথাপিছু তাঁদের চাহিদা ১০ কেজির ওপর। এই বাড়তি অংশটা তাঁদের বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে। এছাড়া হাতে বেশি টাকা আসার ফলে তাঁরা যদি আরও কিছুটা চাল-গম কেনেন, সেটাও বাজার থেকেই কিনতে হবে। ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের দাম বাড়বে। দাম বাড়লে, যাঁরা ভর্তুকি পাচ্ছেন না তাঁদের সরাসরি ক্ষতি। কিন্তু যেহেতু ভর্তুকি না পাওয়া শ্রেণিটি অবস্থাপন্ন এবং যেহেতু খাদ্যশস্যকে অনায়াসে অতি প্রয়োজনীয় বলা চলে, তাই ধরে নেওয়া যায়, দাম বাড়া সত্ত্বেও এই অবস্থাপন্ন শ্রেণি তাঁদের খাদ্যশস্যের চাহিদা খুব একটা কমাবেন না। ফলে, উৎপাদন না বাড়লে, খোলাবাজার থেকে গরিবরাও খুব বেশি বাড়তি খাদ্যশস্য কিনতে পারবেন না। মাঝখান থেকে শুধু চাল-গমের দামটাই বেড়ে যাবে, যেমন একশ দিনের কাজ চালু হওয়ার পর গরিব মানুষের হাতে টাকা আসার ফলে খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছিল।

সরকারের এই বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি থেকে তাহলে কে লাভবান হবেন? কিছু টাকা হয়ত কৃষির বাইরে খরচ হবে, এবং তার ফলে ছোট-বড় কিছু কিছু শিল্পের লাভ হতেই পারে। কিন্তু বাকি অংশ দিয়ে গরিব মানুষ বাড়তি খাদ্যশস্য কেনার চেষ্টা করবেন যার পরিমাণ আমাদের মতে খুব কম নয়। এই টাকাটা শেষ পর্যন্ত চলে যাবে কৃষিপণ্যের বড়-বড় ব্যাবসাদার মজুতদারদের হাতে।

কিন্তু আরও আগের প্রশ্ন, ভর্তুকির কতটা গরিব মানুষদের হাতে পৌঁছবে? সকলেই জানেন, বন্টন ব্যবস্থা না বদলাতে পারলে রেশনে ভর্তুকি দিয়ে লাভ নেই। সুরক্ষা বিলে অবশ্য সরকারি বন্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা বলা আছে। কিন্তু কীভাবে সেই পরিবর্তন আসবে, পরিবর্তন আসতে কতদিন সময় লাগবে এসব কাজের কথা কিছুই বলা নেই। বন্টন ব্যবস্থা বদলানোর আগেই সুরক্ষা বিল চালু করার অর্থ কিছু অসাধু লোককে পুকুর চুরির বন্দোবস্ত করে দেওয়া। এখানে আর একটা কথা আছে। আমাদের বন্টন

ব্যবস্থার দোষে বহু গরিব মানুষের রেশন কার্ড নেই। খোলাবাজারে চাল-গমের দাম বাড়লে এঁরা কিন্তু একেবারে মারা পড়ে যাবেন।

খাদ্য সুরক্ষা বিলের ব্যাপারে আমরা দু'টো সহজ কথা বলতে চাইছি। এক, উৎপাদন না বাড়িয়ে শুধুমাত্র টাকায় ভর্তুকি দিয়ে গরিব মানুষের খাদ্য-সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় না। দুই, আগে বন্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটলে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে গরিব মানুষের কাছে খাদ্য-সুরক্ষা পৌঁছে দেওয়া কার্যত অসম্ভব।

(৩)

আকাশের দেবতা আবার রুষ্ট হয়েছেন। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, এ-বছর বৃষ্টির প্রত্যাশিত পরিমাণ স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ৮৮ শতাংশ-এর বেশি হবে না। বস্তুত, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ৯০ শতাংশ-এর কম বৃষ্টি হলেই দেশে খরার অবস্থা ঘোষণা করা হয়। সেই নিরিখে, আবহাওয়া দপ্তরের আশঙ্কা, ছ'বছর পরে দেশে আবার একটা অনাবৃষ্টির বছর আসতে চলেছে।

আগেকার যুগে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসকে বিশ্বাস করা তো যেতই না, এমনকি জোর দিয়ে অবিশ্বাসও করা যেত না। দিনকাল বদলেছে। আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি জানার জন্য অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি বসেছে। সামনে কম্পিউটার ও অন্তরীক্ষে স্যাটেলাইটের সাহায্য নিয়ে এখন আবহাওয়াবিদ যা বলেন তা অক্ষরে অক্ষরে নাহলেও মোটের ওপর মিলে যায়। অতএব আবহাওয়া দপ্তরের আশঙ্কাটা ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না।

অনাবৃষ্টি হলে যে চাষের ক্ষতি হবে সেটা পরিষ্কার। চাষের ক্ষতি হলে উৎপাদন কমবে, খাদ্যশস্যের দাম বাড়বে। এতে ক্রেতাদের ক্ষতি, বিশেষ করে যেসব গরিব মানুষ তাঁদের উপার্জনের সিংহভাগ খাবারের পেছনে খরচ করেন, তাঁদের সর্বনাশ। অনেকে এখনও মনে করেন, কৃষিপণ্যের দাম বাড়লে ক্রেতারা শিল্প-পরিষেবার ওপর কম খরচ করবেন। ফলে এইসব ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দেবে। বোঝা দরকার, আমাদের দেশে কৃষির আপেক্ষিক গুরুত্ব কমতে কমতে এখন জাতীয় আয়ের তেরো-চোদ্দ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে শিল্প-পরিষেবার চাহিদা আর তেমন করে কৃষির ওপর নির্ভর করে না। কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, অনাবৃষ্টির মূল কুপ্রভাব মূল্যবৃদ্ধি।

সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কম হলে সমস্ত কৃষকের বিপদ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা ততটা স্বতঃসিদ্ধ নয়। বৃষ্টির পরিমাণে ঘাটতি দেখা দিলে ফসল কম হবে নিশ্চয়। কিন্তু ফসল কম হলেই কি কৃষকের আয় কমবে? চাহিদা-যোগান তত্ত্ব দিয়ে কিন্তু এই প্রশ্নের কোনও দ্ব্যর্থহীন উত্তর পাওয়া যাবে না। চাহিদা-যোগান তত্ত্ব বলবে উৎপাদনের যোগান কম হলে কৃষিপণ্যের দাম বাড়বে। কৃষকের আয় শুধু কতটা পণ্য তিনি বিক্রি করছেন তার ওপর নির্ভর করে না, কী দামে পণ্য বিক্রি করছেন তার ওপরেও নির্ভর করে। বস্তুত, পণ্য বিক্রি করে যে টাকাটা কৃষকের ঘরে ঢুকছে সেটা পণ্যের দাম এবং বিক্রিত পরিমাণের গুণফল। দেশে খরা হলে বিক্রিত শস্যের পরিমাণ কমছে, কিন্তু একই সঙ্গে শস্যের দাম বাড়ছে। ফলে এই দুই-এর গুণফলটা বাড়বে না কমবে সেটা আগে থেকে জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

অর্থনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে অবশ্য আর একটু এগোনো যেতে পারে। তত্ত্ব বলবে, কৃষিপণ্যের চাহিদা সাধারণভাবে অস্থিতিস্থাপক, অর্থাৎ দাম বাড়লেও এর চাহিদা তেমন একটা কমে না, যেহেতু, কৃষিপণ্যের অধিকাংশই বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, কৃষিপণ্যের যোগান যদি কমে যায়, চাহিদাকে কমে গিয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত যোগানের কাছাকাছি আসতে গেলে দামকে অনেকটা বাড়তে হবে। অর্থাৎ অনাবৃষ্টির কারণে যোগান কমলে, বাজারে চাহিদা-যোগানের ভারসাম্য রাখতে গিয়ে দাম বাড়বে অনুপাতে আরও অনেক বেশি। ফলে, দাম এবং বিক্রিত পরিমাণের গুণফলটি বেড়ে যাবার প্রবল সম্ভবনা। অর্থাৎ চাহিদা-যোগানের প্রাথমিক তত্ত্ব বলছে, কৃষি উৎপাদন কম হলে কৃষকের আয় বাড়বে।

এটা অবশ্য অতি সরলীকৃত তত্ত্ব। খরা হলে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত কৃষকের পকেটে বেশি টাকা ঢুকবে এটা ঠিক নয়। গরীব কৃষক তাঁর পণ্য নিয়ে বাজার পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেন না। তাঁরা নানা কারণে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে পূর্ব-নির্ধারিত দামে পণ্য তুলে দিতে বাধ্য হন। বাজারে শস্যের দাম বাড়লে কী এসে যায় তাঁদের? তাছাড়া কৃষিক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল অধিকাংশ মানুষেরই নিজস্ব জমি নেই বা থাকলেও তা অতি সামান্য। মূলত নিজেদের শ্রমের ওপর নির্ভর করেই এঁদের বেঁচে থাকতে হয়। এঁরা বাজার থেকে খাদ্যশস্য কিনে খান, তাই কৃষিপণ্যের দাম বাড়লে, শহরের গরিব মানুষদের মতো এঁদেরও সমূহ সর্বনাশ। অপরপক্ষে অনাবৃষ্টির কারণে উৎপাদন কম হলে ধনী কৃষক বা বড় মধ্যস্বত্বভোগীর দুটো কারণে লাভ। প্রথমত, উৎপাদন কম হওয়ার কারণে কৃষিপণ্যের ওপর ভোক্তাদের মোট খরচ (অর্থাৎ পণ্যের দাম ও বিক্রিত পরিমাণের গুণফল) বেড়ে যাচ্ছে বলে লাভ, এবং দ্বিতীয়ত, খরার বছরে মজুতদারি ও ফাটকাবাজি করে আরও কিছু লাভ। এক কথায় বলতে গেলে, অনাবৃষ্টিতে গ্রাম ও শহরের গরিব মানুষ মার খায় আর ধনী কৃষক ফুলে ফেঁপে ওঠে।

এর প্রতিকার করার জন্য সরকারের এক বিপুল শস্যভাণ্ডার আছে। ধান-গমের আকাল দেখা দিলে, সরকার যদি তার ভাণ্ডার থেকে কিছু বাড়তি শস্য বাজারে ছাড়ে, কিংবা বাজার থেকে স্বাভাবিকের তুলনায় কম পরিমাণ শস্য সংগ্রহ করে, তাহলে বাজারে যোগানের ঘাটতি কমবে, খাদ্যশস্যের দামের ওপরেও একটা লাগাম পরানো যাবে। আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু বলছে, ধান-গমের দাম স্থিতিশীল রাখার কাজটা ইদানীং সরকার করতে উঠতে পারছে না।

স্মরণ করা যেতে পারে, ২০০৯-১০ সালে একটা খরা হয়েছিল যার ফলে ওই বছর কৃষিপণ্যের, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের, উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল। আগের বছরের তুলনায়, মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে গিয়েছিল প্রায় সাত শতাংশ, তার মধ্যে আবার ধানের উৎপাদন কমেছিল দশ শতাংশ। এর ফলে যে সাংঘাতিক রকমের একটা মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল সেটাও অনেকের মনে থাকার কথা। প্রশ্ন হল, সরকার এই মূল্যবৃদ্ধি আটকানোর জন্য তার ভাণ্ডার থেকে বাড়তি শস্য বাজারে ছেড়েছিল কি? ছাড়লে সরকারি ভাণ্ডারে মজুতের পরিমাণ নিশ্চয় কিছুটা কমত। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, ওই বছর সরকারি শস্য-ভাণ্ডারে মজুতের পরিমাণ কমেনি তো বটেই, উল্টে বেড়ে গিয়েছিল। একই সঙ্গে যে সংগ্রহ-মূল্যে সরকার কৃষকদের কাছ থেকে শস্য কেনে, সেটাও সেবছর অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাজারে যোগান বাড়াতে চাইলে তো সরকার তার নিজের সংগ্রহ-মূল্য কমাবে যাতে বিক্রেতাদের পক্ষে বাজারে বিক্রি করাটা অধিক লাভজনক হয়। তাহলে সংগ্রহ-মূল্য বাড়ানো হল কেন? অর্থাৎ নানা কারণে সরকারি ভাণ্ডার থেকে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য বাজারে ছেড়ে কিংবা বাজার থেকে কম শস্য কিনে খাদ্যশস্যের দামের ওপরে লাগাম পরানোর কাজটা করা হয়নি। কেন হয়নি জানা দরকার, যেহেতু, আশঙ্কা করা যায়, অতীতের পুনরাবৃত্তি অদূর ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে।

দুটো কারণের কথা আমরা ভাবতে পারি। প্রথমত, উৎপাদন কম হলে দাম বাড়ার মধ্য দিয়ে বাজার থেকে একটা স্বাভাবিক নিরাপত্তা কৃষকরা পেয়ে থাকেন। বিক্রি কম কিন্তু দাম বেশি, দু'য়ে মিলে, আমরা আগেই দেখেছি, কৃষকের আয় কমছে না, বরং বাড়ছে। অবশ্য এখানে মাঝারি এবং বড় কৃষকদের আয়ের কথাই বলছি যাঁদের বাজারে পণ্য বিক্রি করার সামর্থ্য আছে। কিন্তু খরার বছরে যদি সরকারি ভাণ্ডার থেকে শস্য এসে বাজার ভরিয়ে দেয় তাহলে বাজারে দাম তেমন বাড়বে না। দাম বাড়ছে না অথচ কৃষকের হাতে বিক্রি করার মত পণ্যও কম। এই অবস্থায় কৃষকের আয় অবশ্যই কমবে। অতএব বলা যায়, অংশত মাঝারি এবং বড় কৃষকদের আয় সুরক্ষিত করতে গিয়েই সরকার সেই খরার বছরে কৃষিপণ্যের দামের ওপর লাগাম পরাতে পারেনি।

কিন্তু মাঝারি ও বড় কৃষকদের স্বার্থটাই তো শেষ কথা নয়। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি যেহেতু দেশের কোটি-কোটি গরিব মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে, রাজনৈতিক কারণে তাকে যে-কোনও সরকারই নিয়ন্ত্রণে

রাখার চেষ্টা করবে। ২০০৯-১০ সালের ক্ষমতাসীন সরকারও নিশ্চয় এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাহলে খরার বছরে সরকারি শস্যভাণ্ডার আরও স্ফীত হল কেন? বিশেষ করে খরার বছরে কেন সংগ্রহ-মূল্য বাড়ানো হল তার একটা আলাদা ব্যাখ্যা পাওয়া দরকার। সব মিলিয়ে মনে হয়, দামের ওপর লাগাম পরাতে না পারার একটা দ্বিতীয় কারণও ছিল।

রেশন ব্যবস্থা চালানোর জন্য, সেনাবাহিনীকে খাওয়ানোর জন্য, সম্ভাব্য মহামারী-বন্যা-ভূমিকম্পের মতো জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সরকারকে প্রতি বছরেই কিছু খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হয়। ২০০৯-১০ সালে সরকারিভাবে জানা ছিল যে একটা খরা আসতে চলেছে। খরা এলে বাজারে শস্যের দাম বাড়বে, তাই প্রয়োজনীয় শস্য-সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য সরকারকেও সংগ্রহ মূল্য বাড়াতে হল। ফলে বেসরকারি ব্যবসায়ীরা অনেকেই ভাবলেন, সরকার যখন বেশি দাম দিচ্ছেই, বাজারে দাম কবে বাড়বে তার জন্য বসে না থেকে ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সরকারকেই ফসল বিক্রি করে দেওয়াটা নিরাপদ। তাছাড়া কিছু বড় ব্যবসায়ী, যাঁরা বাজার থেকে একটা সময়ে মাল কিনে অন্য একটা সময়ে বিক্রি করেন, বাজার প্রথম থেকেই চড়া হবার কারণে, মাল কেনার জন্য যথেষ্ট নগদ জোগাড় করে উঠতে পারলেন না। ফলে যে ফসলটা তাঁরা মজুত করে রাখতেন সেটাও সরকারের ঘরে গিয়ে উঠল। সব মিলিয়ে আরও স্ফীত হল খাদ্যশস্যের সরকারি ভাণ্ডার। এর পাশাপাশি সরকার তার ভাণ্ডার থেকে কিছু পরিমাণে বাড়তি শস্য বাজারে ছাড়ল বটে, কিন্তু পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে খুব বেশি বাড়তি সরকারি শস্য বাজারে পৌঁছতে পারল না। নীট ফল, একদিকে ফুলে উঠল সরকারি ভাণ্ডার, অন্যদিকে লাগামছাড়াভাবে বাড়তে থাকল শস্যের দাম।

কৃষি উৎপাদনে ছোটখাট ঘাটতি হলে সরকারি ভাণ্ডার দিয়ে তাকে হয়ত সামাল দেওয়া যায়। কিন্তু ২০০৯-১০-এর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝলাম, দেশে বড় ধরনের অনাবৃষ্টি দেখা দিলে সরকারি বণ্টন ব্যবস্থাটাই বিপথগামী হয়ে পড়ে। তখন তাকে দিয়ে আর মূল্যবৃদ্ধি সামলানো যায় না। আমরা জানিনা ২০১৫-১৬ আমাদের জন্য কী নিয়ে আসছে। তাই ২০০৯-১০-এর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই জোর কদমে খরা মোকাবিলার জন্য নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু করা দরকার।

(৪)

কৃষিঋণ মকুব করা নিয়ে এখন ভারী মাপের রাজনীতি চলছে। ব্যাপারটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এরকম রাজনীতি আগেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে, এবং এই রাজনীতিতে কংগ্রেস-বিজেপি সকলেই সামিল। অনেকেরই মনে থাকতে পারে, ষাট হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মনমোহন সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসেছিল এবং ক্ষমতায় আসার পর খরা-কবলিত অঞ্চলগুলিতে প্রায় বাহাত্তর হাজার কোটি টাকার ঋণ মকুব করেছিল। একই ভাবে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণ মকুব করেছিলেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আর তার চার মাস পরে আরও পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি মকুব করেছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবীস। এর পর পঞ্জাব ও কর্নাটকে বেয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণ মকুব করা হয়েছিল, যার কিছু করেছিল বিজেপি, কিছু কংগ্রেস।

সম্প্রতি হিন্দি বলয়ের তিনটি রাজ্যে বিজেপিকে হারিয়ে দেবার পর উজ্জীবিত কংগ্রেস এই তিনটি রাজ্যে ঊনষাট হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণ মকুব করেছে। মধ্যপ্রদেশে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি, রাজস্থানে আঠেরো হাজার কোটি, ছত্তিসগড়ে ছ' হাজার কোটি। এই ঋণ মকুবের অনুপাত সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মোট বাজেটের দশ থেকে কুড়ি শতাংশ। বলাই বাহুল্য, এটা ২০১৯-এর নির্বাচনী প্রস্তুতি। রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, সারা দেশে সমস্ত কৃষিঋণ মকুব না হওয়া অব্দি তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন।

ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এখনও কৃষিজীবী। নির্বাচনের খাতিরে সব দলই এই বিপুল কৃষিজীবী ভোটব্যাঙ্ককে খুশি রাখতে চাইবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু যেভাবে সমস্ত বিচার-বিবেচনা জলাঞ্জলি দিয়ে

কোটি-কোটি টাকা মকুব করে দেওয়া হচ্ছে সেটা নিয়ে অনেকেই আপত্তি তুলেছেন। ঋণ-মকুব বিরোধীদের তালিকায় যেমন রঘুরাম রাজন, অরবিন্দ পানাগারিয়া কিংবা কৌশিক বসুর মতো প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদরা রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন স্বামীনাথনের মতো কৃষি-বিশেষজ্ঞ, নীতি আয়োগের মতো শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান।

কৃষিঋণ মকুবের বিরুদ্ধে অনেক রকম আপত্তি। নীতি আয়োগ বলছে, কৃষিঋণ মকুব করা হলে শুধুমাত্র বড় কৃষকদের লাভ হবে, এর থেকে ছোট কৃষকদের কোনও সুবিধেই নেই। যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে, কৃষিঋণের সিংহভাগ যায় বড় কৃষকদের হাতে, ছোটদের হাতে যায় খুব কম, আর, খুব ছোট কৃষকরা তো ব্যাঙ্কের নাগালই পান না। নীতি আয়োগের মতে, গরিব রাজ্যগুলোতে পঁচিশ শতাংশেরও কম কৃষক প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের নাগাল পেয়ে থাকেন, ঋণ মকুব হলে বড়জোর দশ-পনের শতাংশ কৃষক তার সুবিধে পাবেন।

দ্বিতীয় আপত্তি, কৃষিঋণ মকুবের কারণে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং এর ভার বহন করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত রাজ্যগুলি আরও অক্ষম হয়ে পড়ছে। গত জুলাই মাসের হিসেব অনুযায়ী সারা দেশে সাম্প্রতিক কৃষিঋণ মকুবের মোট পরিমাণ ছিল ২.৭ লক্ষ কোটি টাকা। তিনটি রাজ্যে কংগ্রেসের বিজয়োত্তর ঋণ-মকুব ঘোষণা এই পরিমাণকে, বলাই বাহুল্য, আরও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। ঋণ-মকুবের অপচয় দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের কাজে খরচ করা হলে রাজ্যগুলির অনেক উপকার হত।

তাছাড়া অর্থনীতিবিদদের মতে, কৃষিঋণ মকুব সৎ ঋণগ্রহীতাদের নিরুৎসাহ করে, অসৎদের উৎসাহ দেয়। ধার নেবার পর যাঁরা খুব কষ্ট করে সেই ধার শোধ দিলেন, তাঁরা দেখলেন, অন্যরা যারা ধার শোধ দিল না, তাদের ঋণ মকুব হয়ে গেল। অর্থাৎ যাঁরা ঋণ শোধ করলেন না তাঁদের তুলনায় যাঁরা ঋণ শোধ করলেন তাঁদের একরকম জরিমানাই হল। এইরকম বিকৃত উৎসাহদান সৎ-অসৎ সবাইকেই ভবিষ্যতে ঋণ ফেরত না দিতে প্রলুব্ধ করবে। ফলে ব্যাঙ্কগুলোর পক্ষে কৃষিঋণ দেওয়াটাই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

কৃষিঋণ মকুবের বিরুদ্ধে এই আপত্তিগুলো অসার এমন কথা কেউ বলবে না, কিন্তু উল্টোদিকের যুক্তি যা আছে সেগুলোও খতিয়ে দেখা দরকার। প্রথম যুক্তি, কৃষিঋণ মকুব শুধুমাত্র সম্পন্ন কৃষকদের সুবিধে করে দেয়, এটা ঠিক নয়। আমাদের দেশে সম্পন্ন কৃষক কম, ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিরাই সংখ্যায় বেশি। গণতন্ত্রে যেহেতু সংখ্যাটাই আসল, কৃষিঋণ মকুব যদি শুধুমাত্র বড় কৃষকদের সুবিধে করে দিত তাহলে রাজনৈতিক দলগুলো এমন করে কৃষিঋণ মকুবের প্রতিযোগিতায় নামত না। যখন নেমেছে, তখন ধরে নিতে হবে এর ভেতর দিয়ে তারা কৃষিজীবীদের একটা বড় অংশের কাছে পৌঁছতে পারছে। সাধারণত ছোট ছোট ঋণই মকুব করা হয়, আর, ঋণ-মকুবের উপযুক্ত হতে গেলে জমির মালিকানাও খুব বেশি হলে চলে না। তাই ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষিরা ঋণ-মকুবের কিছু সুফল অবশ্যই পান। তাছাড়া ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের কাছেও পরোক্ষভাবে ঋণ-মকুবের সুফল খানিকটা পৌঁছয় কারণ এর ফলে কৃষিক্ষেত্রের কাজকর্মে গতি আসে।

দ্বিতীয়ত, কৃষিঋণ মকুবের ফলে সরকারের তহবিলে চাপ পড়ে বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার, কৃষিঋণ মকুব এক ধরনের ভর্তুকি এবং কৃষিতে ভর্তুকি দেবার প্রথা সারা পৃথিবীতেই চালু আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাৎসরিক কৃষি-ভর্তুকি ১৭২ বিলিয়ন ডলার, চিনে ১৬৫ বিলিয়ন, ইয়োরোপীয়ান ইউনিয়নে প্রায় ৭০ বিলিয়ন, জাপানে ৬৫ বিলিয়ন। ভারতে কৃষিঋণ মকুবের খরচ পৃথিবীর বড় দেশগুলোর কৃষি-ভর্তুকির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য সম্পন্ন দেশগুলোর পক্ষে যে খরচটা করা সম্ভব, আমাদের গরিব দেশের কাছে সেটা বহনীয় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু গভীরতর প্রশ্ন হল, কৃষিঋণ মকুবের মধ্য দিয়ে যে ভর্তুকিটা কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে সেটা কি ভর্তুকি দেবার দক্ষতম রাস্তা? তারও আগের প্রশ্ন, কৃষিতে ভর্তুকি দেবার দরকার পড়ে কেন?

কৃষির সমস্যা দু'রকম, একটা উৎপাদনের, একটা চাহিদার। আমাদের দেশে যেহেতু সেচ ব্যবস্থা এখনও প্রয়োজনের তুলনায় কম, কৃষিকে বৃষ্টি-দেবতার মেজাজ-মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টি

হলেও বিপদ, কম বৃষ্টি হলেও। কৃষিকাজে তাই বড় রকমের ঝুঁকি থাকে। এটা উৎপাদনের সমস্যা। কিন্তু বৃষ্টির দেবতা দয়া করলেও কি নিস্তার আছে? অতিফলন হলে বাজারে পণ্যের দাম পড়ে যায়, তখন চাষের খরচটাও ওঠানো কঠিন হয়ে পড়ে। এটা আবার চাহিদার সমস্যা। এছাড়াও চাহিদার একটা দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আয় যে হারে বাড়ছে, তার চাল-ডাল-তরিতরকারির চাহিদা সেই হারে বাড়ছে না। আমাদের দেশে কিছু মানুষের আয় নিশ্চয় বেড়েছে, কিন্তু তাদের কৃষিপণ্যের চাহিদা প্রায় একই রকম আছে। আর যারা গরিব রয়ে গেলেন তাদের প্রয়োজন আছে কিন্তু প্রয়োজন মতো চাল-ডাল-তরিতরকারি কেনার ক্ষমতা নেই।

যোগান ও চাহিদাগত এইসব সমস্যার কারণে কৃষিপণ্যে ভর্তুকি দেওয়াটা জরুরি। বিশেষ করে এই কারণে যে, ভারতের বেশির ভাগ মানুষ এখনো কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, ভর্তুকি না দিলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বিপজ্জনকভাবে কমে যেতে পারে। তখন দেশের খাদ্য সুরক্ষাটাই চলে যাবে। পৃথিবীর কোনও দেশই সেটা চায় না। উৎপাদনের ঝুঁকিটা কৃষি বীমা দিয়ে খানিকটা কমানো যায়। উন্নত দেশগুলো তো বটেই, এখন আমাদের দেশেও কৃষিবীমা চালু হয়েছে। তবে খরা বা অতিবৃষ্টি সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করলে কোনও বীমাই যথেষ্ট নয়। তখন ঋণ মকুব ছাড়া গতি নেই।

আসল সমস্যাটা কিন্তু চাহিদার। চাহিদার স্থবিরতা কৃষিপণ্যের দামকে তেমন ভাবে বাড়তে দেয় না। অথচ চাষের খরচ বাড়ছে, গ্রাম থেকে শহরে পণ্য নিয়ে যাবার খরচ বাড়ছে। আবার অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টির কারণে মাঝে মাঝে হঠাৎ খুব দাম বেড়ে যায়। তখন অন্য বিপদ। দেশের এক-চতুর্থাংশ মানুষ এখনও পেট ভরে খেতে পান না। চাল-গমের দাম হঠাৎ বেড়ে গেলে তাদের পক্ষে বেঁচে থাকা আরও কঠিন হয়ে ওঠে।

চাহিদা ও যোগানের সমস্যাগুলো মেটানোর জন্য সরকারি পদক্ষেপ দরকার, ভর্তুকির প্রয়োজন। পূর্বঘোষিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরকারি আহরণের মধ্যবর্তিতায় সমস্যাগুলো খানিকটা মেটানো যেতে পারে। আমাদের দেশে সে-ব্যবস্থা নেই তা নয়। কিন্তু তাতে অনেক ফাঁক আছে। প্রথমত, সরকারি আহরণ-কেন্দ্রগুলো অপেক্ষাকৃত বড় লোকালয়ে অবস্থিত বলে প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকরা আহরণ-কেন্দ্র অব্দি পৌঁছতে পারেন না। কৃষকদের দোরগোড়া থেকে যে ফড়েরা কম দামে পণ্য কিনে নিয়ে যায়, কৃষকরা তাদের কাছেই পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হন। সরকারের উচিত কৃষকদের বাড়ি বাড়ি সরকারি এজেন্ট পাঠিয়ে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে পণ্য আহরণ করা, যেমন দোরগোড়া-ব্যাঙ্কিংএ ব্যাঙ্কের এজেন্টরা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিষেবা পৌঁছে দেন। দ্বিতীয়ত, শুধু ধান-গম নয়, অন্যান্য পণ্য, বিশেষ করে শাকসব্জীর ক্ষেত্রেও ন্যূনতম সহায়ক মূল্য থাকা দরকার।

সরকারি আহরণ ও বিপনন ব্যবস্থা সমস্ত কৃষকের কাছে পৌঁছলে কৃষিঋণ মকুবের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই কমে যাবে আর এটাই হবে ভর্তুকি দেবার সব থেকে দক্ষ রাস্তা। তখন বিকৃত উৎসাহদানের সমস্যাটাও আর থাকবে না। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, কৃষিঋণ মকুবের বিকল্পটা চরম আপৎকালের জন্য তোলা থাকুক, স্বাভাবিক সময়ে ছোট কৃষকদের সরাসরি ভর্তুকি দেওয়া হোক উৎপাদন ও বিপননে।

মুদিখানা, মহাবিপনী ও ই-কমার্স

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে ইদানীং রাজনৈতিক চাপান-উতোর যতটা চলছে, অর্থনৈতিক আলোচনা ততটা হচ্ছে না। অথচ বিষয়টা মূলত অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক নেতাদের একটা লাইন ধরে নিয়ে সরল রেখায় কথা বলতে হয়। জটিল যুক্তির অবতারণা করে শ্রোতাদের গুলিয়ে দেবার ঝুঁকি তাঁরা নিতে পারেন না। তাই আমরা শুনতে পাচ্ছি, একদল রাজনীতিবিদ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছেন, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ এলে দেশটা স্বর্গ হয়ে যাবে। আবার তাঁদের যাঁরা বিরোধিতা করছেন তাঁরা খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ-এর কোনও সুবিধেই দেখতে পাচ্ছেন না। সম্ভবত, এই দুই মেরুর মধ্যবর্তী কোনও একটা জায়গায় আসল সত্যটা লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে দেখার প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরেই দিশি বৃহৎ পুঁজি খুচরো ব্যবসায় ঢুকেছে। তাই প্রথমেই জানা দরকার, খুচরো ব্যবসার নিরিখে দিশি বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে বহুজাতিক পুঁজির তফাৎগুলো ঠিক কোথায়। কিংবা একটু অন্যভাবে প্রশ্ন করতে পারি, বহুজাতিক পুঁজি এলে কী কী ঘটতে পারে যা দিশি বৃহৎ পুঁজির উপস্থিতিতে ঘটেনি? বস্তুত, বহুজাতিক খুচরো ব্যবসায়ীরা এলে আমরা তিনটে পরিবর্তন আশা করতে পারি, উন্নততর প্রযুক্তি, মুক্ততর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বাজারে বহুজাতিকদের সর্বগ্রাসী, বিকটাকার উপস্থিতি। প্রথমত, টেসকো, ওয়ালমার্টের মতো দৈত্যাকার খুচরো ব্যবসায়ীরা ভারতে এলে তারা সঙ্গে নিয়ে আসবে জামাকাপড়, খাদ্যশস্য, শাকসবজি বা ফলমূল মজুত করার আধুনিকতম প্রযুক্তি। এই উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বন্টনব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটবে, হিমঘরের অভাবে যে বিপুল পরিমাণ শাকসবজি ও ফলমূল প্রতি বছর নষ্ট হয়ে যায়, ভোক্তাদের হাতে তাদের পৌঁছে দেওয়া যাবে। এই প্রযুক্তি দিশি পুঁজিপতিদের হাতে নেই। দ্বিতীয়ত, এই দৈত্যাকার বিপনীগুলির মাধ্যমে আমাদের দেশের উৎপাদনকারীরা যেমন সারা পৃথিবীর ভোক্তাদের নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে তেমনি আমাদের দেশের ভোক্তারাও সারা পৃথিবীর পণ্যসামগ্রী ভোগ করতে পারবে। অর্থাৎ এই বহুজাতিক বিপনীদের মধ্যবর্তিতায় আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। দিশি পুঁজিপতিদের সেই পরিকাঠামো, যোগাযোগ-যন্ত্র বা নেটওয়ার্ক নেই যা দিয়ে তাঁরা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবসা করতে পারেন। তৃতীয়ত, একটি বহুজাতিক বিপনী দিশি পুঁজিপতিদের অনেক গুণ মূলধন নিয়ে বিপুলভাবে বাজারে নামবে। একবার তারা বাজারে ঢুকে পড়লে, অনেকেই আশঙ্কা করছেন, ছোট ব্যবসায়ীদের টিকে থাকা শক্ত হবে।

এখানে বলে রাখা ভালো, দিশি বৃহৎ পুঁজিকে বাদ দিয়ে কোনও বহুজাতিক এদেশে ব্যবসা করতে পারবে না। দিশি বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে বহুজাতিকদের যাতে যৌথভাবে ব্যবসা করতে হয় সরকার সেই ব্যবস্থাই করেছে। ব্যবসায় বহুজাতিকের অংশ হবে সর্বাধিক ৫১ শতাংশ, দিশি পুঁজির ন্যূনতম ৪৯ শতাংশ। তাই বহুজাতিকের সঙ্গে দিশি পুঁজির কোনও বিরোধ থাকছে না, বরং বহুজাতিকের প্রযুক্তি এবং পরিকাঠামো ব্যবহার করে নিজেদের লাভ বাড়িয়ে নিতে পারবে ভেবে দিশি পুঁজি খুচরো ব্যবসায় বহুজাতিক পুঁজিকে মুক্তকণ্ঠে স্বাগত জানাচ্ছে।

আর পাঁচটা আর্থিক নীতির মত খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ নীতিও কারো কারো ভালো করবে, কারো কারো মন্দ। প্রথমে প্রযুক্তির প্রসঙ্গে আসি। নতুন প্রযুক্তি এলে অপচয় বন্ধ হয়ে খাদ্যের যোগান বাড়বে, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। এর ফলে আখেরে, অর্থাৎ অতি দীর্ঘমেয়াদে, সম্ভবত সকলেরই ভালো হবে। কিন্তু শুধুমাত্র অতি দীর্ঘমেয়াদের ফল দেখে একটা নীতির গ্রহণযোগ্যতা বিচার করাটা ঠিক নয়।

পরিবর্তনের যে-দীর্ঘ রাস্তাটা ধরে নতুন ব্যবস্থায় পৌঁছতে হবে সেটি যদি কারো কারো পক্ষে, বিশেষ করে গরিব মানুষের পক্ষে, অতিশয় কণ্টকপূর্ণ হয়, তাহলে সে দিকটাও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা প্রয়োজন।

বহুজাতিকদের মাধ্যমে মজুত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলে গ্রামের বাজারে শস্য, শাক-সবজি এবং ফলমূলের দাম দুই ভাবে বাড়তে পারে। মজুতের অভাবে যে-মরসুমি আলু-পটল-ঢ্যাঁড়স-বেগুন গ্রামের বাজারে জলের দরে বিক্রি হত কিংবা পচে নষ্ট হত সেসব এখন হিমঘরে জমা হয়ে এক সময় শহরে কিংবা ভিনদেশে পাড়ি দিতে পারবে। ফলে কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়বে, দামও বাড়বে। একই সঙ্গে, যে-অল্পসংখ্যক বৃহৎ আড়তদার গ্রামের বাজারগুলোকে এতদিন নিয়ন্ত্রণ করছিলেন এবং তাঁদের একচেটিয়া শক্তির বলে কম দামে কৃষকের পণ্য কিনছিলেন, বহুজাতিকরা এসে পড়লে গ্রামের বাজারে ক্রেতা হিসেবে তাঁদের একচেটিয়া আধিপত্য আর থাকবে না। অর্থাৎ বড় ক্রেতাদের মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার আবহাওয়া তৈরি হবে এবং এই কারণেও বিক্রেতারা, অর্থাৎ কৃষকরা, বেশি দাম পাবে। দাম বাড়লে চাষির লাভ, আর চাষির লাভ বাড়লে সে তার জমিতে বিনিয়োগ বাড়াতে উৎসাহিত হবে। ফলে কৃষির উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা দুই-ই বাড়বে।

এসবের একটা অন্ধকার দিকও আছে। গ্রামের বাজারে কৃষিপণ্যের দাম বাড়লে সেইসব কৃষকেরই লাভ যারা তাদের পণ্য বাজারে বিক্রি করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে অধিকাংশই কৃষকই ভূমিহীন কিংবা প্রান্তিক। এদের হয় জমি নেই কিংবা জমির পরিমাণ এতই কম যে তার উৎপাদনে সারা বছর পেট চলে না। পরের জমিতে কাজ করে সেই উপার্জনে বাজার থেকে চাল-ডাল-শাকসবজি কিনে এদের খেতে হয়। গ্রামের বাজারে কৃষিপণ্যের দাম কম বলেই এরা কোনও রকমে বেঁচে আছে। খাবারের দাম বাড়লে এই গরিব মানুষগুলো ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে। কেউ কেউ বলছেন, কৃষিপণ্যের দাম বাড়লে তার প্রভাবে একদিন না একদিন কৃষির মজুরিও বাড়তে বাধ্য। এটা সেই ওপরতলার বৈভব চুঁইয়ে নীচে নামার তত্ত্ব। এটা নিজের থেকে সত্যি সত্যি ঘটে কিনা আমরা জানি না। এক্ষেত্রে, কৃষি আরও লাভজনক হলে হয়ত কৃষিশ্রমের চাহিদা ও মজুরি একদিন বাড়বে, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, কতদিনে?

আর একটা আশঙ্কা, কৃষিপণ্যের খুচরো বাজারে বহুজাতিকরা ঢুকলে যে অসংখ্য ছোট ছোট ব্যাপারি হাটে-বাজারে তরিতরকারি, ফলমূল, চাল-ডাল বিক্রি করেন, তাঁদের অন্ন মারা যাবে। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় এই আশঙ্কা দু'ভাবে সত্যি হতে পারে। যদি বহুজাতিকরা ভারতের গ্রাম থেকে কেনা কৃষিপণ্য মূলত ভারতেই বিক্রি করে তাহলে ছোট ব্যাপারিরা সরাসরি বহুজাতিকদের প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে। আবার বহুজাতিকরা যদি মূলত বিদেশে রপ্তানির জন্য ভারতের বাজার থেকে পণ্য কেনে, তাহলে দিশি বাজারে তারা ততটা বিক্রি করবে না বটে কিন্তু গ্রামের বাজার থেকে যেহেতু তারা অনেকটা পণ্য কিনে নেবে, তাই ছোট ব্যাপারিদের হাতে সহরে-গঞ্জে বিক্রি করার মতো খুব বেশি পণ্য পড়ে থাকবে না। ফলে ছোট ব্যাপারিরা আবার মার খাবে।

নতুন প্রযুক্তির সুফল নেওয়ার দরকার নেই এমন কথা কিন্তু আমরা বলছি না। অপচয় বন্ধ করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, এবং সে প্রয়োজন মেটাতে গেলে বহুজাতিককে আনতেই হবে। কিন্তু বহুজাতিক এলে গ্রামের গরিব মানুষ, যাদের বাজার থেকে কিনে খেতে হয়, তারা বিপদে পড়বে। ছোট ব্যাপারিরা বিপদে পড়বে। কৃষির উৎপাদন বাড়লে হয়ত একদিন গ্রামে কৃষি শ্রমিকদের চাহিদা বাড়বে, মজুরিও বাড়বে। কিন্তু সেসব দূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। যতদিন না মজুরি বাড়ছে ততদিন এই গরিব মানুষদের কী করে চলবে?

এখানে ইতিহাসের একটা উদাহরণ দেওয়া প্রাসঙ্গিক। ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে যখন ব্যাপকভাবে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হল তখন বেশ কিছুদিনের জন্য যে সেখানে শ্রমের চাহিদা কমে গিয়েছিল সেকথা আমরা নানা সূত্রে জানতে পারি। এর ফলে দীর্ঘদিন, ঐতিহাসিক এরিক হবসবম-এর মতে প্রায় একশ-দেড়শ বছর, ইংল্যান্ডে শ্রমের প্রকৃত মজুরি তেমন একটা বাড়েনি। অর্থাৎ শিল্প-বিপ্লবের সুফলটা প্রথম একশ-দেড়শ বছর শ্রমিক শ্রেণির কাছে আদৌ পৌঁছয়নি, বরং এই সময়ে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল।

ডিকেন্সের উপন্যাসে, কার্ল মার্ক্স-এর ইতিহাস চেতনায় এবং আরও পরে চ্যাপলিনের চলচ্চিত্রে এই দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণির ছবি বারবার ফিরে এসেছে। পাশাপাশি একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিল্প-বিপ্লবের দেড়শ বছরের মধ্যে একটু একটু করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক চেহারাটা একেবারে আমূল বদলে গিয়েছিল, শুধুমাত্র ধনিক শ্রেণির চেহারা নয়, শ্রমিকদের চেহারাও, এবং শিল্প-বিপ্লব না ঘটলে এই অকল্পনীয় উন্নতিটা আদৌ সম্ভব হত না। বস্তুত, শ্রমিক শ্রেণির এতটা উন্নতি মার্ক্স দেখে যাননি, দেখলে হয়ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর নৈতিক সংশয় খানিকটা কাটত। সে যাই হোক, শিল্প-বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট যে, শিল্প-বিপ্লব এবং যন্ত্রায়ণের ফল শেষ পর্যন্ত সকলের পক্ষেই ভালো হয়েছিল, কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় পৌঁছনোর রাস্তাটা গরিব মানুষের পক্ষে মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সেই আদি যন্ত্রায়ণের সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থার মিলটা পরিষ্কার। মজুত ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তি এলে শেষ পর্যন্ত হয়ত সকলেরই ভালো হবে, কিন্তু একটা অনিশ্চিত দৈর্ঘের মধ্যবর্তী সময় রয়েছে যখন পরিবর্তনের ধাক্কাটা গরিব মানুষের ওপর গিয়ে পড়বে।

পরিবর্তনের কঠিন ভার কেন সর্বদা গরিব মানুষকেই বহন করতে হয় এই নৈতিক প্রশ্ন তো আছেই। তাছাড়াও মনে রাখা দরকার, বর্তমানে যে-গণতন্ত্র আমাদের দেশে রয়েছে, শিল্পবিপ্লবের সময় ইংল্যান্ডে তার অভাব ছিল। ফলে পরিবর্তনের গুরুভার তখন যেভাবে গরিব মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া গিয়েছিল এখানে এখন আর সেটা সম্ভব নয়। তাই আমরা বলতে চাই, যে-সরকার খুচরো ব্যবসাতে বহুজাতিকদের নিয়ে আসছেন, তারাই যেন গ্রামের গরিবদের জন্য কিছু রক্ষাকবচের কথা ভাবেন। নইলে অন্যায় হবে তো বটেই, উপরন্তু জনরোষের ফলে তাদের নীতিটাই অচল হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আমাদের দ্বিতীয় প্রসঙ্গ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। এই মুহূর্তে, শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে আমরা চিন বা অন্য কয়েকটি এশিয় দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারব বলে মনে হয় না। বহুজাতিকদের মাধ্যমে দেশে মুক্ততর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে, ধরে নেওয়া যায়, চৈনিক জামাকাপড়, খেলনা, ছুরি-কাঁচি-হাতা-খুন্তি-কাঁটা-চামচ কিংবা ছোটখাট ইলেকট্রনিক গ্যাজেটে আমাদের বাজার ভরে যাবে। মনে রাখতে হবে, বেশ কিছুদিন ধরে চিনের সব থেকে বড় বাণিজ্যসঙ্গী কোনও দেশ নয়, ওয়ালমার্ট নামক দৈত্যাকার বিপনন সংস্থাটি। চিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হলে দেশের অনেক ছোট ছোট কলকারখানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কমে যেতে পারে কর্মসংস্থান। আসলে, চিনের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতাটা অসম। চিন দেশে শ্রমিকদের কোনও অধিকার নেই, শ্রম-আইনগুলো সবই মালিকের পক্ষে। সেখানে শ্রমিকদের দিয়ে প্রায় যত খুশি কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। একে উচ্চ উৎপাদনশীলতা না বলে শ্রমিক-শোষণ বলাটাই ঠিক। প্রতিযোগিতাটা যেহেতু অসম তাই বহুজাতিকদের মাধ্যমে শিল্পদ্রব্য আমদানির ওপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা দরকার। অন্যদিকে বহুজাতিকরা অবাধে দেশের বাজার থেকে কৃষিপণ্য কিনে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করতে শুরু করলে দেশে কৃষিপণ্য, বিশেষত খাবার-দাবারের দাম বাড়বে। ফলে, আগেই বলেছি, গরিব মানুষ অসুবিধেয় পড়বে। তাই এই রপ্তানির ওপরেও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবাধ হলে ক্রেতা হিসেবে লাভবান হবে শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত, যারা বহুজাতিক বিপনী থেকে বিদেশি জিনিসপত্র কিনতে পারবে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে গ্রামের গরিব মানুষ, যাদের বেশি দাম দিয়ে খাবার কিনতে হবে। তাই এই বাণিজ্যের ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ দরকার।

পরিশেষে বহুজাতিকদের সর্বগ্রাসী উপস্থিতি নিয়ে এটুকুই বলার যে, এখানে প্রতিযোগিতাটা দিশি অসংগঠিত ক্ষেত্রের ছোটখাট দোকানগুলোর সঙ্গে দৈত্যাকার বিপনীদের। এই সংঘাতে কে শেষ অব্দি টিকে থাকবে বলা শক্ত। এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে দু'পক্ষই পাশাপাশি অবস্থান করছে।

(২)

বাজার-বিলাসী মধ্যবিত্তের ক্রয়-অভ্যাস ক্রমশ বদলাচ্ছে। খুব দ্রুত হয়ত নয়, কিন্তু অমোঘভাবে, অনিবার্য গতিতে। এক দশকেরও বেশি হয়ে গেল, প্রথমে শহর এবং পরে মফস্বলে বহুতল মহাবিপনীদের আবির্ভাব

হয়েছে। মধ্যবিত্তদের একটা ক্রমবর্দ্ধমান অংশ ধীরে ধীরে মহাবিপনীর ঠাণ্ডা আরামে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। তাঁদের সাপ্তাহিক শাক-সব্জী-মাছ-মাংস, মাসকাবারি চাল-ডাল-তেল-নুন-মসলাপাতি, এমনকি পুজো-পরবের জামাকাপড় পর্যন্ত সব কিছুর যোগানই এখন মহাবিপনীদের দখলে। সাবেকি বাজার-কাটরা-বস্ত্রালয়গুলো উঠে যায়নি বটে, তবে তারা তাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নিয়ে বিলক্ষণ সংশয়ে আছে।

এই সংশয়কে কেন্দ্র করে চাপানউতোরও কম হয়নি। মিটিং-মিছিল-আন্দোলন হয়েছে, খবর কাগজে লেখালেখি হয়েছে, দু'একটা মহাবিপনীর কাচ-টাচও ভাঙা হয়েছে। প্রশ্ন একটাই। বড় বড় কম্পানিগুলো খুচরো ব্যবসার বাজারটা দখল করে নিলে যে অসংখ্য ছোট ছোট বিক্রেতারা আছে তারা কোথায় যাবে? এই ধরনের প্রশ্ন আগেও উঠেছিল, বস্তুত ইতিহাসে বারবার উঠেছে, যখনই কোনও বড় আকারে প্রযুক্তির পরিবর্তন আসে তখনই ওঠে। শিল্পবিপ্লবের সময় যখন পাকাপাকিভাবে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হল, তখন প্রশ্ন উঠেছিল, যন্ত্র এসে যে শ্রমিকগুলোকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে তারা কোথায় যাবে? তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হল, তখনও একই প্রশ্ন উঠল।

এইসব প্রশ্নের একটা উত্তরও আছে। নতুন প্রযুক্তি এলে সাময়িকভাবে কিছু মানুষের কাজ চলে যায় বটে, কিন্তু নতুন প্রযুক্তিই আবার বহু মানুষকে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। যেমন কম্পিউটার দিয়েছে, মহাবিপনীগুলিও দিচ্ছে। তাছাড়া, নতুন প্রযুক্তির কিছু স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। এই দক্ষতার সুযোগ না নিলে উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে পড়তে হয়। সব থেকে বড় কথা, প্রযুক্তির পরিবর্তন একটা শাশ্বত নিয়ম। একে আটকানো যায় না। একে আটকানো প্রায় মুক্ত বাজারের স্বতস্ফূর্ত শক্তিকে কৃত্রিমভাবে আটকে রাখার মতোই আত্মহননের সামিল। তবে এক নিশ্বাসে একথাও বলা দরকার যে, পরিবর্তনের ধকলটা সর্বদা শ্রমিকদেরই বহন করতে হয়। এবং কখনও কখনও দীর্ঘ দিন ধরে। ইতিহাস সাক্ষী, শিল্পবিপ্লবের পর প্রায় দেড়শ বছর যন্ত্রদানবের চাপে ইংল্যান্ডে মজুরির হার বাড়েনি। শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা যে কতটা দুঃসহ হয়ে উঠেছিল যাঁরা ডিকেন্স পড়েছেন তাঁরা ভাল করেই জানেন। কিন্তু তার পরের একশ বছরে শ্রমিকদের অবস্থার একটা অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল, এটাও সত্যি।

অবশ্য শিল্পবিপ্লবের ইংল্যান্ডে গণতন্ত্রের বালাই ছিল না। নির্বাচন ছিল না, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করার দায় ছিল না। ফলে পরিবর্তন নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ সেভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। বর্তমান ভারতের পরিপ্রেক্ষিতটা অন্য রকম। তাই এখানে রাজনৈতিক দলগুলিকে জনরোষের কথা মাথায় রাখতে হয়। সেই নিয়ম মেনে শাসক দলকেও খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি প্রবেশের ওপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ চাপাতে হয়েছে। এই মুহূর্তে বিধিনিষেধ আরোপিত রয়েছে মূলত খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের ওপর। হয়ত অনুমানটা এইরকম যে, দেশি পুঁজিপতিদের ক্ষমতা সীমিত। তাই তারা খুচরো ব্যবসায়ে ঢুকলেও সর্বত্রগামী হতে পারবে না। ফলে তাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও টিকে থাকতে পারবে। কিন্তু ওয়ালমার্ট কিংবা টেসকোর মত খুচরো ব্যবসার দানব একবার বাজারে ঢুকলে ছোট ব্যবসায়ীরা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। তাই এই বহুজাতিকদের আটকানো দরকার। এই অনুমান, বলাই বাহুল্য, বিতর্ক সাপেক্ষ।

বহুতল মহাবিপনীর পাশাপাশি আরেক ধরনের খুচরো ব্যবসা ইদানীং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এর পোষাকি নাম ই-কমার্স। হাল আমলের অনু পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক বলতে স্বামী আর স্ত্রী, বহু ক্ষেত্রে দুজনেই চাকরি করেন, কারোরই বাজার-দোকানের সময় নেই, হয়ত ইচ্ছেও নেই। চিন্তা কী? হাতের কাছে ইন্টারনেট রয়েছে। সেখানে কত রকমের ওয়েবসাইট। পছন্দসই কোনও একটাতে ঢুকে অর্ডার দিয়ে দিলেই জিনিসপত্র বাড়িতে পৌঁছে যাবে। একটা হিসেব অনুযায়ী দেশে এখন পঞ্চাশ কোটি মানুষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় সাঁইত্রিশ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। সংখ্যাটা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। ধরে নেওয়া যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রসারিত হবে ই-কমার্সের চৌহদ্দি। ই-কমার্সের কিছু মৌলিক সুবিধে আছে। মহাবিপনী তৈরির বালাই নেই, তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নেই। শুধু জুতসই জায়গায় কয়েকটা বড় বড় ওয়্যারহাউস বা

গুদোমঘর কিনে রাখলেই হল। আর দরকার বাড়ি বাড়ি জিনিসপত্র পৌঁছে দেবার লোক। ব্যবসা চালানোর খরচ কম বলে খদ্দেরকেও সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রি করা সম্ভব। অনেকেই মনে করছেন ই-কমার্সই খুচরো ব্যবসার ভবিষ্যৎ। ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন বা বিগবাসকেটের ব্যবসা এখনই বাঙালির ঘরে ঘরে ছড়িয়ে গেছে।

লক্ষনীয় যে, সম্প্রতি খুচরো ব্যবসার অন্যতম প্রধান বহুজাতিক ওয়ালমার্ট ভারতীয় ই-কম্পানি ফ্লিপকার্টের সাতাত্তর শতাংশ কিনে নিয়েছে। সরকারি বিধিনিষেধের কারণে যে ওয়ালমার্ট এতদিন ভারতীয় বাজারে ঢুকতে পারছিল না, ফ্লিপকার্টের মধ্যে দিয়ে এখন দিশি ভোক্তাদের কাছে তারা অনায়াসে পৌঁছে যাবে। খুচরো ব্যবসায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ওপর বিধিনিষেধ থাকলেও ই-কমার্সে বিদেশি পুঁজির অবাধ প্রবেশাধিকার। ওয়ালমার্ট সেই সুযোগটা নিয়েছে। ধরে নেওয়া যায়, এই দুই দৈত্যাকার কম্পানির মিলনের ফলে ভারতে খুচরো ব্যবসার ধরনটাই আমূল বদলে যাবে। ভোক্তাদের সুবিধে হবে। কিন্তু দেশে যে দেড় কোটি খুচরো দোকানপাট আছে, যা অন্তত চার-পাঁচ কোটি মানুষের রুটি-রুজি জোগায়, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল।

ডলার, মহার্ঘ্য ডলার

আমাদের কৈশোর-যৌবনের কলেজ স্ট্রিটে ভিনদেশি বইপত্র তেমন দুর্মূল্য ছিল না। নেহাত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেও, হাতখরচ-টিউশানির পয়সা বাঁচিয়ে, তিন শিলিং ছ' পেনির পেঙ্গুইন কিংবা কখনো-সখনো শখ করে দুটো একটা মডার্ন লাইব্রেরির সুদৃশ্য ক্লাসিক কিনে ফেলতে পারত। সত্তর দশকের গোড়ার কথা বলছি। শহরের দেয়ালে চিনের চেয়ারম্যানের টুপি পরা ছবিগুলো তখন ফিকে হয়ে আসছে। তার বদলে জ্বলজ্বল করছে এশিয়ার মুক্তিসূর্যের প্রতিকৃতি। কিন্তু অতি বাম হোক বা মৃদু বাম, সকলেই তখন সরকারি নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করে। ফলে ডলারের দাম ছ'-সাত টাকায় বেঁধে রাখা হয়েছে, পাউন্ডের দাম পনেরো-ষোলো টাকায়। আর সেই কৃত্রিমভাবে বেঁধে রাখা দামের সুবাদেই বিদেশি বইপত্র অনায়াসে কিনে ফেলা যায়।

অবশ্য বইপত্র কেনা যায় বলেই সমস্ত বিদেশি জিনিস সস্তায় কেনা যাবে এমন নয়। বস্তুত, বেশিরভাগ বিদেশি জিনিস দেশের বাজারে পাওয়াই যায় না, তাদের আমদানির ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ। তাছাড়া সরকারি বিনিময় মূল্যে ডলার কেনাটাও সহজ নয়। ডলার কিনতে গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি নিতে হবে, দশ রকম ফর্ম ভর্তি করতে হবে, সাতশো কৈফিয়ত দিতে হবে, আর আবেদন পত্র জমা দিয়ে মাসের পর মাস হাপিত্যেস করে বসে থাকতে হবে। সব থেকে বড় কথা, খুব নির্দিষ্ট কয়েকটা কারণ ছাড়া ডলার কেনাই যাবে না। এককথায় বলতে গেলে, সেই নিয়ন্ত্রণের যুগে আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হত, বিদেশি মুদ্রা বস্তুটা অত্যন্ত দুর্লভ একটা সম্পদ। অথচ দুর্লভ সম্পদ যেমন দুর্মূল্য হওয়ার কথা সেটা না হয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণে দামটা কৃত্রিমভাবে নামিয়ে রাখা হয়েছিল।

এই নিয়ন্ত্রণের ফলে একাধিক সমস্যা দেখা নিয়েছিল। প্রথমত, মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বিদেশি মুদ্রার একটা বড়-সড় কালোবাজার। দ্বিতীয়ত, সরকারি আমলা এবং শাসকদলের প্রতিনিধিরা বিদেশি মুদ্রা নামক দুর্লভ বস্তুটিকে ইচ্ছে মতো নিজেদের পছন্দসই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানদের নিয়ন্ত্রিত দামে পাইয়ে দিতে পারতেন এবং তার ফলে, বলাই বাহুল্য, মাঝে-মধ্যেই বিদেশি মুদ্রার বিলক্ষণ অপচয় ঘটত। তৃতীয়ত, যাঁরা জিনিসপত্র রপ্তানি করে বিদেশি মুদ্রা অর্জন করতেন তাঁদের অনেকেই অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দেশে নিয়ে আসতেন না, বিদেশেই কোথাও জমা রাখতেন। কারণ তাঁরা জানতেন ডলার নিয়ে একবার দেশে ঢুকলে সেটা নিয়ন্ত্রিত দামে টাকার সঙ্গে বিনিময় করতেই হবে। এবং ভবিষ্যতে দরকার পড়লেও টাকার বিনিময়ে আর সেই ডলার ফেরত পাওয়া যাবে না। তাছাড়া ডলারের দামটা যেহেতু কৃত্রিমভাবে কমিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই কম দামে ডলার বিক্রি করাটাই ছিল একটা ক্ষতি।

শেষোক্ত প্রবণতার ফলে একটু একটু করে আমাদের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারটি কমতে লাগল এবং গত নব্বই দশকের গোড়ায় পৌঁছে এমন একটা ভয়াবহ সময় এল যখন সরকারের হাতে দু'সপ্তাহের বেশি তেল আমদানি করার মতো ডলার নেই। এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ধার করতে বাধ্য হলেন। সেই ঋণের অন্যতম শর্ত ছিল ডলার-টাকার বিনিময় মূল্যের ওপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে হবে। সেই থেকে টাকার নিরিখে ডলারের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা-যোগান দিয়ে নির্ধারিত হয়ে আসছে, যদিও ডলার-টাকা বিনিময় মূল্যের ওপর আকস্মিক কোনও ঝড়-ঝাপটা এলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ডলার কেনাবেচা করে সাময়িকভাবে অবস্থা সামলাতে হয়। বলে রাখা দরকার, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের আরেকটা শর্ত মেনে সেই সময় থেকে ভারতের আমদানির ওপরে নিয়ন্ত্রণও অনেক শিথিল হয়েছে।

তার পর থেকে টাকার নিরিখে ডলারের দাম বেড়েই চলেছে। ১৯৭৯-৮০তে যে ডলারের দাম ছিল সাত-আট টাকা, ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে এখন সেই দাম সত্তর টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই দাম বাড়াটা অবশ্য ধারাবাহিক নয়। স্বল্পমেয়াদে ডলারের দাম অনেক সময়েই ওঠানামা করেছে। কিন্তু পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের ছবিটা একসঙ্গে দেখলে বোঝা যাবে দীর্ঘমেয়াদের ঝোঁকটা অনিবার্যভাবে বাড়ার দিকে।

ডলারের দাম বাড়া কিংবা ডলারের নিরিখে টাকার অবমূল্যায়নের ধাক্কাটা যদি শুধুমাত্র সমাজের ওপরতলার গুটিকতক মানুষের ওপর পড়ত, যদি এর কুপ্রভাব কতিপয় বিত্তবান বিদেশ ভ্রমনেচ্ছু কিংবা বাড়ির পয়সায় বিলেত-আমেরিকায় পড়তে যাওয়া দু'চারজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে, বলাই বাহুল্য, বিষয়টা নিয়ে এত দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ডলারের দাম ক্রমশ বাড়তে থাকার ফলে পেট্রল-ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। বাড়ছে সারের দাম, পাম্প চালানোর খরচ, কৃষিপণ্য গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে আসার খরচ। কাজেই নেহাতই ছাপোষা মানুষ, শ্রমিক-কেরানি-মাস্টার-ফেরিওলা, মার্কিন ডলার কিংবা বিদেশি মুদ্রা বাজারের সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক, তাঁরাও কেউ ডলারের দাম বাড়ার কুফল থেকে নিস্তার পাচ্ছেন না।

কয়েক বছর আগে ডলারের দাম বাড়ার জন্য ইয়োরোপের অর্থনৈতিক সঙ্কটকে দায়ী করা হচ্ছিল। আর একবার দায়ী করা হল ফেড বা ফেডারেল রিজার্ভ-এর তৎকালীন কর্তা বেন বারনানকের এই ঘোষণাকে যে, এখন থেকে মার্কিন সরকার নগদ ডলারের যোগানের ওপর রাশ টানবে। এবারে ডলারের দাম বাড়ার জন্য দায়ী করা হচ্ছে তুরস্কের ভঙ্গুর আর্থিক ব্যবস্থা এবং তৎজনিত সঙ্কটকে। আসল কথা হল, বর্হিবিশ্বের এইসব ঝড়ঝাপটা টাকা-ডলারের বিনিময় মূল্যকে সাময়িকভাবে প্রভাবিত করতে পারে নিশ্চয়, কিন্তু এই বিনিময় মূল্যের দীর্ঘমেয়াদি ঝোঁক নির্ধারিত হয় আমাদের আমদানি-রপ্তানি দিয়ে।

বাজারের আর পাঁচটা জিনিসের মতন টাকা-ডলারের বিনিময় মূল্যও নির্ভর করে চাহিদা ও জোগানের ওপর। টাকার নিরিখে ডলারের দাম বাড়ছে মানে টাকা-ডলার বিনিময়ের বাজারে চাহিদার তুলনায় ডলারের যোগান কমছে। টাকার সঙ্গে ডলার বিনিময়ের একটা বড় সূত্র আমদানি ও রপ্তানি। যিনি আমদানি করছেন তিনি টাকা দিয়ে ডলার কিনতে চাইছেন, যিনি রপ্তানি করছেন তিনি ডলার উপার্জন করে টাকার বিনিময়ে সেই ডলার বিক্রি করছেন। আমদানির তুলনায় রপ্তানি কম হতে থাকলে, ডলারের চাহিদা তার যোগানের থেকে বাড়তেই থাকবে, ফলে বাজারের নিয়মে টাকার দাম কমে যাবার অর্থাৎ ডলারের দাম বেড়ে যাবার প্রবণতা দেখা দেবে।

আমদানি এবং রপ্তানি মূল্যের মধ্যে তফাতের পোষাকি নাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘাটতি। ১৯৭৮-৭৯তে এই ঘাটতি ছিল ১.৩ বিলিয়ন ডলার। ২০১৬-১৭তে পৌঁছে সেই ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১০৬.২ বিলিয়ন ডলার। বাণিজ্য ঘাটতি একশ গুণ বেড়ে গেলে ডলারের দাম যে দশ গুণ বেড়ে যাবে এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? সাধারণত, এই ঘাটতির কিছুটা মেটানো হয় অনাবাসী ভারতীয়দের বিদেশ থেকে পাঠানো ডলার দিয়ে, কিছুটা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ডলার দিয়ে, খানিকটা আবার বিদেশি ঋণ কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে খয়রাতি হিসেবে পাওয়া অর্থ দিয়ে। কিন্তু ঘাটতির পরিমাণ এখন এতটাই বেড়ে গেছে যে ঋণ, খয়রাতি, বিনিয়োগ কিংবা অনাবাসীদের পাঠানো ডলার সব কিছু মেলালেও তা মেটানো যাচ্ছে না। এখন ঘাটতি মেটানোর মূল রাস্তা বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, বিদেশি ব্যাঙ্ক, পেনশন ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলির হাত দিয়ে যে কোটি-কোটি ডলার ভারতীয় শেয়ার বাজারে প্রতি বছর ঢুকছে, তাই দিয়েই মেটানো হচ্ছে বাণিজ্য ঘাটতি। হঠাৎ যখন শেয়ার বাজারে বেশি করে ডলার ঢুকছে তখন সাময়িকভাবে কমে যাচ্ছে ডলারের দাম, যখন ডলার বেরিয়ে যাচ্ছে তখন ডলার মহার্ঘ্য হচ্ছে।

সমস্যা হল, শেয়ার বাজারে ডলারের প্রবেশ ও প্রস্থান দু'টোই ঘোর অনিশ্চিত। তার ওপর নির্ভর করে টাকাকে স্থিতিশীল করা যায় না। ইয়োরোপের বাজারে যদি মন্দা চলে তাহলে সেখানে আমাদের রপ্তানি কমে

যাবে, ফলে টাকার কিছুটা অবমূল্যায়ন ঘটবে এটা বোঝা যায়। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং অমোঘ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারিদের ফাটকাবাজি। বারনানকের ঘোষণার ফলে শেয়ার বাজারের প্রাতিষ্ঠানিক লগ্নিকারি ফাটকাবাজরা মনে করেছিলেন, ফেডের আঁটোসাঁটো আর্থিক নীতির কারণে বাজারে মার্কিন ডলারের যোগান কমবে, আমেরিকায় বাড়বে সুদের হার। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা ভারতের শেয়ার বাজার থেকে বিনিয়োগ তুলে নিয়ে মার্কিন বাজারে বিনিয়োগ করেছিলেন। ফলে এক লাফে টাকার দাম অনেকটা কমে গিয়েছিল। আবার ইদানীং তুরস্কের লাগামছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘাটতির ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারিরা ভয় পাচ্ছেন যে ভবিষ্যতে তুরস্কতে ডলার এতটাই মহার্ঘ্য হয়ে যাবে যে সেখানে তুর্কি লিরা দিয়ে আর ডলার কেনা যাবে না। তখন সে দেশ থেকে বিনিয়োগ করা ডলার নিয়ে বেরোনো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এই ভাবনার ফলে এখনই তুরস্ক থেকে পাইকারি হারে ডলারের প্রস্থান ঘটছে। কিন্তু এই আতঙ্ক শুধু তুরস্কের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সেটা মহামারীর আকারে ভারতের মতো অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলিতেও ছড়িয়ে গেছে, যেখানে আন্তর্জাতিক ঘাটতি বেশি। ফলে শুধু ভারত নয়, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল ইত্যাদি অন্যান্য দেশের মুদ্রার ওপরেও আঘাত হেনেছে ফাটকাবাজদের এই আতঙ্ক।

আসল কথাটা হল, কেন্দ্রিয় সরকার এমন নীতি নিয়েছেন যার ফলে সাধারণ মানুষের ভাগ্য, বলতে গেলে সারা দেশের ভাগ্য, শেয়ার বাজারের খামখেয়ালিপনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আর একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে, বাণিজ্য ঘাটতি যতদিন থাকবে এবং তা মেটানোর দায় যতদিন বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ওপর বর্তাবে ততদিন এই দুর্ভোগ, এই অনিশ্চয়তা সাধারণ মানুষকে ভোগ করতেই হবে।

স্বীকার করে নেওয়া ভালো, কিছু গভীর অভ্যন্তরীণ সমস্যা আমাদের রয়েছে। ভারতীয় শিল্পদ্রব্য পৃথিবীর বাজারে এখনও তেমনভাবে ঢুকতে পারেনি। ফলে আমরা আমাদের রপ্তানি আশানুরূপ গতিতে বাড়াতে পারছি না। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদি মুদ্রাস্ফীতির হার কমাতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। আমেরিকার তুলনায় ভারতীয় মুদ্রাস্ফীতি যদি অনেকদিন ধরে বেশি থাকে, তাহলে ডলারের তুলনায় টাকার দাম তো কমবেই।

আসল তর্কটা হল, এই সঙ্কটের সময়ে আমাদের বাজারগুলোকে আমরা কতটা অবাধ করব, এই নিয়ে। সরকারের তরফে মনে করা হচ্ছে বাজারগুলো আরও অবাধ হলে, অর্থনৈতিক সংস্কার আরও জোরদার হলে, আরও আরও প্রাতিষ্ঠানিক বিদেশি বিনিয়োগ শেয়ার বাজারে ঢুকে সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। এই মনে করার মধ্যে অনেকটাই ইচ্ছাপূরণ মিশে আছে। তাছাড়া শেয়ার বাজার দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে গেলে, শেয়ার বাজারের অনিশ্চিত ওঠাপড়ার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভাগ্যও জড়িয়ে পড়বে। তার থেকে, স্বল্পমেয়াদের জন্য বিদেশি মুদ্রার বাজারে কিছু নিয়ন্ত্রণ আসা ভাল। বর্তমান ব্যবস্থায় ডলার বিক্রির ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত দরাজ। আমদানির প্রসঙ্গ উঠলে আমরা মূলত তেল আমদানির কথা বলি বটে, কিন্তু আসল চিত্রটা অন্যরকম। ২০১১-১২ সালে আমাদের মোট আমদানির ৩১ শতাংশ ছিল পেট্রলিয়াম জাত পণ্যের আমদানি। অনুপাতটা কমতে কমতে ২০১৬-১৭তে ২২ শতাংশে ঠেকেছে। অর্থাৎ অতি-আবশ্যকীয় পেট্রলিয়ম জাত দ্রব্য আমদানি করার বাইরেও আমরা অনেক কিছু আমদানি করছি যা না করলেও তেমন ক্ষতি ছিল না।

অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, যেখানে তেল কেনার ডলার জুটছে না, সেখানে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে সুইটজারল্যান্ড যাবার জন্য সরকার ডলার বিক্রি করবেন কেন? কেনই বা উচ্চবিত্তদের ভোগ্যসম্ভার বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে গিয়ে বিলাসদ্রব্যের আমদানিকে সরকার অবাধ অনুমতি দেবেন? এইসব অনুমতির ফলে ডলারের চাহিদা বাড়ছে, দাম বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে পেট্রল-ডিজেলেরও দাম বাড়ছে। আর এর মাসুল দিতে হচ্ছে গরিব মানুষকে।

সেই পুরোনো নিয়ন্ত্রিত বিদেশি মুদ্রার যুগে আমরা ফিরে যেতে বলছি না। কিন্তু আমরা মনে করছি, কিছু কিছু অদরকারি আমদানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে আমদানির এই অহেতুক বড় অঙ্কটা কমাতে

পারলে শেয়ার বাজার থেকে পালিয়ে যাওয়া ডলারের অনেকটাই পুষিয়ে দেওয়া যাবে। তখন ডলারের দামের ঊর্ধ্বগতিও অনেকটা আটকানো যাবে।

(২)

সাম্প্রতিক বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ডলার-বণ্ড বিক্রি করে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ধার নেবার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, খবরে প্রকাশ, আর এস এস-এর স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ তার বিরোধিতা করছে, এবং এই বিরোধিতারই জেরে অর্থসচিব সুভাষচন্দ্র গর্গকে অর্থ দপ্তর থেকে সরে যেতে হচ্ছে। অবশ্য শুধু আর এস এস নয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর একাধিক প্রাক্তন গভর্নার রঘুরাম রাজন, সি রঙ্গরাজন, ওয়াই ভি রেড্ডি সকলেই ডলার বণ্ড বিক্রি করে বিদেশি ঋণগ্রহণের বিপক্ষে। উল্টোদিকে অর্থমন্ত্রী ছাড়াও অর্থ দপ্তরের উপদেষ্টা কৃষ্ণমূর্তি সুব্রমনিয়ম এবং দিশি-বিদেশি একাধিক দক্ষিণ-ঘেঁষা আর্থিক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, এই মুহূর্তে বিদেশ থেকে ধার নিয়ে উন্নয়নের গতি বাড়ানো ভারতের পক্ষে বিশেষ লাভজনক।

উন্নয়নের গতি বাড়াতে গেলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। নতুন টাকা ছাপিয়ে কিংবা কর বসিয়ে এই অর্থের সংস্থান করা সম্ভব নয়। টাকা ছাপালে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, ফলে মানুষের ওপর চাপ বাড়বে, আর কর বাড়লে তো তার চাপ সরাসরি মানুষের ওপর গিয়ে পড়বে। একমাত্র উপায় বাজার থেকে ধার করা। ধার করারও সমস্যা আছে, সরকার বড় আকারে ধার করলে বাজারে সুদের হার বেড়ে যাবার সম্ভাবনা, কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

এতদিন টাকায় নির্ধারিত রুপি-বণ্ড বাজারে ছেড়ে টাকার অঙ্কে ধার করে এসেছে ভারত সরকার। ডলার-বণ্ড বিক্রি করে বিদেশ থেকে ঋণ নেবার পরিকল্পনা এই প্রথম। রুপি-বণ্ড বিক্রি করে ঋণ নিলে সুদ সহ ফেরতযোগ্য অর্থ শোধ দিতে হয় টাকায়। অপরপক্ষে, ডলার-বণ্ড বিক্রি মানে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ডলার ধার নেওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর সুদ-সহ সেই ডলার ফেরত দেওয়া। যাঁরা ডলার বণ্ডের পক্ষে সুপারিশ করছেন তাঁরা বলছেন রুপি-বণ্ডের পরিবর্তে ডলার-বণ্ড বাজারে ছেড়ে ধার নেবার অন্তত দুটো সুবিধে আছে। প্রথমত, দেশের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাজারে সুদের হার অনেক কম। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ধার করলে দেশে সুদের হার কম রাখা সম্ভব হবে।

বস্তুত, সুদের হার কম রাখার ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত উদগ্রীব। বলা হয়, সুদের হার কম থাকলে উদ্যোগপতিরা বেশি করে ধার নিয়ে বিনিয়োগ করবেন, ক্রেতারাও ধার নিয়ে বাড়ি-গাড়ি-ফ্রিজ-টিভি কিনবেন। ফলে দেশে একটা আর্থিক জোয়ার আসবে। এখন, দেশের বাজার থেকে সরকার যত ধার করবে, তত দিশি ঋণের বাজারে ঋণের চাহিদা বাড়বে, সুদের হার বাড়বে, ফলে ব্যাহত হবে বৃদ্ধি, উন্নয়ন। ডলার-বণ্ডের সমর্থকরা বলবেন, সেই সমস্যা এড়ানোর জন্যই বিদেশি ঋণগ্রহণ দরকার। বিদেশে ঋণ নিলে দিশি সুদের ওপর চাপ পড়বে না।

এসবের উল্টো যুক্তিও আছে। বিদেশি ঋণের ওপর সুদের হার কম হতে পারে, তবে এই ধরনের ঋণে টাকা-ডলার বিনিময় মূল্য বদলে যাবার ঝুঁকি পুরো মাত্রায় বর্তমান। ধরা যাক, ডলার-বণ্ড বিক্রি করে আমাদের সরকার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দুই শতাংশ সুদে ঋণ নিল। কিন্তু ঋণ শোধের সময় দেখা গেল ইতিমধ্যে ডলারের নিরিখে টাকার দাম দশ শতাংশ পড়ে গেছে। এর মানে, টাকার মূল্যে ঋণশোধের পরিমাণ দশ শতাংশ বেড়ে গেল, অর্থাৎ টাকার নিরিখে প্রকৃত সুদের হার গিয়ে দাঁড়াল বারো শতাংশ, যা দিশি সুদের হারের থেকে অনেক বেশি। ডলার-বণ্ডের প্রবক্তারা বলবেন, এই অঘটনটা ঘটবে না যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে টাকা-ডলার বিনিময় মূল্যটা বেঁধে রাখতে পারে। যেহেতু এই বিনিময় মূল্য অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতির হারের ওপর, তাই মুদ্রাস্ফীতি বশে রাখতে পারলেই টাকার অবমূল্যায়ন অনেকটা ঠেকানো যাবে।

কিন্তু ডলার-বণ্ড বিক্রি করে বিদেশ থেকে ঋণ নিলে মুদ্রাস্ফীতি আটকে রাখা যাবে কি? বিদেশ থেকে ঋণ নিলে দেশে সুদের হার কম থাকবে এটা ঠিক, সুদের হার কম থাকার কারণে মানুষ বেশি ঋণ নিচ্ছে এটাও

ধরে নেওয়া যাক ঘটল, কিন্তু ব্যাঙ্কের ঋণ বাড়লে নগদের যোগান বাড়বে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে। লক্ষ্যনীয় যে, যদি এরকম না ঘটে, অর্থাৎ কম সুদের হারে মানুষ বেশি ঋণ না নেয়, তাহলেও মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার সম্ভাবনা। সরকার ডলারে ধার নিয়ে তো আর ডলারে খরচা করবে না। সরকারকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে গিয়ে সেই ধার করা ডলারের বিনিময়ে টাকা নিতে হবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ছাপাতে হবে এই বাড়তি টাকা। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডলার ভাণ্ডারটি যেমন স্ফীত হবে, তেমনি দেশে নগদের যোগানও বাড়বে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, বিদেশ থেকে ঋণ নিলে বিনিময় মূল্যের ঝুঁকিটা এড়ানো যাচ্ছে না।

অন্য একটা গভীরতর সমস্যা আছে। ধার নেওয়া ডলার, যেটি প্রাথমিকভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে ঢুকল, সেটি ধার শোধ হওয়া অব্দি সেইভাবেই থেকে যাবে এমন মনে করার কোনও ভিত্তি নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়া, রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্যের কারণে চলতি খাতে ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতি, অকস্মাৎ কোনও গোলমালের ফলে দিশি শেয়ার বাজার থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পাইকারি হারে নিষ্ক্রমণ—এই রকম নানা কারণে সেই ডলার খরচ হয়ে যেতে পারে। সেই রকম কিছু ঘটলে ঋণশোধের সময় ডলার পাওয়া যাবে কোথা থেকে?

আসল কথাটা হল, যদি আমাদের ডলার উপার্জনের রাস্তাটা খুব পরিষ্কার থাকত, অর্থাৎ যদি আমরা আমাদের রপ্তানির ওপর ভরসা রাখতে পারতাম, তাহলে বিদেশি ঋণ নেওয়াটা হঠকারিতা বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যেত না। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে আমদানির তুলনায় রপ্তানি তেমন বাড়ছে না। অর্থাৎ ডলার আয়ের তুলনায় ডলার ব্যয় বেশি হচ্ছে। যেহেতু ডলারের ধার ডলারেই মেটাতে হবে এবং যেহেতু আমাদের ভবিষ্যত ডলার উপার্জন অনিশ্চিত তাই বিদেশি ঋণ আপাতত না নেওয়াই ভাল। স্মরণ করা যেতে পারে, গত আশির দশকে মেক্সিকো সরকার তাদের ঋণশোধের অক্ষমতা ঘোষণা করার পর সারা লাতিন আমেরিকায় ঋণসঙ্কট ছড়িয়ে পড়ে যার জের পুরোপুরি কাটতে একটা দশক লেগে গিয়েছিল। ইতিহাসে সরকারি ঋণখেলাপের আরও অনেক ঘটনা আছে। সাম্প্রতিকতম উদাহরণ গ্রীস। ঋণখেলাপি দেশগুলির তালিকায় ভারত নিশ্চয় তার নামটা ঢোকাতে চাইবে না।

তাহলে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে? আমাদের মতে, এই মুহূর্তে ঋণের জন্য দেশি বাজারের ওপর নির্ভর করাই ভাল। এতে হয়ত সুদের হার কিছুটা বাড়বে। কিন্তু তা নিয়ে অতিরিক্ত উৎকণ্ঠার কারণ দেখি না। বস্তুত, সুদের হার কম হলেই যে অর্থনীতিতে লেনদেনের জোয়ার আসবে এমন নয়। বিনিয়োগ কলকারখানা-যন্ত্রপাতিতেই হোক বা বাড়ি-গাড়ির মতো স্থায়ী ভোগ্যপণ্যে, শুধুমাত্র সুদের হারের ওপর বিনিয়োগকারির সিদ্ধান্ত সামান্যই নির্ভর করে। সিদ্ধান্ত মূলত নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিনিয়োগকারির ধারণার ওপর। যদি একজন উদ্যোগপতি মনে করেন ভবিষ্যতে তাঁর পণ্যের চাহিদা নেই, তাহলে সুদ যতই কম হোক তিনি কিছুতেই বিনিয়োগ করবেন না। ক্রেতা যদি মনে করেন ভবিষ্যতে তাঁর আয়ের স্থিরতা নেই তাহলে শূন্য সুদে ধার পেলেও তিনি ভোগ্যপণ্য কিনবেন না, বরং ভবিষ্যৎ দুর্দিনের জন্য টাকা জমিয়ে রাখবেন। ত্রিশ দশকের গ্রেট ডিপ্রেশন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সাব প্রাইম ক্রাইসিস সব ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা দেখা গেছে।

তাহলে সরকার সুদের হার কম রাখার চেষ্টা করছে কেন? কারণটা অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক। সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে কিনা আমরা সঠিক জানি না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানি সুদের হার কমলে উদ্যোগপতিদের মুনাফা বাড়ে। তাই উদ্যোগপতিরা সুদের হার কম রাখার জন্য সরকারের ওপর সর্বদাই চাপ সৃষ্টি করে। যেহেতু এই উদ্যোগপতিরাই অনেকাংশে বিজেপির নির্বাচনের খরচ বহন করেছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতেও করবে, তাই বিজেপি সরকার এদের কথা ফেলতে পারে না। অপরপক্ষে, স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ, সন্দেহ নেই, মূলত তাদের স্বদেশিয়ানার প্রেক্ষিত থেকেই বিদেশি ঋণের বিরোধিতা করেছে। বলাই বাহুল্য, শেষ অব্দি তাদেরই জয় হবে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং-এর চালচিত্র

অনাদায়ী ঋণ

ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলো একটা গভীর সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সঙ্কটের উৎস, জমে ওঠা পাহাড়-প্রমাণ অনাদায়ী ঋণ। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নিয়ে ধারশোধের কোনও কিস্তি তিন মাসের বেশি বকেয়া রাখলেই বিধিমতে ধারটি অনাদায়ী হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে এটাই নিয়ম, ভারতও এই নিয়মটাই গ্রহণ করেছে। আর, একবার অনাদায়ী হয়ে যাবার পর ক্বচিত-কদাচিৎ সুদ সমেত ঋণের টাকা পুরোপুরি ফেরত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তা যায় না। এই মুহূর্তে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলোর সম্মিলিত অনাদায়ী ঋণ দশ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি, আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় ছয় শতাংশ। অন্যভাবে দেখলে, ব্যাঙ্কগুলো যত টাকা ধার দিয়েছে তার দশ শতাংশ ফেরত আসেনি। অনাদায়ী ঋণের সিংহভাগ জমে উঠেছে সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে, তার মধ্যে আবার এগারোটি ব্যাঙ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিশেষ নজরে রেখেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই এগারোটি ব্যাঙ্কের মধ্যে কলকাতায় যাদের হেড আপিস এমন তিনটি ব্যাঙ্কই আছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলোর অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ খুবই বেশি। ইউরোপের কয়েকটা দেশ অবশ্য ঋণখেলাপীর নিরিখে আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। তবে সেসব দেশের সরকার নিজেরাই ঋণ নিয়ে শোধ দিতে পারেনি। বেসরকারি অনাদায়ী ঋণের দিক থেকে দেখলে আমরা পৃথিবীতে এক নম্বর। কথা হল, আমরা যারা সামান্য খেটে খাওয়া মানুষ, যারা ব্যাঙ্কে আমাদের যথাসর্বস্ব গচ্ছিত রাখি, অথবা ছোটখাট ব্যবসা করব বলে ধারের জন্য ব্যাঙ্কের দারস্থ হই, কিংবা যারা সেটুকুও পেরে উঠি না, নুন কিনতে যাদের পান্তা ফুরিয়ে যায়, ব্যাঙ্কের দোরগোড়া অব্দি পৌঁছনো হয় না, তাদের সকলেরই এইসব খবর নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ আছে।

কারণ একটা নয়, একাধিক। আশঙ্কা হয়, ব্যাঙ্কদের এই সঙ্কট নানাভাবে সাধারণ মানুষকে বিড়ম্বনায় ফেলবে। প্রথমত, অনাদায়ী ঋণের বোঝা বাড়লে ব্যাঙ্কগুলো নতুন ঋণ দিতে ইতস্তত করবে, নতুন ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেবে। ফলে ঋণগ্রহীতারা অসুবিধেয় পড়বেন, তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে, দেশের আর্থিক অগ্রগতি ব্যহত হবে, বৃদ্ধির হার কমবে। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, ব্যাঙ্ক ঋণ অপ্রতুল হলে বড় অধমর্ণদের যত না মুস্কিল হবে, ছোটদের মুস্কিল হবে তার থেকে অনেক বেশি। কারণ বড় বড় ঋণ যারা নেয়, সেইসব কম্পানি, ব্যাঙ্ক ঋণ ছাড়াও অন্য নানাভাবে টাকা তুলতে পারে। তারা বাজারে নতুন শেয়ার ছাড়তে পারে, বন্ড ছাড়তে পারে, সাধারণ মানুষকে কম্পানির ফিক্সড ডিপোজিট বিক্রি করতে পারে। বলাই বাহুল্য, ছোট ঋণগ্রহীতারা এসব সুযোগ নেই। ফলে তারা অনেক বেশি ব্যাঙ্ক ঋণের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ঋণের প্রবাহ ক্ষীণ হয়ে এলে শুধু যে দেশের আর্থিক বৃদ্ধি কমে যাবে তাই নয়, দেশে অসাম্য বাড়বে।

এখানে আর একটা কথা আছে। ঋণখেলাপীদের তালিকা খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, ছোট-ছোট ঋণগ্রহীতারা মোটের ওপর ধার নিয়ে টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছেন, ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করেনি মূলত বড় বড় কম্পানিগুলো। তাহলে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে, বড়দের পাপের বোঝা বইতে হচ্ছে ছোটদের। বড়রা ধার নিয়ে শোধ করেনি বলে ছোটদের নতুন ঋণ পেতে অসুবিধে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কে অনুৎপাদক সম্পদের ঝুঁকি বেড়ে গেলে, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, নতুন পুঁজি আনতে হয়, যাতে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ এবং পুঁজির অনুপাতটা ঠিক থাকে। অনাদায়ী ঋণের বোঝায় নুয়ে পড়া ব্যাঙ্কগুলোর প্রায় সবই সরকারি, ফলে এই ব্যাঙ্কগুলোকে নতুন পুঁজি জোগানোর দায়িত্বটাও সরকারের।

সরকারের ক্ষমতা সীমিত। তাই ব্যাঙ্কগুলোকে নতুন করে পুঁজি জোগাতে গেলে সরকারকে অন্য খাতে খরচ কমাতে হবে। বিশেষ করে, উন্নয়নের জন্য যে টাকাটা বরাদ্দ আছে তাতে টান পড়ার সম্ভাবনাই সব থেকে বেশি। এর ফলে একেবারে হত-দরিদ্র মানুষ, যাঁরা কখনও ব্যাঙ্কমুখোই হতে পারেননি, তাঁরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

এফ আর ডি আই বিল

ব্যাঙ্ক এবং দেশের অন্যান্য মৃতপ্রায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নতুন জীবন দেবার জন্য অথবা তাদের মৃত্যুর প্রক্রিয়াটি যন্ত্রণাহীন ও আইনগতভাবে নিষ্কণ্টক করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় একটি বিল এনেছে। বিলটির নাম 'ফিনান্সিয়াল রেসোলিউশন অ্যান্ড ডিপোসিট ইন্সিয়োরেন্স বিল, ২০১৭', সংক্ষেপে এফ আর ডি আই। নাম থেকেই টের পাওয়া যায়, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাস্থ্যরক্ষা কিংবা অবস্থাগতিকে, পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করা ছাড়াও বিলটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ডিপোজিট ইন্সিয়োরেন্স-এর মাধ্যমে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা। কিন্তু নামে স্বার্থরক্ষা হলেও, বিলটি ভাল করে পড়ে দেখলে বোঝা যাবে, এতে এমন কিছু প্রস্তাব আছে যা আমানতকারিদের পক্ষে মারাত্মক। বস্তুত, বিলটি আইনে পরিণত হলে এবং সেই আইনের অপপ্রয়োগ ঘটলে সাধারণ মানুষ তাঁদের ব্যাঙ্কে রাখা সারা জীবনের সঞ্চয় খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবেন। তাই এই বিলটির ব্যাপারে সকলেরই ওয়াকিবহাল থাকা দরকার।

মূল আলোচনায় ঢোকার আগে এফ আর ডি আই-এর পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে দু'চার কথা। এটা অনেকেরই অজানা নয় যে, বেশ কিছুদিন যাবত ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অনাদায়ী ঋণের বোঝায় জেরবার হয়ে রয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানাচ্ছে, এই মুহূর্তে দেশের বিধিবদ্ধ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মোট অনাদায়ী ঋণ বা নিষ্ফল সম্পদ (যার ইংরেজি নাম নন পার্ফর্মিং অ্যাসেট) ১০ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। মোট নিষ্ফল সম্পদের ৬০ শতাংশই আবার রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে রয়েছে। অপরপক্ষে, মোট নিষ্ফল সম্পদের এক-চতুর্থাংশ, অর্থাৎ ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা, মাত্র বারোটি সংস্থা ঋণ হিসেবে নিয়েছিল, যা তারা ফেরত দেয়নি। অর্থাৎ ২৫ শতাংশ নিষ্ফল সম্পদের জন্য দায়ী মাত্র বারোটি বৃহৎ অধমর্ণ। বাকি ৭৫ শতাংশ অনাদায়ী ঋণেও বড়দেরই প্রাধান্য। দেখা যাচ্ছে, ছোট ঋণগ্রহীতারা মোটের ওপর ঋণ নিয়ে ফেরত দিয়ে দিচ্ছেন।

অবশ্য এটা সত্যি যে, গত সাত-আট বছর ধরে সারা পৃথিবী ব্যাপী মন্দা চলেছে, যার কবল থেকে আমাদের দেশও পুরোপুরি মুক্তি পায়নি। মন্দার কারণে বিশ্ব জুড়ে নির্মাণ প্রকল্পগুলি এক এক করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং এর ফলে সব থেকে মার খেয়েছে ইস্পাত শিল্প। ইস্পাত শিল্পের সঙ্কট আমাদের আর্থিক বাজারেও ছায়া ফেলেছে, সন্দেহ নেই। যে বারোটি ঋণখেলাপী সংস্থার উল্লেখ করেছি তাদের অধিকাংশই ইস্পাত তৈরি করত। কাজেই কেউ বলতেই পারে, বড় পুঁজিপতিদের ষড়যন্ত্র নয়, বিশ্ব বাজারে মন্দার ফলেই বৃহৎ আকারে ঋণখেলাপ ঘটেছে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। প্রথমত, মন্দার ফলে ঋণখেলাপী ইস্পাত কোম্পানিগুলোর বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু কোম্পানির মালিকরা কোম্পানি থেকে তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ মোটা মুনাফা সমেত আগেই সরিয়ে নিয়ে দিব্য গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বস্তুত, টাকা সরিয়ে নেবার ফলে বহুক্ষেত্রে ঋণখেলাপ তরান্বিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ইস্পাত শিল্পের বাইরেও ঋণখেলাপ ঘটেছে এবং সেখানে বড় পুঁজিপতিদেরই প্রাধান্য।

সে যাই হোক, ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ী ঋণ জনিত সমস্যা সমাধানের জন্য ইদানিং ২০১৬ সালে চালু হওয়া ইন্সলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপসি কোড, সংক্ষেপে আই বি সি, নামক আইন এবং ২০১৬ সালের জুন মাসে নবগঠিত ন্যাশানাল কম্পানি ল ট্রাইবুনাল, সংক্ষেপে এন সি এল টি, নামক কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে এন সি এল টি-র ১১টি শাখা ভারতের বিভিন্ন সহরে কাজ করছে। যে বারোটি বৃহত্তম ঋণখেলাপী কোম্পানির কথা উপরে উল্লেখ করেছি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী তারা সকলেই এখন এন সি এল টি-র বিচারাধীন। এন সি এল টি প্রথমে দেখবে উত্তমর্ণদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসে

কোম্পানিগুলোকে আবার চালু করা যায় কিনা। যদি নেহাতই সেটা সম্ভব না হয় তাহলে কোম্পানিকে বন্ধ করে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে কোম্পানির যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে যতটুকু সম্ভব উত্তমর্ণদের পাওনা মেটানো হবে।

কিন্তু এন সি এল টি যতই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করুক, এটা পরিষ্কার যে, সমাধান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্ক ইত্যাদি উত্তমর্ণরা তাদের প্রাপ্য টাকার একটা ভগ্নাংশ মাত্র ফেরত পাচ্ছে। এই কারণে গুরুতরভাবে ভেঙে পড়ছে তাদের স্বাস্থ্য। ফলে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিরও পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন ঘটছে। ক্ষেত্র বিশেষে, যেখানে স্বাস্থ্য এতটাই ভেঙে গেছে যে তার আর উদ্ধার সম্ভব নয়, আর্থিক সংস্থাটাকে পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়া দরকার হয়ে পড়ছে। সব মিলিয়ে যেমন অধমর্ণদের জন্য এন সি এল টি তেমনি উত্তমর্ণদের জন্যও একটা কর্তৃপক্ষ এবং একটা আইনি পরিসর দরকার হচ্ছে যা দিয়ে রুগ্ন আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির সমস্যার সমাধান করা যাবে। এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তাবিত হয়েছে এফ আর ডি আই বিল।

রুগ্ন আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং যে আমানতকারীরা এই সংস্থাগুলিতে টাকা রেখেছে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য এফ আর ডি আই বিলে একটি কর্পোরেশন বা নিগম গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। নিগম গঠন করবে কেন্দ্রীয় সরকার, নাম হবে রেসোলিউশন কর্পোরেশন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা ছাড়াও নিগমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেবি ইত্যাদি নিয়ামকদের প্রতিনিধিরা থাকবেন।

অতীতে আমরা দেখেছি, একটা আর্থিক সংস্থা, বিশেষ করে রাষ্ট্রের অধীন কোনও সংস্থা, যখন রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে, তখন সরকার এগিয়ে আসছে, তাকে নতুন পুঁজি দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করছে। এটা শুধু ভারত নয় সারা পৃথিবীর অলিখিত নিয়ম। এর পোষাকি নাম 'বেল আউট'। এফ আর ডি আই প্রস্তাবিত রেসোলিউশন কর্পোরেশন কিন্তু বেল আউটের পথে আদৌ হাঁটবে না। নিগমের লক্ষ্য হবে রুগ্ন আর্থিক সংস্থাটির আর্থিক দায়গুলো ঠিকমত সামলে তাকে বাঁচিয়ে তোলা। এর জন্য প্রস্তাবিত বিলে বেল আউটের বদলে 'বেল ইন' বলে একটা অভিনব ও মারাত্মক উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বর্তমানে এটাই ধরে নেওয়া হয় যে, কোনও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে সেই টাকা সুদ সমেত ফেরত দেবার দায়িত্ব সরকারের। এফ আর ডি আই বিল এটাকে বদলে দিতে চাইছে। বিলের প্রস্তাব অনুযায়ী, রেসোলিউশন কর্পোরেশনের হাতে ক্ষমতা দেওয়া থাকবে একটা রুগ্ন আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার আর্থিক দায়গুলো সম্পূর্ণ বাতিল করে দেবার অথবা দরকার মতো তাদের রদবদল ঘটানোর। এটাকেই বলা হচ্ছে 'বেল ইন'। কোনও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক দায়গুলো আইনত বাতিল করে দিলে কিংবা তার রদবদল ঘটালে সরকারের এই দায় নিয়ে আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। এই মারাত্মক প্রস্তাবের নিহিতার্থটা ভাল করে বোঝা দরকার।

ধরা যাক, আমানতকারী এমন একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছে যে ব্যাঙ্ক জমে ওঠা বিপুল অনাদায়ী ঋণের কারণে রুগ্ন হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কটিকে চাঙ্গা করার জন্য বিলের প্রস্তাব অনুযায়ী নিগমের হাতে অনেকগুলি বিকল্প থাকছে। এক, নিগম চাইলে আমানতকারীর সঙ্গে ব্যাঙ্কের সুদসহ টাকা ফেরত দেবার চুক্তিটা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে আমানতকারী তার জমা টাকার এক পয়সাও ফেরত পাবেন না। দুই, নিগম আমানতকারীকে টাকার বদলে ব্যাঙ্কের শেয়ার নিতে বাধ্য করতে পারে, যদিও সকলেই জানে সেই শেয়ারের দাম কানাকড়িও নয়, যেহেতু ব্যাঙ্কটি রুগ্ন হয়ে গেছে। তিন, নিগম চাইলে চুক্তির শর্ত বদলে আমানতের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারে অথবা সুদের হার কমিয়ে দিতে পারে। চুক্তিটাই যখন বদলে দেবার ক্ষমতা নিগমের থাকছে তখন রুগ্ন সংস্থাকে পুনরুজ্জীবনের দোহাই দিয়ে আরও অনেক কিছুই করা সম্ভব।

এর পাশাপাশি অবশ্য আমানতকারীদের আমানত বীমা নির্দারণের ক্ষমতাও নিগমের হাতে থাকছে। অনেকেই হয়ত জানেন না, বর্তমানে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানতের ওপর সর্বোচ্চ বীমার পরিমাণ এক লক্ষ

টাকা। অর্থাৎ কোনও আমানতকারীর এক কোটি টাকা আমানত থাকলেও তার আমানত বীমার পরিমাণ এখন এক লক্ষের বেশি নয়। নিগম ইচ্ছে করলে এই বীমার পরিমাণ খানিকটা বাড়াতেও পারে, আবার চাইলে কমাতেও পারে। এটাকেই আমানতকারীর স্বার্থরক্ষা বলে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু বীমা বাড়লেও কতটা বাড়তে পারে? বিশেষ করে তার বদলে যদি আমানত ফেরত পাবার অলিখিত সরকারি গ্যারেন্টিটা উধাও হয়ে যায়, যদি আমানতের মৌলিক নিরাপত্তাটাই না থাকে, তাহলে লাভ কী হল?

বিল পাস হলে, সাধারণ মধ্যবিত্ত, যাঁদের সামান্য পুঁজি, সামান্য সঞ্চয়, যাঁরা ঝুঁকি না নিয়ে তাঁদের সারা জীবনের সঞ্চয় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে জমা রাখতে অভ্যস্ত, ব্যাঙ্কে রাখা জমা টাকা ক'টাই যাঁদের অবসর জীবনের সম্বল, তাঁদের আর কোনও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থাকবে না। উপরন্তু, সাধারণ মধ্যবিত্তকে অসৎ পুঁজিপতিদের দুষ্কর্মের বোঝা বইতে হবে। অসৎ পুঁজিপতি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে ফেরত দেবেন না, ফলে রুগ্ন হয়ে পড়বে ব্যাঙ্ক আর সেই রুগ্নতার দায় গিয়ে পড়বে সাধারণ আমানতকারীর ঘাড়ে। তাদের রক্ত জল করা সঞ্চয় মেরে দিয়ে ব্যাঙ্কের পুনরুজ্জীবন ঘটানো হবে। এমন অন্যায় আগে কখনও শোনা যায়নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আমানতকারীর টাকা বাজারে ধার দিয়ে যে ঝুঁকি ব্যাঙ্ক নিচ্ছে সেই ঝুঁকির একটা অংশ আমানতকারী নিজে বহন করবেন না কেন? বিশেষ করে, ব্যাঙ্কে টাকা রেখে আমানতকারী যখন সুদ পাচ্ছেন। এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর। প্রথমত, ব্যাঙ্ক চাইলে পরস্পর সম্পর্কহীন আলাদা আলাদা প্রকল্পে টাকা ধার দিয়ে ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে ফেলতে পারে। সব প্রকল্প তো আর এক সঙ্গে ডুববে না। অর্থশাস্ত্রে এর নাম পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন। কিন্তু বাস্তবে যখন দেখছি ঝুঁকি যথেষ্টই থাকছে এবং জমে উঠছে অনাদায়ী ঋণের পাহাড় তখন ধরে নিতে হবে এটা ব্যাঙ্কের অদক্ষতা, নিয়ামকের ব্যর্থতা আর সবার ওপরে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে অসাধু বোঝাপড়ার ফল। এর বোঝা আমানতকারী কেন বইবেন? দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক আশাতীত লাভ করলে তার ভাগ তো আমানতকারী পাচ্ছেন না, তাহলে ব্যাঙ্কের অবস্থা খারাপ হলে তার দায় আমানতকারী নেবেন কেন? সব থেকে বড় কথা, আমাদের দেশে সামাজিক সুরক্ষা বলে প্রায় কিছুই নেই। তাই এখানে সরকারকে এগিয়ে এসে আমানতকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই হবে। দরকার পড়লে, বেল আউটের মাধ্যমে। বেল আউট প্রথা তো ধনতন্ত্রের পীঠস্থান আমেরিকাতেও আছে।

আর একটা কথা। ব্যাঙ্ক আমানতে নিরাপত্তা না থাকলে সাধারণ মানুষ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হবেন আর এতেও পুঁজিপতিদের লাভ। শেয়ার বাজারে বাড়তি বিনিয়োগ হলে, দশ টাকার শেয়ার বিক্রি হবে একশ টাকায়। ফলে যে পুঁজিপতিদের হাতে কোম্পানির বেশিরভাগ শেয়ার, তাঁরা রাতারাতি দশগুণ বড়লোক হয়ে যাবেন। সব মিলিয়ে মনে হয়, এই বিলটি যেন বড় পুঁজিপতিরাই খসড়া করেছেন। সরকারি মুখপাত্ররা অবশ্য বলছেন, এসব কিছু ঘটানো বিলের উদ্দেশ্য নয়, শুধু সাধারণ আমানতকারীদের নিরাপত্তা দেওয়াটাই এই বিলের লক্ষ্য। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে, যদি ব্যবহারই না করা হবে তাহলে বেল ইন-এর সংস্থানটা বিলে রাখা হল কেন? তাছাড়া যাঁরা বিনা নোটিশে নোট বাতিল করে কোটি-কোটি গরিব মানুষকে বিপদে ফেলতে পারেন, তাঁদের পক্ষে ধনীর স্বার্থে সাধারণ মধ্যবিত্তের নিরাপত্তা কেড়ে নেওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয়।

লোক-ঠকানো বিনিয়োগ কম্পানি

সুদীপ্ত সেন কেলেঙ্কারির পাঁকে রাজনৈতিক নেতারা যতই নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছেন ততই যেন এই বিপর্যয়ের অর্থনৈতিক পটভূমিটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, যে-পটভূমি না থাকলে, এইরকম বিরাট একটা কেলেঙ্কারি সম্ভবত ঘটতে পারত না। আমরা নিশ্চয় চাইব, রাজনৈতিক রঙ ব্যতিরেকে, দোষীদের কঠোরতম শাস্তি হোক কিংবা আশা করব, অর্থনৈতিক অপরাধ আটকাতে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে আরও ফলপ্রসূ আইন প্রণয়ন করা হোক। কিন্তু মনে রাখা দরকার, বড়-বড় চোর-ডাকাতদের সঙ্গে অসাধু রাজনীতিবিদদের যোগসাজস অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে, যেমন আবার, আইন যতই কড়া করে তৈরি হোক না

কেন, তার ফাঁক-ফোকরগুলোও ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য। তাই যে-অর্থনৈতিক আবহাওয়ায় ঘটনাটা ঘটেছে তার পরিবর্তন প্রয়োজন, নাহলে মূল ব্যাধিটা থেকেই যাবে।

আসলে একটা নয়, ঘটনা দুটো। একটা গত দশকে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে ঘটে গেছে। আর একটা পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটল। ঘটনা দুটির উৎপত্তি কিন্তু একই অর্থনৈতিক কারণগত। পূর্ব ভারতে যেমন ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে লোক-ঠকানো চিট-ফান্ড, তেমনি অন্ধ্রপ্রদেশ ভুঁইফোঁড় মাইক্রো-ফাইনান্স সংস্থায় ছেয়ে গিয়েছিল। চিট-ফান্ডগুলো, (আমরা চলতি ব্যবহার অনুযায়ী এদের চিট ফান্ড বলছি, যদিও সেবির নামকরণ অনুসারে এরা কালেক্টিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কীম বা সি আই এস) অবাস্তব সুদের লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা জমা নিয়ে স্রেফ মেরে দিচ্ছে। ওই চড়া সুদে টাকা ফেরত দেবার উপায় বা অভিপ্রায় তাদের নেই। পক্ষান্তরে, মাইক্রো-ফাইনান্স সংস্থাগুলো অতি চড়া সুদে গরিব মানুষকে টাকা ধার দিচ্ছিল, এবং তারপর, তাদের সকলে না হলেও অনেকেই, লাঠিসোটা নিয়ে, ভয় দেখিয়ে, বলা যেতে পারে, গলায় পা দিয়ে অসহায় মানুষগুলোর কাছ থেকে টাকা আদায় করছিল। তা সত্ত্বেও যাঁরা টাকা শোধ করতে পারছিলেন না, তাঁদের পুরোনো ধারগুলোকেই নতুন ধার হিসেবে দেখানো হচ্ছিল, ব্যাঙ্কিং-এর ভাষায় যার নাম এভারগ্রীনিং। তাই, কাগজে-কলমে, মাইক্রো-ক্রেডিট সংস্থাগুলো থেকে টাকা ধার করে ফেরত না দেবার অনুপাত খুব সামান্য হলেও এই সাফল্য থেকে উল্লাসের কিছু নেই, কারণ এর আড়ালে অনেক গরিব মানুষের কষ্ট লুকিয়ে আছে। ২০১০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার প্রথমে অর্ডিন্যান্স ও পরে আইন করে মাইক্রো-ফাইনান্স সংস্থাগুলির কাজকর্ম প্রায় বন্ধ করে দেয়। আরও পরে, ২০১১ সালে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে প্রকাশিত মালেগম রিপোর্ট এবং কেন্দ্রিয় অর্থমন্ত্রকের মাইক্রো-ফাইনান্স বিল ক্ষুদ্র-ঋণের সংস্থাগুলোকে ক্রেতা সুরক্ষার দিকটায় নজর রাখতে খানিকটা বাধ্য করেছে। আসল সমস্যাটা কিন্তু রয়েই গেল।

আসল সমস্যাটা ঠিক কি? আসল সমস্যা হল, একদিকে ব্যাঙ্কগুলো গ্রামের গরিব মানুষদের কাছে পৌঁছতে পারছে না আর অন্যদিকে সরকারি ঋণ কমানোর ব্যাপারে কেন্দ্রের অর্নথক বাড়াবাড়ির ফলে ডাকঘরের স্বল্প-সঞ্চয়ে কেন্দ্র আর তেমন উৎসাহ দিচ্ছে না। ব্যাঙ্কের দুটো কাজ—টাকা জমা নেওয়া এবং টাকা ধার দেওয়া। ডাকঘরও, চিঠি বিলি করার সঙ্গে সঙ্গে, কিছুদিন আগে অব্দি এই কাজটাই করে আসছিল। প্রত্যন্ত গ্রামে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা না পৌঁছনোর ফলে এবং স্বল্প-সঞ্চয়ে উৎসাহ কমিয়ে দেবার কারণে, প্রথম কাজটা চলে যাচ্ছে চিট-ফান্ডগুলোর দখলে, আর দ্বিতীয় কাজটা করার ছুতোয় মাইক্রো-ফাইনান্স নাম নিয়ে কিছু সংস্থা মহাজনী কারবার চালাচ্ছে। এর ফলে দুটো বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এক, সরাসরি মারা পড়ছে গ্রামের গরিব মানুষ। হয় ঠগ-জোচ্চোরদের হাতে টাকা জমা রাখার ফলে তাঁদের সর্বস্ব খোয়া যাচ্ছে, না হয় মহাজনের টাকা শোধ করতে গিয়ে তাঁরা ধনে-প্রাণে মারা পড়ছেন। দুই, যে-বিপুল পরিমাণ টাকা দেশের আর্থিক উন্নতিতে কাজে লাগতে পারত, সেটা দুবৃত্তদের হাতে পড়ে কিছু বিলাস-ব্যসনে খরচ হয়ে যাচ্ছে আর বাকিটা অন্ধকারাচ্ছন্ন কোনও ব্যবসায় নিয়োগ করা হচ্ছে।

২০১২ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্ট বলছে, যেখানে উন্নত দেশগুলিতে নব্বই শতাংশেরও বেশি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, সেখানে আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র পঁয়ত্রিশ শতাংশের। অনুপাতটা, বলাই বাহুল্য, গ্রামে আরও কম। বস্তুত, সারা ভারতে চল্লিশ শতাংশ এবং পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ষাট শতাংশ গ্রামবাসীর কাছে এখনও ব্যাঙ্ক-পরিষেবা পৌঁছতে পারেনি। এই অবস্থায় যদি গরিব মানুষ নিরুপায় হয়ে ভুঁইফোঁড় সংস্থাদের হাতে টাকা গচ্ছিত রাখেন, তার জন্য আর্থিক নীতি-নির্ধারকদের ব্যর্থতা অবশ্যই দায়ী। এখানে দুটো প্রশ্ন উঠছে—এক, কেন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছতে পারছে না? দুই, পৌঁছতে পারলেই কি চিট ফান্ডদের দৌরাত্ম ঠেকানো যেত?

গ্রামে ব্যাঙ্কদের ব্যবসা তেমন করে না পৌঁছনোর মূল কারণ, বেশ কিছুদিন যাবত, উদারীকরণ নীতির অঙ্গ হিসেবে, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় মুনাফাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। বছরের শেষে যে-ব্যাঙ্ক যত বেশি লাভ রাখতে

পারছে তার তত কদর। এতে নিন্দের কিছু নেই, ব্যাঙ্কদের অকর্মণ্য মেদ ঝরিয়ে ফেলার জন্য কিছুটা লাভ-লোকসানের দিকে নজর দেওয়া অবশ্যই দরকার ছিল। সমস্যা হল, লাভের দিকে নজর রাখতে গিয়ে ব্যাঙ্করা তাদের সামাজিক দায়-দায়িত্বগুলো প্রায় ভুলতে বসেছে। প্রত্যন্ত গ্রামে শাখা খুললে যেহেতু তেমন লাভ নেই তাই গ্রামীণ শাখা বিস্তারে তেমন উৎসাহ ব্যাঙ্কদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। হাল আমলে অবশ্য দূরের গ্রামে শাখা না খুলেও কেমন করে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু ভাবনা-চিন্তা করেছে। বিজনেস করেসপন্ডেন্ট নামক একটি প্রকল্প তৈরি হয়েছে যেখানে ব্যাঙ্কের কোনও প্রতিনিধি একটি হস্ত-চালিত যন্ত্র এবং কিছু নগদ টাকা নিয়ে দূরবর্তী গ্রামগুলোতে নিয়মিত পৌঁছবেন এবং তাঁর সহায়তায় গ্রামের মানুষরা টাকা তোলা ও টাকা জমা রাখার কাজ সম্পন্ন করবেন। প্রকল্পটি খুব বেশি দূর এগোয়নি। এর একটা কারণ ব্যাঙ্কদের দিক থেকে উদ্যোগের অভাব। কিন্তু এ-ছাড়া আরও একটা কারণ আছে। শোনা যাচ্ছে, বিজনেস করেসপন্ডেন্ট বলে ব্যাঙ্কগুলো যাদের নিয়োগ করেছিল তাদের অনেকেই ছিল একই সঙ্গে চিট ফান্ডের এজেন্ট। তাই ব্যাঙ্কের প্রকল্প সফল করার ব্যাপারে তাদের তেমন একটা উৎসাহ ছিল না।

এখানেই দ্বিতীয় প্রশ্নটা অনিবার্যভাবে চলে আসছে। প্রশ্নটা উৎসাহ সংক্রান্ত। চিট ফান্ডগুলো যেখানে বিপুল পরিমাণ কমিশন ও সুদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সেখানে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা বা রাখানোর জন্য চেষ্টা করার উৎসাহ মানুষের থাকবে কেন? অর্থাৎ চিট ফান্ডগুলো যেখানে রমরমিয়ে ব্যাবসা করছে সেখানে ব্যাঙ্কের উপস্থিতি থাকা না থাকা সমান। এখানে চিট ফান্ডগুলোর হাত থেকে সাধারণ মানুষদের বাঁচানোর জন্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকাটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। খবরে প্রকাশ, চিনে ২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৪০০ চিট ফান্ড মালিককে গ্রেপ্তার করে হয় যাবজ্জীবন কারাদন্ড আর না হয় মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে অতটা না হোক খানিকটা কঠোর আইন অবশ্যই দরকার। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল, শুধুমাত্র যদি কড়া আইন তৈরি হয়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কগুলোর পর্যাপ্ত অনুপ্রবেশ না ঘটে, তাহলে একটা শূন্যতা থেকেই যাবে, যে শূন্যতার সুযোগ নিয়ে আইনের ফাঁক দিয়ে গলে ভুঁইফোঁড় সংস্থাগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

এবার ডাকঘরের স্বল্প-সঞ্চয় নিয়ে দুচার কথা। কয়েক বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গে বিপুল পরিমাণ স্বল্প-সঞ্চয় জমা হত। এখন হয় না। নিশ্চয় এই হ্রাসপ্রাপ্ত স্বল্প-সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ চিট ফান্ডগুলোর কাছে জমা পড়েছে। কিন্তু এর পেছনে যে শুধুমাত্র চিট ফান্ডগুলোর প্রলোভন রয়েছে তা নয়, কেন্দ্রিয় সরকার রীতিমত পরিকল্পনা করে স্বল্প-সঞ্চয়ের প্রকল্পগুলোকে অনাকর্ষক করে তুলেছে, এটাও একটা কারণ। স্বল্প-সঞ্চয় তো আসলে জনসাধারণের কাছ থেকে নেওয়া কেন্দ্রিয় সরকারের ঋণ। সরকার এই ঋণ আর নিতে চায় না। তারা মনে করছে, সরকারি ঋণ বাড়তে থাকলে বাজারে বেসরকারি ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণের যোগান কমে যাবে, ফলে বেড়ে যাবে সুদের হার। সুদের হার বেড়ে গেলে বেসরকারি পুঁজিপতিদের মুনাফা কমে যাবে, ধ্বস নামবে শেয়ার বাজারে। সরকার এইসব চায় না, তারা ভাবছে, সব থেকে আগে বেসরকারি পুঁজিপতিদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। বেসরকারি কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেলে করসংগ্রহ নিজের থেকেই বেড়ে যাবে। তখন জনসাধারণের কাছ থেকে ধার করারও আর দরকার পড়বে না।

অর্থাৎ উদার ব্যাঙ্কনীতির মত এখানেও আমরা অতি-দক্ষিণ চিন্তার একটা প্রলম্বিত ছায়া দেখতে পাচ্ছি। যে চিন্তা আমাদের বিশ্বাস করতে বলছে, সব সমস্যা বেসরকারি হাতে ছেড়ে দিলে, নিজের থেকেই সমাধান হয়ে যাবে। আর গরিবদের জন্যেও আলাদা করে ভাবার কিছু নেই, বাজারই উদ্ধার করবে তাদের। কঠিন বাস্তব কিন্তু সম্পূর্ণ উলটো কথা বলছে।

বন্ধন ব্যাঙ্ক

২০১৫ সালের ২৩শে অগস্ট একটা পুরোদস্তুর ব্যাঙ্ক হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল বন্ধন। ঘটনাটা একাধিক কারণে উল্লেখের দাবি রাখে। ষোলোআনা বাঙালি একটা কোম্পানি ব্যাঙ্ক লাইসেন্স পাবার দৌড়ে রথী-

মহারথীদের পিছনে ফেলে পুরস্কার জিতে নিল, এটা বিরল ঘটনা বৈকি। তার ওপর, এই প্রথম আমাদের দেশে একটা মাইক্রো ফাইনান্স ইন্সটিটিউশন বা ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা ব্যাঙ্কের মর্যাদা পেল, এটাও লক্ষনীয়। কিন্তু সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল, যে-অনুৎপাদক সম্পদের ভারে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলোর ইদানীং নাভিশ্বাস উঠেছে, বন্ধন ক্ষুদ্রঋণ সংস্থায় সেই অনুৎপাদক সম্পদ নেই বললেই চলে। প্রশ্ন উঠছে, অনুৎপাদক সম্পদ কমানোর ব্যাপারে বন্ধন কি তাহলে সাবেকি ব্যাঙ্কগুলোকে রাস্তা দেখাতে পারবে?

যে-টাকা ধার দিয়ে ব্যাঙ্কগুলো ফেরত পায়নি সেগুলোই তাদের অনুৎপাদক সম্পদ। ২০১৫ সালের ১৯শে অগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী শেষ তিনটি কোয়ার্টারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর অনুৎপাদক সম্পদ বেড়েছে যথাক্রমে ৬.২, ৩.২ এবং ৮.৮ শতাংশ হারে। শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ৭.৫, ৬.৯ এবং ১০.৪ শতাংশ। কোনও কোনও হিসেব বলছে, রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির গড় অনুৎপাদক সম্পদ তাদের মোট সম্পদের প্রায় ৬ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলেছে। তুলনায় গত বছর বন্ধন তার ৯৯.৯ শতাংশ ঋণ ফেরত পেয়েছিল এবং তার অনুৎপাদক সম্পদের অনুপাত ছিল মাত্র ০.১ শতাংশ।

ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, অযোগ্যদের ধার দেওয়া এবং ধার দেবার পর যথাসময়ে টাকা ফেরত পাবার জন্য নিয়মিত তদারকির ব্যাপারে গাফিলতি করা, সাবেকি ব্যাঙ্কদের অনুৎপাদক সম্পদ বাড়ার পেছনে এই দু'টোই মূল কারণ। আর ঠিক এই দুটো ব্যাপারেই বন্ধন যোজন যোজন পথ এগিয়ে আছে। কেমন করে এই আশ্চর্যটা সম্ভব হল সেটা বোঝার জন্য বন্ধনের ধার দেবার পদ্ধতিটা খতিয়ে দেখা দরকার।

বন্ধন ধার দেয় শুধু মাত্র গরিব মহিলাদের। ধারের পরিমাণ এক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। লক্ষণীয় যে, কোনও বন্ধকি ছাড়াই এই ধার দেওয়া হয়। গরিব মহিলাদের কাছে বন্ধক রাখার জন্য আছেটাই বা কী ? বন্ধন ধার দেয় বেশ চড়া সুদে, তার ঋণের ওপর বার্ষিক সুদ ২২.৪ শতাংশ। এছাড়া উপায়ও নেই। সরকার অথবা অন্য কোনও জনহিতকারি সংস্থা থেকে এক পয়সাও ভর্তুকি পায় না বন্ধন। তাছাড়া যে টাকা বন্ধন ঋণ হিসেবে গরিব মহিলাদের দিয়ে থাকে তা বাজার থেকে চলতি সুদে ধার করতে হয়। তার ওপর আছে প্রশাসনিক খরচ এবং সবার ওপরে ঋণ-গ্রহীতাদের সদা-সতর্ক নজরে রাখার খরচ। সব মিলিয়ে ২২.৪ শতাংশ সুদের আয় থেকে ঋণপিছু সামান্যই লাভ হয়। কিন্তু যেহেতু মোট দেওয়া ঋণের পরিমাণ বিপুল, এই মুহূর্তে প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকা, তাই বন্ধনের মোট লাভের পরিমাণ খুব কম নয়।

পঁচিশ-তিরিশ জনের এক-একটি দল তৈরি করে নিয়ে দলের সদস্যদের ধার দেয় বন্ধন। বন্ধনের থেকে ধার নেওয়ার জন্য এই রকম কোনও একটি দলের সদস্য হওয়া আবশ্যিক। দলের সদস্যদের ধার দেওয়া হলেও, ধার কিন্তু যৌথভাবে দলকে দেওয়া হয় না। এক-একজন সদস্য প্রয়োজন মতো একেক অঙ্কের ঋণ পান, ঋণশোধের দায়িত্বও সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের। উল্লেখ করা যেতে পারে, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থারা আগে দলগুলিকে যৌথভাবে ধার দিত, অর্থাৎ ঋণশোধের জন্য যৌথভাবে দায়ী থাকত পুরো দলটা। সেই ধাঁচ থেকে বন্ধন বেরিয়ে এসেছে।

কেন ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাবার ব্যাপারে বন্ধন এতটাই সফল তার কয়েকটা ব্যাখ্যা বন্ধনের ঋণ দেবার পদ্ধতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রথমত, বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় দায়িত্বশীল। বন্ধন-এর ঋণগ্রহীতারা যেহেতু সকলেই মহিলা তাই তাঁদের ঋণ ফেরত দেবার প্রবণতাও বেশি। উপরন্তু বন্ধনের খাতকরা প্রায় সকলেই বিবাহিত মহিলা। অনেক ক্ষেত্রেই, স্ত্রীর বকলমে ধারটা আসলে নিচ্ছেন স্বামী। এর দু'টো সুবিধে। এক, স্বামীর আয় থেকে ধার শোধ দেওয়াটা সম্ভব হচ্ছে এবং দুই, যেহেতু টাকা ফেরত দেবার দায়িত্ব স্ত্রীর, যাঁর দায়িত্বশীলতা কিংবা লোকলজ্জা পুরুষটির তুলনায় বেশি, তাই মহিলাটিই স্বামীকে তাগাদা দিয়ে টাকাটা শোধ করাচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক সপ্তাহে দলের মিটিং হচ্ছে। বন্ধনের অফিসারেরাই সেসব মিটিং পরিচালনা করছেন। সদস্যরা সেই মিটিং-এ সকলের সামনে তাঁদের সাপ্তাহিক কিস্তি শোধ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ধার শোধের

ব্যাপারে তাঁরা পিছিয়ে নেই। দলের আর সবাই নিয়মিত ধার শোধ দেবার ফলে প্রতিটি সদস্যের ওপর আলাদা করে ধার শোধ দেবার একটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া কোনও সদস্য কয়েক সপ্তাহ মিটিং-এ না এলে বা ধারের কিস্তি শোধ করতে না পারলে বন্ধন-এর অফিসারেরা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারছেন। তাঁরা তাঁর বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন, নিয়মিত তাগাদা করছেন, যতক্ষণ তিনি টাকা বাকি রাখছেন ততক্ষণ তাঁর ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন।

এছাড়াও নিয়মিত ধারের টাকা ফেরত আসার কিছু বাড়তি কারণ আছে যা বন্ধনের ওপর আমাদের একটা সাম্প্রতিক সমীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি। আমরা দেখেছি, দলের সদস্যদের মধ্যে একটা সামজিক নেটওয়ার্ক রয়েছে যার ফলে তাঁরা যেমন আনন্দ-উৎসবের দিনে একে অপরের সঙ্গে থাকছেন, তেমনি বিপদে-আপদে একে-অপরকে সাহায্য করছেন। আমাদের উত্তরদাতাদের মধ্যে যাঁরা বলেছেন কোনও না কোনও সময়ে ঋণশোধ করতে তাঁদের অসুবিধে হয়েছে তাঁদের ২৩.৮ শতাংশ জানিয়েছেন দলের অন্য কোনও সদস্য তাঁদের টাকা দিয়ে ঋণশোধ করতে সাহায্য করেছেন। আবার ৩৯ শতাংশ ঋণগ্রহীতা বলেছেন, দলের কেউ বিপদে পড়ে টাকা ফেরত না দিতে পারলে দলের মেয়েরা তাঁকে সাহায্য করে থাকেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, ঋণগ্রহীতাদের সামাজিক নেটওয়ার্ক থেকে সদস্যদের মধ্যে একটা পারস্পরিক অলিখিত বীমা তৈরি হচ্ছে যার ফলে সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনও লাভবান হচ্ছে।

সামাজিক নেটওয়ার্ক-এর আর একটা সুবিধে আছে। এক দিকে যেমন দলের মেয়েরা দলের সুনাম বজায় রাখার জন্য নিজেদের সদস্যদের ওপর ঋণশোধের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করছেন, তেমনি আবার নিজের সামাজিক সুনাম বজায় রাখার জন্য প্রতিটি সদস্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন প্রত্যেক সপ্তাহে কিস্তির টাকা শোধ করে দিতে। আমাদের সমীক্ষায় ৪৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলছেন, কিস্তির টাকা শোধ না করলে দলের মেয়েরা ভয়ঙ্কর রকম রাগারাগি করবে। বন্ধন এবং দলের যৌথ চাপ এতটাই বেশি যে একজন উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে-সপ্তাহে তাঁর স্বামী মারা গেলেন সেই সপ্তাহেও তাঁকে কিস্তির টাকা শোধ করতে হয়েছে। লক্ষণীয় যে, এত চাপ সত্ত্বেও কিন্তু লক্ষ লক্ষ গরিব মহিলা বন্ধন-এর কাছ থেকে ধার নিচ্ছেন। নিশ্চয় সুবিধে পাচ্ছেন বলেই নিচ্ছেন।

তাছাড়া ছোট-ছোট সাপ্তাহিক কিস্তিতে টাকা শোধ দেবার পদ্ধতি একটা আর্থিক শৃঙ্খলাস্থাপনের কাজ করে। ছোট ছোট কিস্তিতে টাকা শোধ দেওয়া, একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা ফেরত দেবার চেয়ে, ঢের সহজ। কয়েকটা ক্ষেত্রে এমনও দেখেছি, ঋণগ্রহীতা বন্ধনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে পুরো টাকাটাই ব্যাঙ্কের ফিক্সট ডিপোজিটে রেখে দিচ্ছেন। ২২.৪ শতাংশ সুদে টাকা ধার নিয়ে নয়-সাড়ে নয় শতাংশে জমা রাখার পেছনে কারণটা কী জিজ্ঞেস করতে উত্তর পেলাম, বন্ধন-এর থেকে টাকা ধার নেওয়াটা আসলে সঞ্চয়ের একটা উপায় মাত্র। গরিব পরিবারের পক্ষে প্রতি সপ্তাহে দুশ-আড়াইশ টাকা খরচ-খরচা থেকে সরিয়ে রেখে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া শক্ত। টাকাটা ঠিক তালেগোলে খরচ হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধন-এর কাছ থেকে একবার টাকা ধার নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা রেখে দেওয়া মানে জোর করে একটা সঞ্চয় হয়ে যাওয়া। আর টাকা শোধ দেবার ব্যাপারে প্রবল চাপ তো থাকছেই। এটা একটা স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলা যেটা বন্ধন-এর মধ্যে দিয়ে কাজ করছে।

ঋণশোধের এই আশ্চর্য মডেল বন্ধন ব্যাঙ্ক কতটা বজায় রাখতে পারবে? এটা পরিষ্কার যে, ব্যাঙ্ক হয়ে যাবার পর শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ঋণে বন্ধন নিজেকে আটকে রাখতে পারবে না। কর্পোরেটদের বড় ঋণ দেবার কথা বন্ধন এখনই ভাবছে না, কিন্তু মাঝারি মাপের ব্যবসায়ে ঋণ তো দিতেই হবে। মাঝারি মাপের ঋণগ্রহীতাদের সাপ্তাহিক মিটিং-এ রাজি করানো শক্ত। তাই বন্ধন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রতি সপ্তাহের বদলে প্রতি মাসে মিটিং হবে। দল তৈরি করে তার সদস্যদের ব্যক্তিগত ঋণ দেওয়া হবে নাকি সাবেকি প্রথায় সরাসরি ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া হবে সেটা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে, বন্ধন এখন জনসাধারণের টাকা ফিক্সট ডিপোজিট ছাড়াও সেভিংস এবং কারেন্ট একাউন্টে জমা রাখতে পারবে, যে জমার ওপর গড় সুদের হার

অনেক কম। ফলে বন্ধন-এর টাকা তোলার খরচ অনেকটাই কমবে। অন্যান্য ব্যাঙ্কদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সুবিধে হবে। কিন্তু সব থেকে বড় কথা, ঋণ ফেরত পাবার ব্যাপারে বন্ধন যদি তার সদা-সতর্ক নজরদারিটা চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে যে শুধু তার নিজের উপকার হবে তাই নয়, এই লাগামছাড়া অনুৎপাদক সম্পদের ঋতুতে সমগ্র ব্যাঙ্কিং দুনিয়ার কাছেও একটা ভাল বার্তা পৌঁছবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বাধীনতা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে কেন্দ্রিয় অর্থ মন্ত্রকের বিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল। ব্যাঙ্কের কাজে সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছিলেন ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য, যে অভিযোগে গভর্নর উর্জিত পটেলেরও সায় ছিল। সে অভিযোগ যে সত্যি তার প্রমাণ, আর বি আই অ্যাক্টের সাত নম্বর ধারা প্রয়োগ করে অর্থ মন্ত্রক রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তার ঋণনীতি শিথিল করার নির্দেশ দিয়েছিল। বলা দরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চুরাশি বছরের ইতিহাসে এই প্রথম সাত নম্বর ধারার প্রয়োগ ঘটল। যেহেতু একমাত্র চরম কোনও সঙ্কটের অবস্থাতেই সাত নম্বর ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে, এবং যেহেতু সেরকম কোনও সঙ্কট সম্প্রতি দেখা যায়নি, তাই সরকারের এই পদক্ষেপকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বাধীনতায় অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু বলা যাচ্ছে না।

বিরোধের জেরে শেষ পর্যন্ত গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর দু'জনকেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছেড়ে চলে যেতে হল। নতুন গভর্নর পুরোপুরি সরকারের লোক, তাঁর নেতৃত্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখন পুরোদস্তুর সরকারের আজ্ঞাধীন।

মোটের ওপর চারটে বিষয় নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সরকারের বিরোধ লেগেছিল। প্রথমত, জাতীয় ব্যাঙ্কগুলোর পাহাড়-প্রমাণ জমে ওঠা অনাদায়ী ঋণের পারিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এগারোটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ককে বিশেষ নজরদারির আওতায় এনেছে। এই ব্যাঙ্কগুলোর কার্যকলাপ, বিশেষ করে নতুন ঋণ দেবার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা, অনেকটাই খর্ব করে দেওয়া হয়েছিল। সরকারের বক্তব্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরোপিত এই বিধিনিষেধের ফলে ব্যবসায়ীরা ধার পাচ্ছেন না, বিনিয়োগ মার খাচ্ছে, আর্থিক বৃদ্ধি কমে যাচ্ছে। তাই সরকার সাত নম্বর ধারা প্রয়োগ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তাদের ঋণনীতি শিথিল করার নির্দেশ দিয়েছে।

দ্বিতীয় বিরোধ সুদের হার নিয়ে। প্রত্যেক ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি কমিটি মূল সুদের হার ঠিক করে দেয়। সরকার চাইছে, সুদের হার কমানো হোক যাতে আরও বিনিয়োগ, আরও বৃদ্ধি হতে পারে। অপর পক্ষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কমানো দূরের কথা, সুদের হার বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের বক্তব্য, সুদের হার অযৌক্তিকভাবে কমালে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া বেড়ে যাবে, বাজারে নগদের যোগান বাড়বে, ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আরও আশঙ্কা, ঋণ সুলভ হলে খারাপ ঋণের পরিমাণও বাড়বে। বিশেষ করে ঋণের একটা বড় অংশ নির্মাণ-শিল্পে বিনিয়োগ করা হবে। আবার ব্যাঙ্ক থেকে সহজ শর্তে ধার নিয়ে লোকেও বাড়ি-ফ্ল্যাট বেশি করে কিনবেন। ফলে বাড়ি-জমি-ফ্ল্যাটের দামে এবং সামগ্রিকভাবে নির্মাণ-শিল্পে একটা বুদ্বুদ তৈরি হবে। সেই বুদ্বুদ থেকে সাময়িকভাবে ধারণা হতে পারে দেশের অর্থনীতিতে জোয়ার এসেছে। কিন্তু অতীতে নানা দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, নির্মাণ-শিল্পের বুদ্বুদ শেষ পর্যন্ত ফেটে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সৃষ্টি করে। পূর্ব এশিয়ার সঙ্কট কিংবা আরও সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবপ্রাইম ক্রাইসিস সব সঙ্কটের পেছনেই নির্মাণ-শিল্পের বুদ্বুদ একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল।

তৃতীয় বিরোধ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলোর লভাংশ বন্টন করা নিয়ে। সরকারের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ঘাটতি বেড়েই চলেছে। তার ওপর সামনে নির্বাচন, নির্বাচনের আগে জনমোহিনী প্রকল্পগুলো কার্যকর করতে গেলে অনেক টাকার দরকার পড়বে। তাই ব্যাঙ্কের লভাংশ থেকে আরও বেশি করে ডিভিডেন্ড দাবি করছে সরকার। মালিক হিসেবে সরকার সেটা চাইতেই পারে, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই দাবির বিরোধিতা করছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে, শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বেশি হারে লভাংশ বন্টন না করে ব্যাঙ্করা যদি সেই লভাংশ পুনর্বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে নিজেদের পুঁজি বাড়াতে পারে তাহলে তাদের

ভিত শক্ত হবে, সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থিক ব্যবস্থাটাও দৃঢ় হবে। অপর পক্ষে, নিজের আয়ের বদতি অংশও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারকে দিতে রাজি নয়। লভাংশ বন্টনের সিদ্ধান্ত নেয় সংশ্লিষ্ট বোর্ড। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোর্ডে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর জন্য সরকার নচিকেত মোরের মতো ব্যাঙ্কিং বিশেষজ্ঞকে ছাঁটাই করে নিজেদের পছন্দের লোক স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের স্বঘোষিত অর্থনীতিবিদ, বিমুদ্রাকরনের অন্যতম প্রবক্তা, গুরুমূর্তিকে বসিয়েছে।

চতুর্থ বিরোধ, নন ব্যাঙ্ক ফিনানশিয়াল কম্পানি, সংক্ষেপে এন বি এফ সি-দের ঋণমুক্তি নিয়ে। সম্প্রতি আই এল এফ এস সহ বেশ কয়েকটি এন বি এফ সি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ দিতে পারছে না। সরকারের ইচ্ছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদের সাহায্যে এগিয়ে আসুক। পক্ষান্তরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আরেক ডেপুটি গভর্নর এন এস বিশ্বনাথন সম্প্রতি বলেছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা করা, ঋণখেলাপী ঋণগ্রহীতাদের উদ্ধার করা নয়। বুঝতে কষ্ট হয় না, এই বিবৃতির মূল লক্ষ্য ঋণখেলাপী এন বি এফ সি-রা। উল্লেখ করা যেতে পারে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আই এল এফ এস-কে উদ্ধার করতে অস্বীকার করায় সরকার সেই কাজটা এল আই সি-কে দিয়ে করিয়েছে, বা বলা ভাল, তাদের করতে বাধ্য করেছে।

সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের বিরোধ নতুন কিছু নয়। নানা দেশে নানা সময়ে এই রকম বিরোধ দেখা গেছে। অতীতে আমাদের দেশেও দেখা গিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সরকারের মতানৈক্য, যদিও এই আকারে আগে কখনও দেখা যায়নি। বিরোধের ওপরের চেহারাটা যাই হোক, আসল কারণটা হল কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ক এবং সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটা নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ কোথাও চার বছর, কোথাও পাঁচ। এই সীমিত সময়ের মধ্যেই তাকে কিছু একটা করে দেখাতে হয়, নইলে তার পক্ষে আবার জিতে ফিরে আসাটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীটা সর্বতোভাবে স্বল্পমেয়াদি। পক্ষান্তরে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতো কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কগুলোর মেয়াদ আজীবনের। ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীটাও মূলত দীর্ঘমেয়াদি। এখন, দেশের স্বল্পমেয়াদী স্বার্থের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের একটা সংঘাত থাকতেই পারে, থাকাটাই স্বাভাবিক। সুদের হার কমানো নিয়ে সরকারের সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরোধ, যার কথা একটু আগেই বলেছি, এই সংঘাতের একটা উদাহরণ। এরকম উদাহরণ আরও আছে।

উইলিয়াম নর্ডহাউস, কিছুদিন আগে যিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, ১৯৭৫ সালের একটি গবেষণাপত্রে যুক্তি দিয়েছিলেন, নির্বাচনের ঠিক আগে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের মন পাবার জন্য কল্যাণমূলক খাতে খরচ বাড়িয়ে দেয়, ফলে সাময়িকভাবে দেশে অর্থনৈতিক লেনদেন বাড়ে, নতুন কর্মসংস্থান হয়। তারপর নির্বাচন হয়ে গেলে যে দল ক্ষমতায় আসে তারা দেখে পূর্ববর্তী সরকারের অতিরিক্ত খরচের জন্য মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ছে, অর্থনীতিটা বেসামাল হয়ে পড়ছে। তখন সরকারি খরচ আবার সংকুচিত হয়, ফলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান আবার কমে আসে। অর্থনীতির এই ওঠাপড়া, যার পোষাকি নাম বিজনেস সাইকল, নর্ডহাউসের মতে মূলত রাজনৈতিক কারণেই ঘটে। নর্ডহাউসের এই তত্ত্বকে অবশ্য পরবর্তীকালে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন। সমালোচকরা প্রশ্ন তুলেছেন, মানুষ কি এতই বোকা আর স্মৃতিশক্তিহীন যে নির্বাচন পূর্ববর্তী বাড়তি সরকারি খরচটা সাময়িক এটা বুঝতে পারবে না? ভোটাররা দেখবে, বারবার নির্বাচনের ঠিক আগে সরকারি খয়রাতি বেড়ে যাচ্ছে আর নির্বাচনের ঠিক পরেই কমে যাচ্ছে। এবং এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি লাভ কিছু হচ্ছে না, শুধু সাময়িকভাবে একটা অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। ফলে শুধুমাত্র নির্বাচন পূর্ববর্তী সরকারি খয়রাতি দেখে ভোটাররা ক্ষমতাসীন সরকারকে ভোট দেবে না। আর যদি তারা তা না দেয় তাহলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোও নির্বাচনের আগে বাড়তি খরচের চেষ্টা করবে না। অর্থাৎ নর্ডহাউসের সমালোচকরা বলবেন, যদি ধরে নেওয়া হয় ভোটাররা যুক্তিবাদী, স্মৃতিধর এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ, তাহলে নির্বাচনের আগে সাময়িকভাবে সরকারি খরচ বেড়ে যাবার কোনও কারণ নেই।

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশের সাধারণ ভোটাররা অতটা তলিয়ে ভাবেন না, তাঁদের স্মৃতিশক্তিও তেমন প্রখর নয়। কাজেই ভোটের আগে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো খরচ বাড়িয়ে ভোটারদের সমর্থন পাবার চেষ্টা করে এবং এর ফলে অর্থনীতিতে একটা ওঠাপড়া, একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। মুদ্রাস্ফীতির হারও বেড়ে যাবার প্রবণতা দেখা যায়। সেইজন্যেই এখানে কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের একটা জরুরি ভূমিকা আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল কাজ সুদের হারের মাধ্যমে নগদের যোগান বেঁধে দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং ব্যাঙ্কগুলোর ঋণনীতির ওপর প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ করে ভারতীয় আর্থিক বাজারকে স্থিতিশীল রাখা। সরকার যদি সেই কাজে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে দীর্ঘমেয়াদের বিচারে সাধারণ মানুষকেই দুর্ভোগ পোয়াতে হবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক, আলবের্তো অ্যালেসিনা এবং লরেন্স সামার্স, কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের স্বাধীনতার সঙ্গে দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতির একটা আশ্চর্য সম্পর্ক লক্ষ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের স্বাধীনতা বাড়লে মূল্যবৃদ্ধির হার কম হয়, কিন্তু সেই স্বাধীনতা বাড়া-কমার সঙ্গে দেশের দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন বা কর্মসংস্থানের কোনও সম্পর্কই নেই। অর্থাৎ যেসব দেশের কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কগুলো তুলনামূলকভাবে স্বাধীন, সেসব দেশে মূল্যবৃদ্ধির হার কম। কিন্তু এই স্বাধীনতার কোনও কুপ্রভাব দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন বা কর্মসংস্থানের ওপর পড়েনি। তাহলে কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ককে স্বাধীনতা দিতে অসুবিধে কোথায়?

অসুবিধে একটাই। যাঁরা এখন ক্ষমতায় আছেন তাঁরা দেশের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি মঙ্গল নিয়ে ভাবছেন না। তাঁদের চোখ একমাত্র পরবর্তী নির্বাচনের দিকে।

(২)

বিমল জালান কমিটির সুপারিশ মেনে ভারত সরকারকে ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা হস্তান্তর করার যে সিদ্ধান্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া সম্প্রতি গ্রহণ করেছে তাই নিয়ে নানারকম মত বাজারে শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছেন, সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাত মুচড়ে এই টাকা আদায় করছে, যা অত্যন্ত অন্যায্য। আবার কেউ বলছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মালিক যেহেতু ভারত সরকার, তাই তার সম্পদের ওপর সরকারের পূর্ণ অধিকার আছে। এসব নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কিছু বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তাই বিষয়টাকে ভাল করে বোঝা দরকার। বিশেষ করে এই কারণে যে, টাকা হস্তান্তরের ব্যাপারটা আজ না হোক তো কাল সাধারণ ভারতবাসীর অর্থনৈতিক ভাগ্যকেও প্রভাবিত করবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সরকারের ঘরে টাকা হস্তান্তর মানে, বলাই বাহুল্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক শক্তি ও স্বাধীনতা কমে যাওয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে মূলত দু'টো প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব। এক, ঠিক কোন আইনের বলে, কীভাবে এবং কোন যুক্তিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারকে এতগুলো টাকা হস্তান্তর করছে? দুই, টাকা হস্তান্তরের ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক কাজ করার ক্ষমতা কতটা ব্যাহত হচ্ছে? বিশেষ করে আমাদের চিন্তা, টাকা হস্তান্তরের পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় অর্থনীতির এই দুর্দিনে পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করতে পারবে তো?

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৪-এর ৪৭ নম্বর ধারা বলছে, কোনও আর্থিক বর্ষে সব খরচ-খরচা এবং ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাব্য ঝুঁকির জন্য অর্থসংস্থান করার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ের যে অংশটা উদ্বৃত্ত থাকবে সেটা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রিয় সরকারকে হস্তান্তর করবে। অর্থাৎ কেন্দ্রিয় সরকারকে উদ্বৃত্ত আয় হস্তান্তর করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে নতুন কিছু নয়, নিয়ম বহির্ভূতও নয়। নতুন ব্যাপারটা হল, এই বিপুল পরিমাণে উদ্বৃত্ত আয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আগে কখনও সরকারকে হস্তান্তর করেনি। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ এই দশ বছরে বার্ষিক হস্তান্তরের গড় পরিমাণ ৩৭,২৯০ কোটি টাকা। এর মধ্যে আবার ২০০৯ থেকে ২০১৩, এই পাঁচ বছরে গড় হস্তান্তর ছিল বছরে ২১,৫৫৯ কোটি টাকা। কিন্তু তার পরবর্তী পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ২০১৪ থেকে ২০১৮ অব্দি, বার্ষিক গড় হস্তান্তর বেড়ে হয়েছে ৫৩,০২২ কোটি টাকা। স্পষ্টতই, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে হস্তান্তর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, কিন্তু ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকার মতো এত বড় আকারের বার্ষিক হস্তান্তর আগে কখনও ঘটেনি। এই বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয়

কোথা থেকে আসছে? তাহলে কি এবছর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয় অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে গেছে? নাকি তাদের বাৎসরিক খরচ কিংবা ভবিষ্যৎ ঝুঁকির জন্য অর্থসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা হঠাৎ খুব কমে গেছে?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ের উৎস মূলত তিনটি। এক, তাদের ভাণ্ডারে গচ্ছিত ভারত সরকারের ঋণপত্রের সুদ। এই ঋণপত্র দরকার মতো বেচাকেনা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশে নগদের যোগান নিয়ন্ত্রণে রাখে, যে বেচাকেনার পোষাকি নাম ওপেন মার্কেট অপরেশন। দুই, ভারত সরকারের জন্য বাজার থেকে ঋণ তুলে দেবার ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ। তিন, তাদের ভাণ্ডারে গচ্ছিত বিদেশি ঋণপত্রের সুদ। বর্তমান বছরে এই তিনটি উৎসের কোনওটিতেই সাংঘাতিক রকমের আয় বাড়েনি। অপরপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খরচ-খরচাও যে রাতারাতি ভীষণ কমে গেছে এমন বলা যাবে না। তাহলে বাকি রইল ভবিষ্যৎ ঝুঁকির জন্য অর্থসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঝুঁকি নানারকম। কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা একেবারে তলানিতে ঠেকলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককেই সেই অবস্থার সামাল দিতে হয়। ব্যাঙ্কদের কাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই শেষ ভরসা, লেন্ডার অফ লাস্ট রিসর্ট। এই ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে কিছু অর্থসংস্থান করে রাখা জরুরি। আবার দেশের শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ হঠাৎ বেড়ে গেলে বিনিয়োগকারিরা দেশি শেয়ার কেনার জন্য ডলার দিয়ে টাকা কেনে। ফলে দেশের মধ্যে টাকার যোগান বেড়ে গিয়ে মুদ্রাস্ফীতির উপক্রম হয়। সেই মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাতে গিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তখন নিজের ভাণ্ডার থেকে সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে বাজার থেকে উদ্বৃত্ত টাকা তুলে নিতে হয়, অর্থনীতির পরিভাষায় যার নাম স্টেরিলাইজেশন। কিন্তু এর ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে সুদ-উপার্জনকারি ঋণপত্রের পরিমাণ কমে গিয়ে সুদহীন টাকার পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ও কমে যায়। এটা আর এক ধরনের ঝুঁকি যার জন্যেও অর্থসংস্থান করে রাখা দরকার। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে নিয়মিত বিদেশি মুদ্রা বেচাকেনা করে টাকার দামকে স্থিতিশীল রাখাটাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটা বড় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে বিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণ সোনা-রুপো এবং বিদেশি মুদ্রা থাকা প্রয়োজন।

এইসব সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটা রিজার্ভ ফান্ড বা সংরক্ষিত তহবিল আছে। এর একটা বড় অংশ সোনা-রুপো ও বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার এবং আর একটা বড় অংশ তাদের কন্টিনজেনসি ফান্ড বা আপৎকালীন তহবিল। ২০০৯ থেকে ২০১৮ এই দশ বছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গড়ে তার মোট সম্পদের ৮.৪৯ শতাংশ তার আপতকালীন তহবিলে রেখেছে। একই সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট সম্পদের গড়ে ২৫.৫৮ শতাংশ রাখা হয়েছিল তার সংরক্ষিত তহবিলে।

বিমল জালান কমিটি বলছে, ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য অত বেশি সম্পদ সংরক্ষিত তহবিল কিংবা আপতকালীন তহবিলে রাখার দরকার নেই। এই সম্পদের একটা অংশ অনায়াসে সরকারকে হস্তান্তর করা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন সরকার এই পড়ে থাকা সম্পদের একটা দক্ষ ব্যবহার করতে পারবে, তেমনি অন্যদিকে হস্তান্তরের পরেও ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুত থাকবে। জালান কমিটির মতে, আপৎকালীন তহবিলে মোট সম্পদের ৫.৫ শতাংশ থেকে ৬.৫ শতাংশ থাকাটাই যথেষ্ট। আর সংরক্ষিত তহবিলে মোট সম্পদের ২০ শতাংশ থেকে ২৪.৫ শতাংশ রাখলেই চলবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোর্ড শুধু যে জালান কমিটির সুপারিশ মেনে নিয়েছে তাই নয়, সরকারকে সুবিধে দেবার জন্য সেই সুপারিশ থেকে যতটা নিংড়ে নেওয়া যায় ততটুকু অব্দি নিয়েছে। ফলে আপৎকালীন তহবিলে সম্পদের ৫.৫ শতাংশ রাখা ধার্য হয়েছে, জালান কমিটির সুপারিশ মানলে যার থেকে নিচে আর নামা সম্ভব নয়। আবার, এই মুহূর্তে যেহেতু সংরক্ষিত তহবিলে মোট সম্পদের ২৩.৩ শতাংশ রয়েছে, তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোর্ড ঠিক করেছে এবছর আর সংরক্ষিত তহবিলে নতুন করে অর্থ রাখা হবে না। আপৎকালীন তহবিলে অর্থসংস্থান কমিয়ে দেবার ফলে এবং এবছরের আয়ের কোনও অংশ সংরক্ষিত তহবিলে না যাবার ফলে ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে যা সরকারকে হস্তান্তরিত করা হচ্ছে। আপৎকালীন তহবিলে

অর্থসংস্থান কমিয়ে দিয়ে ৫২,৬৩৭ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। আর সংরক্ষিত তহবিলে অর্থ না যাবার ফলে এই বছরের পুরো নীট আয়টাই উদ্বৃত্ত হয়েছে যার পরিমাণ ১,২৩,৪১৪ কোটি টাকা। দুইএর যোগফল হস্তান্তরিত ১,৭৬,০৫১ কোটি টাকা।

ভারতীয় অর্থনীতি এখন খুব একটা ভাল সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে না। বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, বেড়েছে বেকারত্ব, বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানার সংখ্যা। জিনিসপত্রের চাহিদা নেই তাই বিনিয়োগ হচ্ছে না, আবার বিনিয়োগ হচ্ছে না বলে কর্মসংস্থান হচ্ছে না এবং সেই কারণে জিনিসপত্রের চাহিদা নেই। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ক্রমশ আমরা মন্দার দুষ্টচক্রে নিমজ্জিত হচ্ছি। এই অবস্থায় দেশের আর্থিক ক্ষেত্রটিও খুব সুরক্ষিত নেই। কাজেই এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সক্রিয় ভূমিকা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। আপৎকালীন তহবিল কমে গেলে কী করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে? আসলে, সম্পদের অনুপাত হিসেবে স্থির না করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে আপৎকালীন তহবিল ধার্য করা উচিত। সেটা দেখলে আপৎকালীন তহবিল কমানোর বদলে বাড়ানো উচিত ছিল।

মোট সংরক্ষিত তহবিলের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। মোট সংরক্ষিত তহবিল মোট সম্পদের অনুপাত হিসেবে স্থিতিশীল রয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু এর মূল কারণ কিছুদিন ধরে টাকার নিরিখে ক্রমাগত ডলারের দাম বাড়ছে, সোনার দাম বাড়ছে, ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংরক্ষিত তহবিলের অন্তর্গত যে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারটি আছে, সেটি টাকার নিরিখে ফুলে ফেঁপে উঠছে। কিন্তু তাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আন্তর্জাতিক বাজারকে প্রভাবিত করার ক্ষমতার কোনও উন্নতি ঘটছে না। বস্তুত, আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার দামকে ধরে রাখার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে আরও ডলারের প্রয়োজন ছিল। আয়ের একটা অংশ খরচ করে সেই প্রয়োজন মেটানো যেত। সেটা যখন হল না, তখন, আশঙ্কা হয়, ভবিষ্যতে টাকার দাম আরও পড়ে যাবে। আর টাকার দাম আরও পড়ে গেলে তেলের দাম বাড়বে, বাড়বে সাধারণ মানুষের দুর্দশা।

যদি ধরেও নিই, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকাটা সরকার ভাল কাজেই খরচ করবে, তবু একটা দ্বিধা থেকে যায়। একটা নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ যেহেতু পাঁচ বছরের তাই স্বল্পমেয়াদে কিছু করে দেখানোর প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসা তাদের পক্ষে শক্ত। অপরপক্ষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্যটা দীর্ঘমেয়াদি। সাধারণের হিতার্থেই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রাকে উপেক্ষা করা যায় না। সেই কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আরও আর্থিক স্বাধীনতা প্রয়োজন ছিল।

এক অনন্য অর্থনীতিবিদ

পঁচানব্বই বছর বয়সে প্রয়াত হলেন অর্থনীতিবিদ কেনেথ জোসেফ অ্যারো। চিন্তানায়ক, পথিকৃৎ, নোবেলজয়ী কোনও বিশেষণই তাঁর উচ্চতাকে ধরার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে কাঠামোর উপর অর্থনীতির মূল তত্ত্বগুলো আজ দাঁড়িয়ে রয়েছে তার অনেকটাই তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন। বস্তুত, আধুনিক অর্থনীতি চিন্তায় তাঁর মতো প্রভাব আর কোনও অর্থনীতিবিদের নেই, একথা অনায়াসে বলা যেতে পারে।

১৯২১ সালের ২৩শে অগস্ট নিউ ইয়র্ক শহরের একটি ইহুদি পরিবারে অ্যারোর জন্ম। নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজ থেকে ১৯৪০ সালে স্নাতক হলেন গণিত এবং সমাজ বিজ্ঞান এই দুটি মুখ্য বিষয় নিয়ে। সে যুগের আন্দাজে যে খানিকটা অদ্ভুত এবং পরস্পরবিরোধী ছিল তাঁর বিষয় নির্বাচন, সেকথা অ্যারো নিজেই স্বীকার করেছেন। তখনও সমাজ বিজ্ঞানে তেমন করে গণিতের প্রবেশ ঘটেনি। কিন্তু সে সম্ভাবনা, অন্তত অর্থনীতির ক্ষেত্রে, যে বিপুল এ-ধারণা নিশ্চয় তরুণ কেনেথ-এর মনে উঁকি দিয়েছিল, নাহলে অমন বিষম দু'টি বিষয় তিনি নির্বাচন করবেন কেন? এর কুড়ি বছরের মধ্যে কেনেথ অ্যারো এবং তাঁর সহযোগী ও সতীর্থরা তাত্ত্বিক অর্থনীতির চেহারাটা আমূল বদলে দিলেন। গণিত যেমন করে কয়েকটা স্বতঃসিদ্ধের উপর দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে বৃহত্তর সত্যের ইমারত গড়ে তোলে, সেই পদ্ধতি ব্যবহার করে অ্যারো ও তাঁর সহযোগীরা দেখালেন, মানুষের ব্যবহারিক কয়েকটা দিককে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়ে সর্বজনীনভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিতভাবে আসব।

আপতত গত শতকের চল্লিশ দশকে আবার ফিরে আসি। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মে অ্যারো নিউ ইয়র্ক শহরের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম.এ. সম্পূর্ণ করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। তার আঁচ থেকে কেনেথ অ্যারোও মুক্তি পেলেন না। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ এই চার বছর তাঁকে মার্কিন সেনাবাহিনীতে কাজ করতে হল, তাঁর জায়গা হল বায়ুসেনাদের দলে। তবে বিমান উড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তাঁকে কখনও লড়াই করতে হয়নি। তাঁর মেধা এবং শিক্ষার মান দেখে কর্তৃপক্ষ তাঁকে আবহাওয়া অফিসার বানিয়ে দিলেন, যেখানে কিছু গবেষণার সুযোগ ছিল। এই পদে থাকার সময় কেনেথ অ্যারো তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, বিষয়, 'উড়ান পরিকল্পনার কাজে হাওয়ার দক্ষ ব্যবহার'। মনে রাখতে হবে, এই গবেষণাপত্র প্রকাশের সময় কেনেথ অ্যারোর প্রশিক্ষণ ছিল মূলত গণিতে। তাই আন্দাজ করা যায় তাঁর প্রথম গবেষণাপত্রটি ফলিত গণিতেই ছিল।

যুদ্ধ শেষ হবার পর পুরোদমে গবেষণা। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ-সংখ্যাতত্ত্ববিদ হ্যারল্ড হোটেলিং তাঁকে অর্থনীতির দিকে আকর্ষণ করলেন, কলম্বিয়াতে চলতে লাগল তাঁর গবেষণা, আবার পাশাপাশি অ্যারো যুক্ত হলেন কাউলস কমিশনে যার কাজকর্ম তখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলত। সেই সময় কাউলস কমিশনের দায়িত্বে ছিলেন প্রথমে জ্যাকব মারশাক ও পরবর্তী পর্যায়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জলিং কুপমানস। কুপমানস-এর তত্ত্বাবধানে এখানে কিছু অসাধারণ মেধাসম্পন্ন গণিত-মনস্ক তরুণ অর্থনীতিবিদ একত্র হয়েছিলেন, এঁদের সংস্পর্শে এসে গাণিতিক অর্থনীতি নিয়ে অ্যারোর উৎসাহ অনেক বেড়ে গেল। এই কাউলস কমিশনেই ফ্রান্স থেকে এসে যোগ দিলেন গণিতজ্ঞ অর্থনীতিবিদ জেরার্ড ডেব্রু, তিনিও পরে নোবেল পেয়েছিলেন। অর্থনীতির সর্বজনীন ভারসাম্য নিয়ে অ্যারোর সঙ্গে ডেব্রুর যৌথ গবেষণা, যা ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, মূলস্রোত অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোটা অনেকটা তৈরি করে দেয়।

কাউলস কমিশনে থাকতে থাকতেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকের চাকরি পেলেন অ্যারো। সেটা ১৯৪৮-৪৯। পরের বছর থেকে টানা ১৯৬৮ পর্যন্ত স্ট্যানফোর্ডে। পরে হারভার্ডে। আবার স্ট্যানফোর্ডে। ১৯৫১ সালে অ্যারোর 'সোশাল চয়েস অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুস' নামক কৃশতনু পুস্তিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেল। এই গবেষণার জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রি পান, কিন্তু ততদিনে তিনি যথেষ্ট বিখ্যাত। তাঁর পি এইচ ডি নিয়ে একটা গল্প চালু আছে। তাঁর গবেষণা এতটাই মৌলিক এবং সে-যুগের আন্দাজে এতটাই গাণিতিক ছিল যে পি এইচ ডি কমিটি সেই গবেষণার মূল্যায়নে নিজেদের অপারগ মনে করে কলম্বিয়ার অন্য এক গাণিতজ্ঞ-অর্থনীতিবিদ টেড অ্যান্ডারসনকে সেটা পড়তে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এই গবেষণা কি কলম্বিয়ার ডক্টরেট ডিগ্রি পাবার পক্ষে যথেষ্ট ভালো? উত্তর এসেছিল, এটা ভালোর থেকে ঢের ঢের বেশি।

১৯৭২ সালে নোবেল পেয়েছিলেন কেনেথ অ্যারো। একা পাননি, ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ স্যার জন হিকস-এর সঙ্গে যৌথভাবে পেয়েছিলেন। অনেকেই মনে করেন অ্যারোকে আরও কয়েকবার নোবেল দেওয়া যেত। সেটা ঘটেনি। তবে এটুকু অন্তত বলা যায় যে এই সেদিন অব্দি অ্যারোর মতো এত কম বয়সে কেউ অর্থনীতিতে নোবেল পাননি। অ্যারো এবং হিকস-কে নোবেল দেওয়া হয়েছিল সর্বজনীন অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিয়ে তাঁদের তাত্ত্বিক অবদানের জন্য। এছাড়া অন্তত আরও তিন-চারটি বিষয় আছে যেখানে কেনেথ অ্যারোর অবদান নোবেল পুরস্কারের দাবি রাখতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে অ্যারোর অবদানগুলো একটু বিশদভাবে বললে অর্থনীতিতে তাঁর সার্বিক অবদানের কিছুটা হদিশ পাওয়া যাবে।

আগেই বলেছি, অ্যারোর ডক্টরাল প্রবন্ধটি অর্থনীতি চিন্তার একটি বিশেষ দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। এই একটি কাজ জন্ম দিয়েছিল নতুন একটি বিষয়ের যার নাম সোশাল চয়েস বা সামাজিক চয়ন। গবেষণার মূল প্রশ্নটি বোঝার জন্য ধরা যাক একটি দেশ বা সমাজে নানা ধরনের মানুষ আছে এবং রয়েছে নানা ধরনের বিকল্প সামাজিক অবস্থা। বিকল্প অবস্থাগুলিকে ১, ২, ৩ ইত্যাদি নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা যাক এবং ধরা যাক প্রত্যেকটি মানুষ তাদের ব্যক্তিগত পছন্দের ক্রম অনুযায়ী সামাজিক অবস্থাগুলিকে সাজাতে পারে। কারও কাছে ১ নম্বর সব থেকে পছন্দের অবস্থা, তারপর যথাক্রমে ৩ এবং ২। আবার কারও কাছে ৩ নম্বর সব থেকে পছন্দের, তারপর ২ এবং সবশেষে ১। প্রশ্ন হল, আমরা ব্যক্তিগত পছন্দগুলি থেকে সার্বিক কোনও সামাজিক পছন্দে পৌঁছতে পারি কিনা, যে পছন্দ অনুযায়ী সামাজিক অবস্থাগুলি সমাজের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ক্রমানুসারে সাজানো যাবে। এই সামাজিক চয়নকে অবশ্য চারটি ন্যূনতম শর্ত পালন করতে হবে যার মধ্যে প্রথম শর্ত হল, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা চলবে না, তা যে কোনও কিছু হতে পারে। দ্বিতীয় শর্ত হল, এই চয়নের মধ্যে কোনও একনায়কত্বের ভাব থাকবে না, অর্থাৎ সেই চয়ন অবস্থা-নির্বিশেষে শুধুমাত্র বিশেষ কোনও ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ দ্বারা চালিত হবে না। তৃতীয় শর্ত, একটি বিকল্পের তুলনায় থেকে অন্য একটি বিকল্পকে যদি প্রত্যেকটি ব্যক্তি পছন্দ করেন তাহলে সামাজিক চয়নেও সেই পছন্দ প্রতিফলিত হতে হবে। শেষ শর্তটি খানিকটা টেকনিকাল এবং বিতর্কমূলক, একে বলা হয় 'ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইরেলেভেন্ট অল্টারনেটিভস'। ধরা যাক সমাজের সামনে দু'টি বিকল্প রয়েছে এবং সামাজিক চয়ন অনুযায়ী ১ নম্বর ২ নম্বরের থেকে ভাল। এবার বিকল্পের সংখ্যা যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি সমাজের সামনে একটা ৩ নম্বর বিকল্পও থাকে, শর্ত বলবে, সমাজ এই পরিবর্তিত অবস্থাতেও ১ নম্বরকে ২ নম্বরের থেকে পছন্দ করবে।

অ্যারো প্রমাণ করলেন, অন্য তিনটি শর্ত মেনে চলতে গেলে, সামাজিক চয়নের নিয়মটিতে একনায়কত্ব আসতে বাধ্য। অর্থাৎ চারটি শর্ত মেনে ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ থেকে সামাজিক পছন্দ-অপছন্দে পৌঁছনো অসম্ভব। এটাই অ্যারোর বিখ্যাত অসম্ভাবনা তত্ত্ব। অ্যারোর শেষ শর্তটি, আগেই বলেছি, কিছুটা বিতর্কমূলক। নানা সামাজিক প্রেক্ষিতে এর অন্যথা দেখা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, দুটি রাজনৈতিক দল ভোটে দাঁড়িয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম দলকে ভোট দিল, ফলে প্রথম দল জিতে গেল। অর্থাৎ দু'নম্বরের

তুলনায় একনম্বরকে সমাজ পছন্দ করল। কিন্তু তৃতীয় একটি দল ভোটে দাঁড়িয়ে প্রথম দু'টি দলের ভোট কেটে নিলে এমন একটা পরিস্থিতি হতেই পারত যেখানে দু'নম্বর দল একনম্বরের থেকে বেশি ভোট পেয়েছে। এখানে অ্যারোর শর্তটি খাটছে না।

সে যাই হোক, তৎকালীন রাজনৈতিক মতাদর্শগত টানাপোড়েনের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যারোর উপপাদ্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটা সেই সময় যখন ঠান্ডা যুদ্ধ পুরোদমে চলছে। কেউ কেউ যেমন মনে করছেন গণতন্ত্রের বিকল্প নেই কারণ এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিমানুষের চয়নের স্বাধীনতা বজায় থাকে, তেমনি আবার কেউ কেউ ভাবছেন সমাজতন্ত্রই প্রকৃত পথ। অ্যারোর তত্ত্ব দেখাল, সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক একটা ব্যবস্থাতেও কিছু কিছু সামাজিক চয়ন একনায়কতান্ত্রিক হয়ে যেতে পারে। উগ্র দক্ষিণপন্থীদের কাছে এটা একটা ইন্টেলেকচুয়াল ধাক্কা।

উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, অ্যারোর অসম্ভাবনা তত্ত্ব যে নতুন বিষয়ের জন্ম দিল তার পূর্ণ সম্প্রসার ও বিকাশ ঘটে পরবর্তীকালে অমর্ত্য সেন এবং তাঁর ছাত্রদের গবেষণায়। ১৯৭০ সালের একটি গবেষণা পত্রে অমর্ত্য সেন অ্যারোর বিতর্কিত শর্তটির বদলে সামাজিক চয়নের ওপর অন্য একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন সামাজিক চয়ন উদারপন্থী হবে, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের এমন কিছু ব্যক্তিগত পছন্দ থাকবে যার উপর সমাজ হস্তক্ষেপ করবে না। যেমন, আমি চিৎ হয়ে ঘুমোব না উপুড় হয়ে, কিংবা আমার ঘরের দেয়ালের রঙ সাদা হবে নাকি গোলাপি, এসব ব্যাপারে সমাজ আমার পছন্দটাকেই মেনে নেবে, এটাই শর্ত। অমর্ত্য সেন দেখিয়েছিলেন এই সামান্য শর্তটি আরোপ করলেও অ্যারোর অসম্ভাবনা উপপাদ্যটি ফিরে আসে। অ্যারোর প্রথম তিনটি শর্ত এবং অমর্ত্য সেনের উদারপন্থী শর্ত মেনে কোনও সামাজিক চয়নের নিয়মে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

সামাজিক চয়নের ক্ষেত্রে অসম্ভাবনা তত্ত্ব যাই বলুক না কেন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুক্ত প্রতিযোগিতার প্রতি কেনেথ অ্যারোর আস্থা অটুট ছিল। পূর্ণ প্রতিযোগিতা ব্যবস্থায় অর্থনীতির 'জেনেরাল ইকুইলিব্রিয়ম' বা সর্বজনীন ভারসাম্য নিয়ে তাঁর কাজ এই বিশ্বাসের সাক্ষী। বস্তুত, এই কাজের জন্যই হিকস-এর সঙ্গে ১৯৭২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। সর্বজনীন ভারসাম্য তত্ত্বে অ্যারোর অবদানকে দু'টো ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, জেরার্ড ডেব্রুর সঙ্গে যৌথভাবে তিনি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে সর্বজনীন ভারসাম্যের তত্ত্বগত অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি দেখিয়েছিলেন, পূর্ণ প্রতিযোগিতার এমন দুটি দক্ষতাগত দিক আছে যা এই ব্যবস্থাকে অন্যান্য ব্যবস্থার থেকে এগিয়ে রাখে। অ্যারোর দ্বিতীয় কাজটি 'ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ফান্ডামেন্টাল থিওরেমস অফ ওয়েলফেয়ার ইকনমিক্স' বা কল্যাণমূলক অর্থশাস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় মৌলিক উপপাদ্য নামে পরিচিত। কাজগুলি খানিকটা বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা জানি, একটা আধুনিক অর্থনীতিতে অসংখ্য পণ্য আছে, আছে সরাসরি ভোগ করা যায় এমন পণ্য, আছে কাঁচামাল, শ্রম, পুঁজি। প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা বাজার রয়েছে। বাজার নির্ধারিত দামের বিনিময়ে সব বাজারেই কেনাবেচা হয় আর বাজারে ভারসাম্য তখনই আসে যখন চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে কোনও ফারাক থাকে না। সমস্যা হল, একটা বাজারের চাহিদা ও যোগান অন্যান্য বাজারের দামের ওপরেও নির্ভরশীল। সর্বজনীন ভারসাম্য তখনই আসবে যখন যুগপৎ সমস্ত বাজারে চাহিদা ও যোগান সমান হবে। এর জন্য প্রত্যেকটি বাজারে এক-একটা বিশেষ দাম উপলব্ধ হওয়া দরকার। এই দাম বা দামের সমষ্টিকে বলা হয় ভারসাম্যমুলক মূল্যের সমষ্টি। প্রশ্ন হল, তেমন কোনও মূল্য-সমষ্টির কি অস্তিত্ব আছে? সমস্যাটা গাণিতিক। ফরাসী অর্থনীতিবিদ লিও ওয়ালরাস ১৮৭০-এর দশকে প্রথম সর্বজনীন ভারসাম্যের কথা ভেবেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন প্রত্যেকটি বাজারে চাহিদা-যোগানের সাম্য থেকে পাওয়া যাবে এক-একটি সমীকরণ। এই সমীকরণগুলি যুগপত সমাধান করলেই ভারসাম্যমূলক মূল্যগুলি পাওয়া যাবে। সমীকরণের সংখ্যা যেহেতু বাজারের সংখ্যার সমান এবং নির্ধারণ করতে হবে এমন মূল্যের সংখ্যাও যেহেতু

একই (প্রত্যেকটি বাজারের জন্য একটি করে মূল্য), অর্থাৎ সমীকরণের সংখ্যা এবং নির্ধারণযোগ্য দামের সংখ্যা যেহেতু সমান, তাই সর্বজনীন ভারসাম্যের সমাধান করতে অসুবিধে নেই।

ধারণাটা ঠিক নয়। সমীকরণ এবং নির্ধারণযোগ্য ভেরিয়েবল-এর সংখ্যা সমান হলেই যে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান থাকবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বিশেষ করে এই কারণে যে, নির্ধারিত দাম একটি কাল্পনিক সংখ্যা হলে বা এমনকি ঋণাত্মক হলেও তার কোনও অর্থনৈতিক মানে হয় না। এই সমস্যা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা অনেক দিন ধরে ভেবেছিলেন, শেষে পঞ্চাশের দশকে এসে অ্যারো-ডেব্রু এই সমস্যার সমাধান করেন। এর জন্য তাঁদের গণিতের কিছু গভীর তত্ত্ব ব্যবহার করতে হয়েছিল, যার মধ্যে ফিক্সড পয়েন্ট থিয়োরেমের ব্যবহার প্রধানতম।

ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে এখানে কিছু কথা বলা যেতে পারে। ১৯৫২ সালে ইকনমেট্রিক সোসাইটির শিকাগো মিটিং-এ অ্যারো ও ডেব্রু তাঁদের গবেষণা পত্রটি প্রথম পরিবেশন করেন, পেপারটি ছাপা হয় তার দু'বছর পরে, ইকনমেট্রিকা পত্রিকার জুলাই সংখ্যায়। তার দু'মাস আগে, ইকনমেট্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয় লায়োনেল ম্যাকেঞ্জির সর্বজনীন ভারসাম্যের অস্তিত্ব সংক্রান্ত একটি গবেষণা পত্র যার বিষয় এবং বিশ্লেষণ-ভঙ্গী অ্যারো-ডেব্রুর গবেষণা পত্রটির থেকে খুব আলাদা নয়, যদিও খুঁটিনাটি দেখলে দু'টি গবেষণা পত্রে সামান্য কিছু অমিলও ছিল। লক্ষনীয় যে, ম্যাকেঞ্জিও তাঁর গবেষণা পত্রটি ১৯৫২ সালে ইকনমেট্রিক সোসায়টির শিকাগো মিটিং-এ পরিবেশন করেছিলেন। সব দিক বিচার করে বলা যেতে পারে, অ্যারো-ডেব্রু এবং ম্যাকেঞ্জি তাঁদের গবেষণা স্বাধীনভাবে অর্থাৎ আলাদা আলাদা করে কিন্তু একই সময়ে সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ম্যাকেঞ্জির অবদানের কথা অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাসে তেমনভাবে জায়গা পায়নি। অ্যারোর কথা আলাদা, তাঁকে সর্বজনীন ভারসাম্য তত্ত্ব ছাড়াও আরও নানা কারণে নোবেল পুরস্কার দেওয়া যেত। কিন্তু ডেব্রুকে যখন ১৯৮৩ সালে সর্বজনীন ভারসাম্য তত্ত্বের জন্য এককভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল, তখন ম্যাকেঞ্জির কথা ভাবা হয়নি। এই অবিচার ম্যাকেঞ্জির ছাত্রদের বিষণ্ণ করে, যাদের মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও আছে। তবে সান্ত্বনা এই যে, এইরকম অবিচারের উদাহরণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে নেহাত কম নেই।

আবার অ্যারোর কথায় ফিরে আসি। কল্যাণমূলক অর্থশাস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় মৌলিক উপপাদ্য দু'টির তাৎপর্য গভীর ও সুদূরপ্রসারী। প্রথম থিয়োরেমটি বলছে, একটি অর্থনীতিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে সম্পদ-বন্টন সম্পন্ন হয় সেখান থেকে কোনও একজন ব্যক্তির উন্নতিসাধন ঘটাতে গেলে অন্য কারও অবনতি ঘটাতেই হবে, অর্থাৎ এই সম্পদ বন্টন দক্ষ। উল্লেখ করা যেতে পারে, দক্ষতার এই সংজ্ঞাটি অর্থনীতিবিদ উইলফ্রেডো প্যারেটোর। দ্বিতীয় উপপাদ্যটি বলছে, যে-কোনো প্যারোটো অর্থে দক্ষ বন্টন (যেখানে কোনও একজন ব্যক্তির উন্নতিসাধন ঘটাতে গেলে অন্য কারও অবনতি ঘটাতেই হবে) অন্য কোনও উপায়ে উপলব্ধ হোক বা না হোক, পূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অবশ্যই উপলব্ধ হওয়া সম্ভব, যদি উৎপাদন ও বিনিময়ের আগে পুনর্বন্টনে বাধা না থাকে। এসবের মানে কী?

প্রথম উপপাদ্যটি বলছে, বাজার-নির্ভর পূর্ণ প্রতিযোগিতা একটি প্যারোটো-দক্ষ ব্যবস্থা, কিন্তু তার বেশি কিছু বলছে না। লক্ষনীয় যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে সম্পদ বন্টন সম্পন্ন হল সেটি ন্যায়বিচারের মানদন্ডে গ্রহণীয় নাও হতে পারে। প্রতিযোগিতার মধ্যবর্তিতায় এমন বন্টনও সম্ভব যেখানে প্রায় সব সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে রইল, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাকিরা পেল যৎসামান্য। এটা একটা দক্ষ বন্টন বটে, কিন্তু ন্যায়ের মানদন্ডে এই বন্টন গ্রাহ্য নয়। তুলনায় দ্বিতীয় উপপাদ্যটি অনেক শক্তিশালী। এখানে দেখানো হচ্ছে যে-কোনও প্যারোটো-দক্ষ বন্টন বাজার নির্ভর পূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপলব্ধ হওয়া সম্ভব। এর মধ্যে সামাজিক ন্যায়ের মানদন্ডে গ্রহণযোগ্য বন্টনও আছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে বন্টন তত্ত্বগতভাবে সম্ভব তাও আছে। এখানেই বাজার-নির্ভর পূর্ণ প্রতিযোগিতার জয়। আড়াইশ বছর আগে অ্যাডম স্মিথ কল্পনা করেছিলেন এক অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় বাজারের অসংখ্য ছোট-ছোট পরস্পর-বিরোধী স্বার্থান্বেষণ থেকে

জন্ম নেবে একটি দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কেনেথ অ্যারো সেই কল্পনারই একটা গাণিতিক প্রমাণ দিলেন। তবে একটা কথা। কাম্য বন্টনে উপনীত হতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে সম্পদের একটা প্রাথমিক পুনর্বন্টন দরকার, যে দরকারের কথা উগ্র দক্ষিণপন্থীরা প্রায়শই ভুলে যান। অ্যারোর থিয়োরেম আমাদের সেই দরকারের কথাও মনে করিয়ে দেয়।

অ্যারোর আরেকটি মুখ্য কাজ অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি নিয়ে। বস্তুত আধুনিক ফিন্যান্সিয়াল ইকনমিক্স, বীমা সংক্রান্ত তত্ব, এমনকি স্বাস্থ্য বিষয়ক অর্থনীতি, সবই তাঁর কাজের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যৎ সর্বদাই অনিশ্চিত, সেখানে নানারকম অবস্থা সম্ভব। অ্যারো দেখালেন, বর্তমানে বসে সেই সম্ভাব্য অবস্থাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বিনিময় সম্ভব যার ফল ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে। এর জন্য দরকার এক ধরনের সিকিউরিটি, যার পোষাকি নাম অ্যারো সিকিউরিটি। স্টক, বন্ড, ফিউচারস, অপশান সবই কিছু মৌলিক অ্যারো সিকিউরিটির যৌগিক ফল। অ্যারো দেখালেন, ভবিষ্যতের প্রতিটি অবস্থার জন্য একটি করে অ্যারো সিকিউরিটি বাজারে পাওয়া গেলে, পূর্ণ প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় উপপাদ্যগুলির সত্যতা পুরোমাত্রায় বজায় থাকবে।

এখানেই শেষ নয়। ১৯৬২ সালে অ্যারো লিখলেন 'দি ইকনমিক ইমপ্লিকেশন্স অফ লার্নিং বাই ডুইং'। আড়াই দশক পরে সেই লেখাই নতুন বৃদ্ধি-তত্ত্বের দিগন্ত খুলে দিল। মর্ডেকাই কার্জ-এর সঙ্গে তাঁর একাধিক যৌথ কাজ দেখালো কেমন করে অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যায় কনট্রোল থিয়োরি ব্যবহার করা যায়। জাতিগত বৈষম্য নিয়ে তিনি অনেকগুলো গবেষণা পত্র লিখেছেন। লিখেছেন পরিবেশ দূষণ এবং স্বাস্থ্যবীমা নিয়েও। বস্তুত অর্থনীতির খুব কম শাখাই আছে যা তাঁর ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়নি। অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাসে কেনেথ অ্যারো এক অনন্য উদাহরণ হয়ে রইলেন।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি চিন্তা

রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি চিন্তা মূলস্রোতের থেকে একেবারে বিপরীত দিকে বয়েছে। মূলস্রোতের অর্থনীতি, যেটা পাশ্চাত্য দেশেই তৈরি হয়েছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রতিযোগিতা এবং এই প্রতিযোগিতার মূলে রয়েছে ব্যক্তিমানুষের স্বার্থপরতা। ব্যক্তিমানুষের স্বার্থচিন্তা মানে, কীসে তার নিজের ভালো হবে সেই চিন্তা। মনে হতেই পারে, একদল মানুষ, প্রত্যেকে যদি নিজের নিজের স্বার্থচিন্তা করে, তাহলে একটা ভয়ঙ্কর অশান্তির সৃষ্টি হবে। অ্যাডম স্মিথ, যাঁকে মূলস্রোত অর্থনীতির জনক বলা হয়, সেই ১৭৭৬ সালে দেখিয়েছিলেন, তা হবে না। মানুষ নিজের স্বার্থেই পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করবে। অশান্তি হলে কার লাভ? তাছাড়া, প্রতিযোগিতা থাকলে সকলেই প্রাণপণ পরিশ্রম করবে, নিজের স্বার্থেই করবে, ফলে দেশের উৎপাদন যতখানি বেশি হওয়া সম্ভব ততটাই হবে। পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে অ্যাডম স্মিথ-এর চিন্তার প্রভাব এখনও পুরোপুরি বজায় আছে।

পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন সহযোগিতায়, যা প্রতিযোগিতার একেবারে বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, স্বার্থান্বেশনের মধ্য দিয়ে নয়, স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সুন্দর একটা সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বার্থচিন্তা করলে সামগ্রিকভাবে সকলের ভালো হচ্ছে, এটা কি ইতিহাসে দেখা গেছে? না, বরং উল্টোটাই দেখা গেছে। কিন্তু তাই বলে স্মিথ-এর তত্ত্ব যে ভুল তা নয়। আসলে এই তত্ত্ব একটা মস্ত বড় অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ধরে নেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষ তার পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকের তুলনায় ক্ষুদ্র। এতটাই ক্ষুদ্র যে, তার নিজস্ব শক্তি দিয়ে সে তার পরিবেশকে বদলাতে পারে না। এখানে পরিবেশ বলতে অর্থনৈতিক পরিবেশকে বোঝাচ্ছে। বিশেষ করে যে বাজারে সে কিনছে বা বিক্রি করছে সেই বাজারের দাম তার কেনাবাচার ওপর নির্ভর করে না, ক্ষুদ্র বলতে এটাই বোঝাচ্ছে। স্মিথ বলছেন, একটা মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশে একদল ক্ষুদ্র মানুষ যে-যার নিজের স্বার্থচিন্তা করলে সকলেরই ভালো হবে। কিন্তু পরিবেশটা মুক্ত প্রতিযোগিতার থাকে না যদি কোনো-কোনো মানুষ অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন মনোপলি বা একচেটিয়া ক্ষমতার জন্ম হয়। একজন একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী যদি শুধুই নিজের স্বার্থচিন্তা করে তাহলে তার আশেপাশে যেসব ক্ষুদ্র মানুষ থাকে তাদের ক্ষতি। যেমন, রাজা স্বার্থপর হলে ক্ষতি প্রজাদের। সমস্যা হল, এই পৃথিবীতে অসংখ্য ছোটখাট মানুষের পাশাপাশি দুয়েকজন ক্ষমতাশালী বাস করেন, বড় বহুজাতিকের নাগালে বাস করেন অনেক ছোট-ছোট বিক্রেতা। রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন, যে সমবায়ের ভিত্তি সহযোগিতা।

ইতিহাস থেকে একটা-দুটো উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে। বস্তুত, মানুষের স্বার্থপরতা থেকে নানারকম অনর্থ ঘটেছে এমন উদাহরণ ইতিহাসে ভুরিভুরি। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, চারদিকে এত হানাহানি, সবই মানুষের স্বার্থপরতার ফসল। আবার প্রতিযোগিতার ফলে সার্বিক উন্নতি হচ্ছে এমন দৃষ্টান্তও অনেক। পাশ্চাত্য দেশগুলো যে আর্থিকভাবে এগিয়ে আছে এটা তো আর মিথ্যে নয়। কিন্তু গান্ধীজির মতো রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন আর্থিক উন্নতির থেকে আত্মিক উন্নতির প্রয়োজন ঢের বেশি। তাই শেষ বিচারে পাশ্চাত্য উন্নতির কাঠামোটা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি, যদিও এর কিছু কিছু গ্রহনীয় দিক আছে সেটাও তিনি মেনে নিয়েছেন।

কিছু অল্পসংখ্যক শক্তিশালী লোকের লোভ ও স্বার্থপরতা যে সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তার সাম্প্রতিক উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সাব-প্রাইম ক্রাইসিস'। এটার কথা একটু খুলে বলি। ২০০৩-০৪ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্তারা মিলে একটা নতুন খেলা শুরু করল। এতে যোগ দিল বড় বীমা কোম্পানি এবং ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির কিছু চাঁই। বাড়ি করার জন্য ব্যাপক হারে ধার দেওয়া শুরু হল, এমন সব পরিবারকে ধার দেওয়া শুরু হল যাদের ধার শোধ দেবার ক্ষমতা নেই। ব্যাঙ্করা বলল, ধার শোধ না দিতে পারলে কী হয়েছে? ধারের টাকায় তৈরি করা বাড়িটা তো বাঁধা রইল। সেটা বিক্রি করে ধারের টাকা তুলে নেওয়া যাবে। আমেরিকায় তখন বাড়ি কেনার হিড়িক পড়ে গেছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন বাড়ি অত তাড়াতাড়ি তৈরি করা যাচ্ছে না। ফলে বাড়ির দাম বাড়ছে হু-হু করে। তাই বাড়ি বিক্রি করে শোধ না করা ধারের টাকা তুলে নেওয়া যাবে এটা কেউ অবিশ্বাস করল না। তাছাড়া বীমা কোম্পানিগুলো ধারের বীমা করে রেখেছে, ধার শোধ না হলে তারা দিয়ে দেবে। ব্যাঙ্করা এবার সেই বাড়ির ঋণপত্রগুলো কম টাকায় অন্য কিছু আর্থিক সংস্থাকে বেচে দিল। তাদের আর কোনো দায় রইল না। এই আর্থিক সংস্থাগুলো আবার এই ঋণপত্রের ভিত্তিতে নতুন নতুন ঋণপত্র তৈরি করে সারা পৃথিবীতে বিক্রি করতে শুরু করল। আর সারা পৃথিবীর আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পেনশন ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ড, প্রভিডেন্ড ফান্ড, সবাই পাইকারি হারে কিনতে লাগল সেই ঋণপত্র। সারা পৃথিবীতে একটা আর্থিক জোয়ার শুরু হল। আর এর থেকে কিছু অসাধু মানুষ অকল্পনীয় লাভ করতে লাগল।

সমস্যা শুরু হল কয়েক বছর পর থেকে। যারা ধার নিয়ে বাড়ি কিনেছিল তারা একের পর এক টাকা শোধ দিতে না পেরে বন্ধকি বাড়ি ফিরিয়ে দিতে শুরু করল। কিন্তু আর্থিক সংস্থাগুলো সবাই মিলে যখন সেই বন্ধকি বাড়ি বাজারে বিক্রি করার চেষ্টা করতে লাগল, তখনই হু-হু করে পড়তে থাকল বাড়ির দাম। ফলে বাড়ি বিক্রির টাকায় ধার শোধ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কয়েকটা বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণের টাকা না দিতে পেরে লালবাতি জ্বালাল। নতুন ঋণপত্রগুলোর দাম কানাকড়িও রইল না। এইভাবে অসংখ্য মানুষ—পেনশনভোগী, শেয়ার বাজারে ছোট-ছোট বিনিয়োগকারি, প্রভিডেন্ড ফান্ডে আমানতকারি—সরাসরি পথে বসল। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, সারা পৃথিবীর আর্থিক বাজারে একটা অবিশ্বাসের আবহাওয়া তৈরি হল। কেউ কাউকে ধার দিতে চায় না। এই অবস্থায় বিনিয়োগ হবে কী করে? কী করে উৎপাদন হবে? কর্মসংস্থান হবে? ফলে, সারা পৃথিবীতে একটা ভয়ঙ্কর মন্দা শুরু হল। কাজ হারালেন অসংখ্য মানুষ। অসংখ্য পরিবারে সঙ্কট নেমে এল। এক কথায় বলতে গেলে, অল্প সংখ্যক কিছু মানুষের সীমাহীন লোভের ফলে কোটি-কোটি মানুষ দুর্দশায় পড়লেন। স্বার্থপরতার কুপ্রভাবের জ্বলজ্বলে উদাহরণ এর থেকে বেশি আর কী হতে পারে?

তাই রবীন্দ্রনাথ বলবেন, প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতাই মুক্তির পথ। কিন্তু এ-ব্যাপারে গোড়াতেই তিনি একটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলছেন, সহযোগিতা গায়ের জোরে ওপর থেকে চাপিয়ে দিলে হবে না। সহযোগিতার উপলব্ধিটা আসতে হবে মানুষের অন্তর থেকে। এ-ব্যাপারে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি লিখছেন, পশ্চিমের সাম্যবাদী দেশগুলি দস্যুবৃত্তি করে, রক্তপাত করে, ধনীর ধন অপহরণ করে সমাজে সাম্য স্থাপন করতে চেষ্টা করে। এ সমস্ত চেষ্টা বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায়ই দেখা যায়। তার কারণ হচ্ছে পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেই জন্যই গায়ের জোরের ওপর তার আস্থা বেশি। কল্যাণসাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

স্মরণ করা যেতে পারে, রাশিয়ায় রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছিল। কাগজে কলমে ক্ষমতা গেল রাজার থেকে প্রজার হাতে। কিন্তু সত্যি সত্যি ক্ষমতা প্রজার হাতে গেল কি? আমরা জানি, গেল না। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, যে-বিরাট আদর্শ নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার শুরু হয়েছিল, সেই আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেছে। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে কতিপয় রাজনৈতিক বড়কর্তার হাতে। এই রাজনৈতিক নেতারা মনের সুখে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে লাগলেন। তাদের জন্য আলাদা

ব্যবস্থা, আলাদা যানবাহন, আলাদা চাকর-আর্দালি, সপ্তাহান্তের ছুটি কাটানোর জন্য বিলাসহুল 'ডাচা'। সাম্যবাদের আর্দশটা যদি ভেতর থেকে আসত, যদি সেটা গায়ের জোরে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া না হত, তাহলে ওই নেতারা এতটা অন্যায় করতে পারতেন না।

উল্টোদিকে, সমবায় জিনিসটাও সোভিয়েত রাশিয়ায় দাঁড়াল না। এবং এর পেছনেও সেই ওপর থেকে গায়ের জোরে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা কাজ করেছে। লোকগুলো তো আর ভেতর থেকে বদলায়নি, তাদের মধ্যে লোভ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা সবই রয়ে গিয়েছিল। তাই সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে থাকলেও তারা সকলেই ভাবল আমি কেন কাজ করব, আমার হয়ে অন্যরা কাজ করে দেবে। আর সকলেই যখন এরকম ভাবছে তখন আসল কাজটাই আর হয়ে উঠছে না। তাছাড়া, কাজ না করলেও যেখানে বেতন পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে সেই মানুষগুলো, যাদের মানসিক রূপান্তর ঘটেনি, তারা কাজ করবে কেন? এইভাবে উৎসাহের অভাবে এবং সর্বোপরি মানসিক রূপান্তরের অভাবে একটু একটু করে ভেঙে পড়ল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সোভিয়েত রাশিয়ার এই পতনের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমবায়নীতি' নামক প্রবন্ধতে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসে, অর্থাৎ ১৯২২ সালের শেষ দিকে। রাশিয়ার তখন একেবারে ভগ্নদশা। কিছুদিন হল বলশেভিক বিপ্লব শেষ হয়েছে, কিন্তু দেশের অবস্থা তখনও স্বাভাবিক হয়নি। লেনিন দেশের অর্থনীতি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরিক্ষা করছেন, কখনও ওয়ার কমিউনিসম, কখনও নিউ ইকনমিক পলিসি, কিন্তু কোনও পরীক্ষাই সফল হচ্ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য।

'রাশিয়ার চিঠি' লেখা ১৯৩০ সালে। ইতিমধ্যে লেনিন মারা গেছেন, চালকের আসনে স্তালিন। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল, স্তালিনের দৃঢ়তা দেশকে নতুন পথ দেখাবে। কোনও সন্দেহ নেই যে ওই সময় রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রথমত, রাশিয়ার নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সাধারণ মানুষ, গ্রামের গরিব কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়ে, প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে এটা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বিশেষ করে এই কারণে যে, তাঁর নিজের দেশে এটা তিনি দেখতে পাননি। তাছাড়া, রাশিয়া গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল চার দিকে একটা সাম্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কৃষক পরিবার দল বেঁধে অপেরা দেখতে যাচ্ছে, টলস্টয়-এর রেসারেকশান-এর নাট্যরূপ দেখতে যাচ্ছে, এরকম তিনি পশ্চিম ইয়োরোপে-ও দেখেননি। এমনকি, স্তালিনের নারকীয় কালেক্টিভাইজেশন, যার ফলে পরে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন, কৃষি উৎপাদন সাংঘাতিকভাবে কমে গিয়েছিল, সেটা দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য ১৯৩০-এ বসে বোঝা সম্ভব ছিল না কালেক্টিভাইজেশন, যাকে রবীন্দ্রনাথ 'কৃষিক্ষেত্রের একত্রীকরণ' নাম দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে কী ফল দিতে চলেছে। মোটের ওপর ১৯৩০ সালে রাশিয়ায় গিয়ে হয়ত কবির মনে হয়েছিল সেখানকার মানুষের মধ্যে একটা আত্মিক পরিবর্তন এসেছে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

কিন্তু রাশিয়ায় গিয়ে দু'একটা অশনি সংকেতও তিনি পেয়েছিলেন। রাশিয়ার চিঠিতেই লিখছেন, সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে। বলশেভিক নীতি নিয়ে তিনি আরও লিখছেন, অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেইদিনই রোগীর শুভদিন।

সম্ভবত, এখানেই মার্ক্স-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তফাৎ। বলা ভাল, মার্ক্স-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু মিলও আছে, আবার কিছু কিছু একেবারে মৌলিক অমিলও আছে। মিলের থেকে অমিলটাই বেশি। প্রথমে মিলগুলোর কথা বলি। প্রথমত, মার্ক্স-এর মতো রবীন্দ্রনাথকেও সামাজিক অসাম্য বস্তুটা ভীষণভাবে পীড়িত করেছিল। তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে এর প্রমাণ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, মার্ক্স-এর মতো রবীন্দ্রনাথও মনে করেছিলেন প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে এই অসাম্যের প্রতিকার করা যাবে না। এর জন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা সার্বিক সহযোগিতা দরকার। মিল এখানেই শেষ। মার্ক্স-এর কাছে এই সহযোগিতার ধরন সোস্যালিসম। রবীন্দ্রনাথের কাছে সমবায়। দু'এর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে, সোস্যালিসম-এ ব্যক্তিমানুষের জায়গা নেই, রবীন্দ্রনাথের

কাছে ব্যক্তিমানুষ পরম পবিত্র। সমষ্টির আগুনে ব্যক্তিমানুষ পুড়ে গেলে তার থেকে বড় ক্ষতি রবীন্দ্রনাথের কাছে আর কিছু ছিল না। এখানেই মার্ক্স-এর সঙ্গে তাঁর বিরাট তফাৎ। সোস্যালিস্ট সমাজে যে মানুষের মগজধোলাই করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তিনি বাউল গানের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, 'নিঠুর গরজী/ তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে?/ তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহুনে।/ দেখ না আমার পরম গুরু সাঁই/ সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল তাড়াহুড়া নাই'। উদ্ধৃতিটা 'রাশিয়ার চিঠি'তেই আছে।

দ্বিতীয়ত, যন্ত্রের ব্যবহার, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এইসবের থেকে সুযোগ নেবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল না। মার্ক্স-এর কাছে কিন্তু যন্ত্র মানুষের শত্রু কারণ সে মানুষের কাজ কেড়ে নেয়, তাকে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সমবায় তো একটা সমষ্টিগত উদ্যোগ, তার সঙ্গে ব্যক্তিমানুষ এবং তার স্বাধীনতার ব্যাপারটা মেলাব কী করে? এর উত্তরও আছে। সমবায়ের প্রয়োজনটা যদি মানুষের ভেতর থেকে আসে, যদি মানুষের মধ্যে একটা আত্মিক পরিবর্তন ঘটে যায় তাহলে দু'টোকে মেলাতে অসুবিধে নেই। আসল কথা হল, সমবায় হোক বা আরও বৃহত্তর সহযোগিতা, কিছুই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। এই ওপর থেকে চাপিয়ে দেবার ব্যাপারটাতে রবীন্দ্রনাথের এতটাই অনীহা ছিল যে কখনো কখনো তিনি রাষ্ট্রের ওপরে সমাজকে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলছেন, পশ্চিমে জনহিতকর কাজে রাষ্ট্রের একটা বড় ভূমিকা নিশ্চয় আছে, কিন্তু আমাদের দেশে রাষ্ট্রের কাজটা চিরদিন সমাজই করে এসেছে। তাই এখানে রাষ্ট্রকে বাদ দিয়েও অনেক কিছু করা সম্ভব, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু সম্ভবই নয়, শ্রেয়ও বটে। এখানে অ্যানার্কিস্ট বা নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিশেষ মিল দেখতে পাই।

কেউ কেউ বলবেন, রবীন্দ্রনাথের এই সমবায়-চিন্তা, এটা একটা কল্পিত রামরাজ্য, নিছক ইউটোপিয়া। বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই। আমরা জানি, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ সফল হয়নি। কিন্তু এক জায়গায় সফল হয়নি বলে কোনোদিন কোথাও সফল হবে না একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বেশ বড় আকারে ইটালিতে ঘটেছে। সেখানকার মাঝারি আকারের কোম্পানিগুলো সেই মধ্যযুগ থেকেই প্রোডিউসারস গিল্ড-এর মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছে। পৃথিবীর বাজারে এদের হারানো অসম্ভব। আবার আর এক ধরনের সহযোগিতা দেখতে পাই জাপানে, যেখানে শ্রমিক তার কোম্পানিকে তার নিজের বলে মনে করে, মালিকও শ্রমিককে মনে করে তার পরিবারের অংশ। মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হলে শ্রমিক বেশি করে কাজ করে, শ্রমিককে শাস্তি দিতে চাইলে মালিক তাকে কম করে কাজ দেয়। অর্থাৎ পশ্চিমের প্রতিযোগিতার মডেলটাই যে একমাত্র মডেল, এমন নয়। এবং সন্দেহ নেই যে, এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমাদের এখনও অনেক কিছু শেখার আছে। সব থেকে জরুরি শিক্ষা এই যে, আর্থিক উন্নতিরও ঢের আগে দরকার আত্মিক উন্নতি। এই একটা ব্যাপারে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ একেবারে একমত।

সমাজতন্ত্রের দুই প্রাক্তনী : স্লোভেনিয়া ও চিন

(১)

উত্তরে অস্ট্রিয়া, দক্ষিণে ক্রোয়েশিয়া, পুবে হাঙ্গেরি, পশ্চিমে ইতালি—এই চৌহদ্দির মধ্যে ছোট্ট দেশ স্লোভেনিয়া। ইয়োরোপের একেবারে মাঝখানে। এই সেদিন অব্দি ইউগোস্লাভিয়ার অংশ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে মোটের ওপর মিলেমিশেই ছিল ইউগোস্লাভিয়ার নানা জাতি ও সম্প্রদায়। ১৯৮০ সালে টিটোর মৃত্যু হয়, আর তার পর থেকেই ক্রমশ জাতি-দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হতে হতে ১৯৯২ সালে ইউগোস্লাভিয়া টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। সেই সময় স্লোভেনিয়ার জন্ম। ইউগোস্লাভিয়া ভেঙে স্লোভেনিয়া ছাড়াও ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, মোন্টেনেগ্রো, ম্যাসিডোনিয়া এবং বসনিয়া-হারজিগোভিনা এই পাঁচটি বল্কান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল।

মার্শাল টিটো সোভিয়েত রাশিয়ার তাঁবেদারি করেননি। সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে তিনি স্তালিনের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে নেহেরু এবং নাসেরকে সঙ্গে নিয়ে মার্কিনি এবং রুশ শক্তির পাশাপাশি একটা তৃতীয় নিরপেক্ষ জোট তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে স্বপ্ন পুরোপুরি সফল হয়েছিল এমন দাবি কেউ করবে না। কিন্তু স্তালিনীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির চিহ্ন হিসেবে টিটো বাজার অর্থনীতিকে বর্জন করেননি, সমাজতন্ত্রের মোড়কে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছিলেন মাত্র। বাজারের সুফল অবশ্য সারা দেশ সমানভাবে নিতে পারেনি। যেসব অঞ্চল পিছিয়ে ছিল, বাজারের সুযোগ-সুবিধেগুলো তাদের কাছে অপেক্ষাকৃতভাবে অধরাই রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর্থিকভাবে এগিয়ে থাকা অঞ্চলগুলো মার্শাল টিটোর মিশ্র অর্থনৈতিক পরিবেশ থেকে অনেকটাই আদায় করে নিতে পেরেছিল। আর স্লোভেনিয়া ছিল ইউগোস্লাভিয়ার সব চাইতে এগিয়ে থাকা অঞ্চল। ফলে দেশ ভাগ হয়ে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই স্লোভেনিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিল।

গত বছর, অর্থাৎ ২০১৭ সালে, পুজোর সময় সস্ত্রীক সপ্তাহ তিনেকের জন্য ছেলের কাছে স্লোভেনিয়া বেড়াতে গিয়েছিলাম। কোনো কাজ ছাড়া নির্ভেজাল ছুটি কাটানোর জন্য বিদেশ ভ্রমণ এই প্রথম। আমাদের ছেলে সেই সময় সদ্য বিলেত থেকে পিএইচডি শেষ করে স্লোভেনিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের গবেষণা বিভাগে কাজ শুরু করেছে। স্লোভেনিয়ার রাজধানী লুব্লিয়ানায় তার আপিস ও বাসস্থান। তার আটতলার ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইউগোস্লাভিয়া, মার্শাল টিটো, স্লোভেনিয়ার জন্ম, বসনিয়া-কসোভোর রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি ইতিহাসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী মনে পড়ে যাচ্ছিল।

সামনে রাস্তা, সকাল-সন্ধে অবিশ্রাম দ্রুতগামী গাড়ির স্রোত, তার পেছনে সবুজ পাহাড়। আরও দূরে আর একটা পাহাড় আকাশ ছুঁয়েছে। নজর করে দেখলে বোঝা যায় দূরের পাহাড়টার মাথা এই অক্টোবরেই তুষার-ধবল। রান্নাঘরের জানলা দিয়েও সেই তুষার-ঢাকা পাহাড়। এটাই তবে আল্পস। পরে জেনেছি, ইউরোপের এই বিখ্যাত পর্বতশ্রেণির স্লোভেনিয়ান অংশটা জুলিয়ান আল্পস নামে পরিচিত।

ইয়োরোপের অন্য শহরগুলোর সঙ্গে চেহারায়-চরিত্রে লুব্লিয়ানার খুব অমিল নেই। শহরে একটা পুরোনো অংশ, একটা নতুন। নতুন অংশে গগনচুম্বী ফ্ল্যাটবাড়ি, আপিস-কাছারি, আধুনিক বিপনী। আমাদের ছেলের ফ্ল্যাটবাড়িটিও নতুন শহরে। সেখান থেকে সরকারি বাসে চেপে শহরের পুরোনো অংশে যেতে হয়। দু'মিনিট অন্তর বাস আসছে। আপিস যাত্রীদের ভিড় কেটে গেলে বাস একেবারে ফাঁকা। তবু আসার বিরাম নেই। তবে ভাড়া নেহাত কম নয়, উঠলেই ১.২০ ইউরো, টাকায় হিসেব করলে ১০০ টাকার একটু বেশি। পেট্রল পাম্পের সংলগ্ন মুদিখানা থেকে এক সঙ্গে কুড়ি ইউরোর টিকিট কেটে নিলাম। ছেলের বাস ভাড়া অবশ্য

আপিস দিয়ে দেয়। ব্যাঙ্ক অফ স্লোভেনিয়ায় প্রায় প্রত্যেকেই বাসে যাতায়াত করেন। বোঝা যায় কিছুদিন আগেও দেশটা সমাজতান্ত্রিক ছিল।

পুরোনো শহরের মধ্যমণি সিটি সেন্টার, তার পেছন দিয়ে বয়ে গেছে লুব্লিয়ানিকা নদী। তেমন চওড়া নয়, ঠিকঠাক বলতে গেলে খাল, তবে পরিষ্কার ঝকঝক করছে, ট্যুরিস্টরা স্টিমারে চড়ে নদীবক্ষে ভ্রমণ করতে করতে শহরের ছবি তোলেন। নদীর দুধার দিয়ে পাথর ঢাকা রাস্তা, সেই রাস্তা থেকে বেরিয়েছে আরো গলি, তস্য গলি। কাফে-রেস্টোরান্টে ভর্তি গলিগুলো মধ্যযুগের, তাদের চেহারা দেখে বোঝা যায় শহরটা কত পুরোনো।

কোথাও কোথাও রাস্তা থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নদী অব্দি। এক রবিবার নদীর ধারে পৌঁছে দেখি মাছের বাজার বসেছে। অধিকাংশই অচেনা মাছ, তবে সবই খুব টাটকা, অনেক খুঁজে-টুজে কয়েকটি রেনবো ট্রাউট আর কিছুটা স্যামন মাছ কিনলাম। শেষোক্ত মাছটি দই-সর্ষে দিয়ে যত্ন করে রাঁধতে পারলে রীতিমত সুস্বাদু হয়ে ওঠে। সে রাত্তিরে গিন্নির হাতের গুণে হয়েও ছিল। মাছের বাজার থেকে বেরিয়েই বিরাট অঞ্চল জুড়ে চাষীদের বাজার। এটা রবিবারেই বসে। শাক-সজ্জী, ফলমূল ছাড়াও কেউ বাড়িতে তৈরি কেক-পাঁউরুটি এনেছে, কেউ এনেছে জ্যাম-জেলি, কেউ বা ছোটখাট পাশ-বালিশের আকারের সসেজ বা হ্যাম। কেউ আবার সীমানা পেরিয়ে ইতালির ত্রিয়েস্তে থেকে নিয়ে এসেছে ফ্রিউলি চিজ। সবই একটু একটু কিনলাম। জমিয়ে ব্রেকফাস্ট হবে। হঠাৎ দেখি বাজারের ভেতর হরেকেষ্ট দলের ধুতি পাঞ্জাবি পরা জনা পাঁচ-ছয় সাহেব বোষ্টম তাদের শাড়ি পরা মেম বোষ্টমিদের নিয়ে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে নাচতে নাচতে মাধুকরি আহরণে বেরিয়েছে। দু' ইউরো ভিক্ষা দিতেই হলো।

বিকেলে হাঁটতে বেরোলে কোনও বেকারিতে বসে কফিপান অবশ্য কর্তব্য। সঙ্গে হরেক রকমের বুরেক। বুরেক জিনিসটার উৎপত্তি সম্ভবত প্রাচীন তুরস্ক দেশে, তবে পশ্চিম এশিয়া এবং পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এর কদর। খোলসটা খানিকটা আমাদের পরিচিত প্যাটির মতো, তবে আরও মুচমুচে। ভেতরে পালং শাক, চিজ, মাংসের কিমা, মাশরুমের পুর। ক্বচিৎ-কদাচিত আপেলের পুর দেওয়া মিষ্টি বুরেকও পাওয়া যায়। বেকারিকে এরা বলে পেকারনা, যার বহুবচন পেকারে। কথাটা শুনতে খানিকটা বেকারিরই মতো। স্লোভেনিয়ানদের কাছে আরেকটা উপাদেয় খাদ্য কচি ঘোড়ার মাংস। আমাদের খাবার সুযোগ হয়নি, ছেলে খেয়েছে।

স্লোভেনিয়ানরা ভারতীয়দের সম্বন্ধে কিছুটা খোঁজখবর রাখে। অন্তত বয়স্করা। সম্ভবত টিটো-নেহেরুর বন্ধুতার ফল। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমার ছেলে অগ্নিরূপের যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল সেটা এককথায় অভূতপূর্ব। শহরের একটু বাইরে একটা মল আছে সেখান এশিয়া মার্কেট নামের একটা ছোট্ট দোকান থেকে অগ্নিরূপ মাঝে মাঝে ভারতীয় মশলাপাতি চাল-ডাল কিনতে যেত। নামে এশিয়া মার্কেট হলেও দোকানের মালিক ক্রোয়াট। সে যাই হোক, ফেরার পথে বাজারের বোঝা ভারী হয়ে গেলে ট্যাক্সি নিতে হয়। সেদিনও নিতে হয়েছিল। ট্যাক্সিওলা গপ্পে মানুষ, সার্বিয়ার লোক, অগ্নিরূপকে জিজ্ঞেস করল, সে কোন দেশ থেকে আসছে? ভারত থেকে আসছে শুনে সে বলল, সে দাবা খেলে, বিশ্বনাথন আনন্দের বড় ভক্ত। এই অব্দি আশ্চর্য হবার তেমন কিছু নেই। বিশ্বনাথন আনন্দ বিশ্ববিখ্যাত মানুষ, তাঁর কথা সব দাবাড়ুই জানবে। কিন্তু এর পরবর্তী ঘটনা বিস্ময়কর। দাবাড়ু ট্যাক্সিওলা এবার জিজ্ঞেস করল, অগ্নিরূপ ভারতের কোন অঞ্চল থেকে আসছে? কোন ভাষায় কথা বলে? অগ্নিরূপ বাঙালি শুনে মনে হয় খুশি হল। তাই দেখে খানিকটা অবাকই হল অগ্নিরূপ। ভাবল, ট্যাক্সিওলা ভারত সম্বন্ধে এত খবর রাখে? কিন্তু তার অবাক হওয়া আরও অনেকটাই বাকি ছিল।

ট্যাক্সিওলার সঙ্গে যখন কথাবার্তা চলছে তখন ট্যাক্সির স্টিরিওতে একটা মোৎসার্ট বাজছিল—আইনে ক্লেনে নাখমিউজিক, ইংরেজি করে বললে, ওয়ান লিটল নাইট মিউজিক, অগ্নিরূপের খুব পছন্দের। ট্যাক্সিওলা সেই সিডিটা বার করে আর একটা সিডি ঢুকিয়ে দিল। আর তার কিছুক্ষণ পরেই অগ্নিরূপ শুনতে পেল জর্জ

বিশ্বাসের গমগমে গলায় বেজে উঠেছে 'আকাশ ভরা সূর্য তারা'। লুব্লিয়ানায় বসে 'আকাশ ভরা সূর্য তারা'! বিষ্ময়ের ঘোর খানিকটা কেটে যাবার পর অগ্নিরূপ ট্যাক্সিওলাকে জিজ্ঞেস করল, এ গান সে কোথায় পেল? ট্যাক্সিওলা জানাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাপারে তার দীর্ঘদিনের উৎসাহ। সার্বিয়ান আবিষ্কারক নিকোলা টেসলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্য আর সেই সখ্যের সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের সার্বিয়া ভ্রমণ তৎকালীন সার্বিয়ানদের রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় উৎসাহিত করেছিল। রবীন্দ্র-উৎসাহীদের মধ্যে এই ট্যাক্সিওলার বাবাও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে উৎসাহ ট্যাক্সিওলা পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছে। আর জর্জ বিশ্বাসের সিডিটা তাকে নিউ ইয়র্ক থেকে পাঠিয়েছে তার এক বন্ধু। সে কথাগুলোর মানে বোঝে না, কিন্তু সুরটা তাকে খুব টানে।

একদিক থেকে দেখলে, স্লোভেনিয়ার সমাজে সাম্য আছে। আমার ছেলে ব্যাঙ্ক অফ স্লোভেনিয়ায় যোগ দেবার পর ব্যাঙ্কের গভর্নর তাকে কফি খাবার আমন্ত্রণ জানালেন। কফি খেতে খেতে বললেন, তাঁরা ইয়োরোপের বড়লোক দেশগুলোর মতো বেতন দিতে পারেন না, কিন্তু অল্প বেতন নিয়ে অগ্নিরূপের নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। তিনি নিজে অগ্নিরূপের বেতনের দ্বিগুণের থেকে কিছু কমই বেতন পান। উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এ একজন তরুণ গবেষকের তুলনায় ব্যাঙ্কের গভর্নর প্রায় চারগুণ বেতন পেয়ে থাকেন। আবার অন্য দিক থেকে দেখলে, স্লোভেনিয়ার সমাজটা এখনও কিছুটা বদ্ধ, যেন সমাজতন্ত্রের ঘোর আজও পুরোপুরি কাটেনি, যেন মুক্ত বিশ্বায়ন ব্যাপারটা এখনও ঠিক মতো ধাতস্থ হয়ে ওঠেনি দেশটার। কয়েকদিনের জন্য ক্রোয়েশিয়া বেড়িয়ে আবার স্লোভেনিয়া ঢোকার সময় সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পেলাম। ইমিগ্রেশনে অহেতুক ঘন্টাখানেক দাঁড় করিয়ে রাখল, অথচ আসার সময় অস্ট্রিয়া দিয়ে যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ঢুকেছিলাম তখন মোটেও এত হ্যাপা সামলাতে হয়নি।

দেশে ফেরার পথে এয়ার ইন্ডিয়া জোর করে নিরামিষ খাওয়ালো, বোধহয় আমাদের পবিত্র হিন্দু সত্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য। কিন্তু সেটা আরেকটা গল্প।

(২)

পথে এক নদীর সঙ্গে দেখা। সে সবুজ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ের উচ্চতা থেকে তাকে স্থবির দেখায়। কাছে গিয়ে ঠায় তাকিয়ে থাকলে অবশ্য একটু একটু করে তার হলুদ, চলিষ্ণু মাংসপেশি নজরে আসবে। তার হেমন্তের শরীরে বড় বড় চড়া পড়েছে। চড়ায় উথালপাথাল কাশফুল। পুজো আসার আগে বাংলার গ্রামের মতন। নদীর ধারে কাঠের পাটাতনের উপর স্থানীয় এক দম্পতী একটা ছোট্ট রেস্তরাঁ চালায়, মধ্যাহ্নভোজনের জন্য আমাদের বাস সেখানে থামল।

নদীর নাম রুইলি। নিকটবর্তী শহরের নামও তাই। জায়গাটা দাই উপজাতির বাসভূমি, দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের অন্তর্গত হলেও ব্রহ্মদেশের একেবারে দোরগোড়ায়। পথে দেখতে দেখতে এসেছি পাহাড়, পাহাড়ের পায়ে ক্কচিৎ-কখনও দাই-দের বাঁশের ঘর-গেরস্থালি, কখনও সমতল, সবুজ ধানখেত, বাঁশবন, গ্রাম, পটভূমির সঙ্গে একান্তই বেমানানভাবে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা মোটর পার্টস-এর বিপনী আর পাহাড়ের পাকে পাকে খোদাই করা জেড পাথরের মতন সেই নাছোড় রুইলি নদী। এখানে অনেকেই বেড়াতে আসে, তবে ভ্রমণবিলাসীদের সকলেই স্থানীয় অর্থাৎ চৈনিক, সাহেব-মেম একটাও চোখে পড়ে না।

অল্প আয়োজনে অতিথি সৎকার চিনেদের ধাতে নেই। কিংবা হয়ত সরকারি অতিথি বলেই আমাদের আলাদা খাতির। কারণ যাই হোক, বাস থেকে নেমে দেখি, পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে সেই পান্ডববর্জিত, নামগোত্রহীন রেস্তরাঁর টেবিলেও অন্তত দশ-পনের রকমের ভোজ্য ও পানীয়। হংস-কুক্কুট-বরাহ মাংস ছাড়াও রুইলি নদীর টাটকা মাছ, টোফু অর্থাৎ সোয়াবিন-দুধের ছানা দিয়ে সবজি এবং রসুন সহকারে ভর্জিত পালং ও কলমি জাতীয় কয়েক রকমের স্থানীয় শাক। গোমাংস একেবারে বাদ, বস্তুত, পুরো সফরে একবারের জন্যও খাবার টেবিলে ওই বস্তুটি চোখে পড়েনি। সম্ভবত আয়োজনকর্তারা আগে থেকেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন, অধিকাংশ ভারতীয়রই গোমাংস ভক্ষণে বাধা আছে। অথবা চিনের ওই অঞ্চলে গোরুর

মাংসের তেমন চল নেই, এমনও হতে পারে। সে যাই হোক, ওই পাহাড়-জঙ্গলেও এলাহি আয়োজন। সন্দেহ নেই, আগে থেকে খবর দিয়ে সব কিছু ব্যবস্থা করা ছিল।

২০১০ সালের অক্টোবর-নভেম্বর। আমরা কয়েকজন ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে চিন সরকারের সৌজন্যে চিনের ইয়ুনান প্রদেশে ঘুরছিলাম। উদ্দেশ্য, পশ্চিম চিনের সঙ্গে পূর্ব ভারতের, ইয়ুনান প্রদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এবং সর্বোপরি, কলকাতা শহরের সঙ্গে ইয়ুনানের রাজধানী কুনমিং শহরের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো ঝালিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে একটা কনফারেন্স-এ বক্তৃতা দেওয়া এবং চৈনিক কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। ইয়ুনান প্রদেশ চিনের অন্যতম দরিদ্র প্রদেশ, ইয়ুনানের গড় মাথাপিছু আয় চিনের গড় মাথাপিছু আয়ের প্রায় অর্ধেক। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গকেও আর ভারতের উন্নততর রাজ্যগুলোর মধ্যে রাখা চলে না তাই ওই দুটি অঞ্চলের মধ্যে কিছু মিল থাকা স্বাভাবিক। কিছু আদানপ্রদানও হয়ত সম্ভব। দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদান এবং তার হাত ধরে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় অবশ্য অনাদি কাল থেকেই চলে আসছে। যিশুখ্রীষ্টের জন্মের কয়েকশ বছর আগেই তথাকথিত সিল্ক রুটগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিল যেগুলো ধরে বণিক, পর্যটক ও তীর্থযাত্রীরা চিন থেকে ভারতবর্ষ এবং সুদূর পাশ্চাত্যে ভ্রমণ করতেন। তখন রেশম, মশলাপাতি এবং হস্তশিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভারত। বুদ্ধের জন্মের পর ধর্ম এবং দর্শনেরও বটে। এইভাবে যে বিনিময় দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছিল, হাল আমলে চিনযুদ্ধের কারণবশত তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। চিনের সঙ্গে ভারতের বন্ধ লেনদেন ইদানীং আবার শুরু হয়েছে। ২০০৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আবার খোলা হয়েছে নাথুলা পাস। আরও সম্প্রতি কলকাতা-কুনমিং সরাসরি উড়ানও চালু হয়েছে। দেখলাম সেই উড়ানে অসংখ্য ছোট ছোট ব্যবসায়ী মালপত্র নিয়ে কলকাতা ও কুনমিং-এর মধ্যে যাতায়াত করছেন।

আগেই শুনেছিলাম, এবার চর্মচক্ষে দেখলাম, চিনেরা নিয়ম ও নির্দেশের নিগড়ে বাঁধা। নিয়ম কে তৈরি করেছে, নির্দেশ কোথা থেকে এল, তা ঠিক না বেঠিক এসব অবান্তর প্রশ্ন তুলে চিনেরা সময় নষ্ট করে না। নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দেয়। সেই রীতি মেনেই ভোর ছটায় কুনমিং-এ বিমান থেকে নেমে কাস্টমস-ইমিগ্রেশনের বেড়া পেরিয়ে চিনের সীমানায় ঢুকতে না ঢুকতে আমাদের প্রত্যেকের হাতে আগামী দিনগুলোর ইটিনারারি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখনও অবশ্য বুঝিনি এই কর্মসূচী ও ভ্রমণ-নির্ঘন্ট আমাদের একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। ইটিনারারির গোড়াতেই লেখা সাড়ে-ছটা থেকে সাড়ে-সাতটা অব্দি ব্রেকফাস্ট।

আগের রাত্তিরে একফোঁটা ঘুম হয়নি, তার ওপর দুর্মতিবশত রাত্তির তিনটের সময় প্লেনে যে অখাদ্যটা ডিনার বলে দিয়েছিল সেটাও খেয়ে ফেলেছিলাম। চোখে ঘুম, পেটে বিজাতীয় খাদ্য গজগজ করছে, দাঁত মাজা, মুখ ধোয়া হয়নি, এই অবস্থায় ব্রেকফাস্ট খাওয়া অসম্ভব এই কথা বহুবার জানিয়েও লাভ হল না। ইটিনারারির বাইরে একচুল যাওয়াও অসম্ভব। অগত্যা যাঁরা আমাদের নিতে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে এয়ারপোর্টেরই একটা ঝাঁ-চকচকে রেস্তঁরায় গিয়ে বসতে হল। খাবারের অর্ডারও দিতে হল। পরবর্তী অভিজ্ঞতা অবশ্য মন্দ নয়। রাইস-পরিজ বলে যেটা পরিবেশন করা হল সেটা আসলে ঈষৎ কালচে চালের উষ্ণ ফ্যানাভাত, পুব বাংলায় যার নাম জাউভাত, আমাদের গ্রামদেশে সকালের জলখাবার হিসেবে বহুপ্রচলিত। সঙ্গে সেদ্ধ ডিম, আকারে কিছুটা ছোট বলে সন্দেহ হয় কোয়েল-টোয়েল জাতীয় কোনও পাখির হবে। দিব্য খেতে, সঙ্গে একটু মাখন পাওয়া গেলে আর কোনও দুঃখ থাকত না।

চিনেরা উন্নতি করেছে। বই পড়ে, লোকের কথা শুনে, যেটুকু কল্পনা করেছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশি। কুনমিং থেকে আর একটা উড়ানে মানসি বলে ছোট্ট একটা শহরে নিয়ে গেল আমাদের, জায়গাটা দেহং জেলার (এখানে বলে প্রিফেকচার) সদর শহর, সেখানেই কনফারেন্স। জেলা শহর, তুলনা টানলে আমাদের চুঁচুড়া বা মালদার কথা বলতে হয়, কিন্তু চেহারায় যাকে বলে একেবারে অত্যাধুনিক। ছয় লেনের রাস্তা বেয়ে যেখানে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুলল সেটা পৃথিবীর যে কোনও বড় সহরের পাঁচতারার হোটেলগুলোর মতই

বিলাসবহুল পনেরতলার একটি হোটেল, নাম হোটেল মানসি। এগারতলায় নিজের ঘরে যাবার জন্য এলিভেটরে উঠতে উঠতে ভাবছিলাম, তাহলে চিনের এই অঞ্চলকে গরিব বলা হচ্ছে কেন?

উত্তরটা পেলাম খানিক বাদে, ঘরে পৌঁছে, এগারতলার জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকার পর। যে বিশাল রাস্তাটা ধরে একটু আগে আমরা হোটেলে এসে পৌঁছেচি সেটা ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তার দুধারে, একটু ভেতরে ঢুকে, বিস্তীর্ণ জনবসতি রয়েছে, আড়ালে ছিল বলে আসার সময় চোখে পড়েনি, এবার তাও দেখতে পেলাম। ওপর থেকে এক ঝলক তাকালে ঠাহর হয় না, তবে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে বোঝা যাবে, ছয় লেন বিশিষ্ট কর্মব্যস্ত রাজপথের পেছনে রয়েছে গলি, তস্য গলি, বিবর্ণ, ক্ষয়ে-যাওয়া বাড়ি, গরিব বসতি, যেখানে বিত্তহীন একাকী বৃদ্ধ দম্পতী রাস্তার ঝুপড়িতে মধ্যাহ্নভোজন সারেন, যেখানে গলির মোড়ে সারাদিন জটলা করে কর্মহীন যুবকেরা।

এটাই বোধহয় আধুনিক চিনের চেহারা। ধুলো-ময়লা নেই তা নয়, তবে ধুলো-ময়লা-আবর্জনার ওপর দামি কার্পেট চাপিয়ে রাখা হয়েছে। যা কিছু অস্বস্তিকর, যা কিছু দৃষ্টিকে পীড়া দেয়, তাকে প্রতিনিয়ত ওই কার্পেটের তলায় চালান করে দেওয়া হচ্ছে। এই বুঝি নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র? নাকি দরকচা মেরে যাওয়া সমাজতন্ত্রের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক বিভীষণ বাজার অর্থনীতি যার মুন্ডুটা নিজেদের কব্জায় রেখে পার্টির মাতব্বরেরা অনর্গল নিজেদের ঝুলি ভরছেন?

সমালোচকরা বলবেন, অবশ্যই দ্বিতীয়টা। বলবেন, এই জারজ বাজার অর্থনীতিতে পার্টি-ঘনিষ্ঠরাই দুটো পয়সার মুখ দেখছেন, ধনতন্ত্রের দুধ-ঘি খাচ্ছেন, মার্সিটিস-বিএমডাবলু-ফেরারি-লম্বারগিনি চড়ছেন, প্যারিস-ন্যু ইয়র্কে সপ্তাহান্তিক কেনাকাটা সারছেন। আর ইতরজন দিনে পনের-ষোলো ঘন্টা ঘাম ঝরিয়ে কোনও ক্রমে জীবনধারণ করছেন। যে পণ্য সাধারণ মানুষ উৎপাদন করছেন পৃথিবীর বাজারে সেগুলো চড়া দামে বিক্রি হয়ে মালিকদের পকেট ভর্তি করছে। সমালোচকরা বলবেন, চিনে গণতন্ত্র নেই, সমাজতন্ত্রেরও অকালমৃত্যু ঘটেছে, শুধু রয়েছে ধনতন্ত্র আর পার্টিতন্ত্রের মিশেলে তৈরি এক দানবীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। কথাগুলো নতুন নয়, একেবারে যে মিথ্যে তাও নয়, তবে এর মধ্যে কিছু কিছু অতিশয়োক্তিও আছে। ধীরে ধীরে হলেও, খানিকটা সুফল সমাজের নীচের তলাতেও চুঁইয়ে যাচ্ছে, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের আশা-আকাঙ্খাগুলো বদলাচ্ছে।

ধুলো-ময়লা আমাদের দেখানো হবে না জানতাম। তার বদলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল এক স্থানীয় কফি তৈরির কারখানায়। পাহাড়ের কোলে মস্ত বড় কারখানা, একেবারে ছবির মত ঝকঝক করছে, দেখে মনে হয় কোনও মাল্টিন্যাশানালের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়েছি। হয়ত আমার মাথায় সমাজতান্ত্রিক চিনের সেই পুরোনো ছবিটা শেকড় গেড়ে বসেছিল বলে, নেহাৎ-ই অভ্যাসবশত, ধরেই নিয়েছিলাম এই কফি তৈরির কারখানা, এই ঝকঝকে আপিসবাড়ি, সবই রাষ্ট্রের। ধরে নিয়ে ভাবছিলাম, এদের রাষ্ট্র যদি পারে এত সুন্দর করে একটা কারখানা চালাতে, আমাদের রাষ্ট্র পারে না কেন? একটু পরেই অবশ্য জানতে পারলাম প্রশ্নটা অবান্তর কারণ কারখানাটা রাষ্ট্রের নয়, কোনও এক ব্যক্তির মালিকানাধীন।

কফি কারখানার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা জেড পাথরের গহনা তৈরির কারখানায়। এটিও আগের কারখানাটির মতই ঝকঝকে, নয়নাভিরাম, দক্ষ, এবং সর্বোপরি কোনও একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কারখানা-সংলগ্ন বিপনীতে সুন্দরী বিপনন বনিতারা বহুমূল্য জেড পাথরের গয়নাগাঁটি বিক্রি করছিলেন। সেসব কেনবার সাধ অথবা সাধ্য কোনওটাই আমার ছিল না বলে দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের দোভাষী ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছিলাম। জানবার চেষ্টা করছিলাম কারা এইসব কারখানার মালিক। ভাবছিলাম, একটা সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সবাই মিলে বাস করতে করতে কেমন করে গুটিকতক ব্যক্তি কারখানার মালিক হয়ে বসলেন আর বাকিরা, বলা যায় সিংহ ভাগ, সেই কারখানায় শ্রমিক হয়েই রয়ে গেলেন? নাকি সমাজতন্ত্র ব্যাপারটাই একটা কল্পিত রামরাজ্য, এই দেশে বা অন্য কোনও দেশে প্রকৃত সমাজতন্ত্র কোনও কালেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি?

এইসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা, এক্তিয়ার বা সাহস, বলাই বাহুল্য, সেই বেচারা দোভাষী ছেলেটির ছিল না। ঠারেঠোরে সে যেটুকু বলল তার সঙ্গে কিছুটা অনুমান মিশিয়ে বুঝলাম এইসব ছোট ও মাঝারি কারখানার মালিকরা সকলেই আগের জমানায় পার্টির কেষ্টবিষ্টু ছিলেন এবং এখনও পার্টির ওপরমহলের সঙ্গে এদের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ট। এখানে রাশিয়ার সঙ্গে চিনের মিল এবং অমিল দুই আছে। মিল এই যে, চিনের মত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতেও পার্টির ওপরতলায় ক্ষীর-ননী কিছু বেশি পৌঁছত। কিন্তু বিশ্বায়নের পর চিনের সুবিধাভোগী শ্রেণি যেখানে উদ্যোগপতি হয়ে যেতে পারলেন, সেখানে রাশিয়ার পার্টি মাতব্বরদের একটা বড় অংশ, যাঁরা আগে লৌহ যবনিকার আড়ালে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী বিলাসবহুল ডাচায় ছুটি কাটাতে অভ্যস্থ ছিলেন, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো বদলের পর বনে গেলেন নির্ভেজাল মাফিয়া। কলকারখানা তৈরি করে শিল্পপতি হবার একটা সুযোগ তাঁদের সামনে এসেছিল, তাঁরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না। এর পেছনের কারণগুলোকে খোঁজা গবেষণা সাপেক্ষ, আমাদের সামান্য ভ্রমণ কাহিনির আওতার বাইরে, তবু ওপর ওপর মনে হয়, এখানে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের একটা ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে।

সন্ধে সাড়ে ছটা। একটু আগে দেহং জেলার রাজ্যপালের নিমন্ত্রণে একটা মস্ত হলঘরে ডিনার খেতে এসেছি। এলাহি ব্যাপার। আসার পথে সামনে-পেছনে পাইলট গাড়ির পাহারা। একটা অচেনা শহরের ততোধিক অচেনা বিকেল পেরিয়ে আমাদের আসতে হল। পাইলট গাড়ির ধমকে রাস্তার লোকজন, যানবাহন দুদিকে সরে যাচ্ছিল। তার মধ্যেই দেখলাম চায়ের দোকানে ছেলেমেয়েরা কথা বলছে, মুদিখানায় সন্ধের ভিড়, আপিস ফেরত প্রৌঢ় বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরছে। গাড়ি থেকে নেমে একা-একা কিছুক্ষণ রাস্তায় হাঁটতে পারলে এই আচেনা শহরের হৃদপিণ্ডটা স্পর্শ করা যেত। কিন্তু তা হবার নয়, আমরা সোনার শৃঙ্খলে বাঁধা।

আশ্চর্য ভোজসভা। ঢোকার মুখেই সনাতন পোষাক পরা সুবেশ, সুঠাম দাই উপজাতির যুবক-যুবতীদের অভ্যর্থনা, স্বাগতসঙ্গীত, পুষ্পবৃষ্টি। ঢুকে বিশাল হলঘর, তার একদিকে মঞ্চ, সেখানে নাচগান হবে, বাকি অংশ জুড়ে খাবার টেবিল। নিজের নাম খুঁজে নিয়ে বসে পড়ার পর গানবাজনা শুরু হল। বাজনাগুলো সবই স্থানীয়—বাঁশের বাঁশি, জয়ঢাক, ঢোল, সানাই-এর মত বায়ুযন্ত্র, রামসিঙা। তার সঙ্গে গান। মেয়েদের গলাগুলো রিনরিনে, অসম্ভব সুরে, সন্দেহ নেই সকলেই পেশাদার। একটা সুর বারবার ফিরে আসছিল, অনেকটা আমাদের রাগ দুর্গার মত সুর, রেখাব থেকে পঞ্চমে উঠে আবার মধ্যম হয়ে নেমে আসছে, মধ্যম থেকে পঞ্চম হয়ে ধৈবতে উঠছে আবার নেমে আসছে, যেন একটা পাহাড়ি নদী পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে, ঘুরতে ঘুরতে সমতলে নামছে। শেষে অতিথিদের তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে চৈনিক নাচ ও উচ্চারণসহ একটি হিন্দি গান পরিবেশিত হল। বেসুরো, বেতালা নয়, তবে বাকি অনুষ্ঠানের সঙ্গে নেহাতই বেমানান।

গানবাজনার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে গেছে। চেনা, আধচেনা এবং অচেনা সব মিলিয়ে অন্তত পঞ্চাশ রকমের পদ। সেই মৎস-কুক্কুট-বরাহ-মেষ, সেই বিখ্যাত ঝলসানো পিকিং ডাক। তার ওপর হরিণ, খরগোশ, এমনকি উটপাখির মাংস। তাছাড়াও রয়েছে অক্টোপাসের ছোট ভাই স্কুইড, সমুদ্রের চিংড়ি, স্ক্যালপ, ঝিনুক। আছে মৌমাছি ভাজা, বাঁশগাছে একরকম পোকা হয়, সেটা ভাজা। ছেলেবেলায় উপেন্দ্রকিশোরের রামায়ণে রাবণের ভোজসভার একটা বর্ণনা পড়েছিলাম, এটা প্রায় সেইরকম। এতগুলো পদের প্রতি বোধহয় রাবণও সুবিচার করতে পারতেন না, কুম্ভকর্ণকে দরকার পড়ত, তাই ঠিক করলাম সম্পূর্ণ অচেনা, কিংবা যেগুলো চট করে কলকাতায় পাওয়া যাবে না, অন্তত সেই পদগুলো চেখে দেখব। মৌমাছি ভাজা খেয়ে দেখলাম, মন্দ নয়, কিছুটা কাজুবাদামের স্বাদ। বাঁশপোকা ভাজা অনেকটা কুড়মুড়ে কুচো চিংড়ি ভাজার মত। উটপাখির মাংসটা একেবারে অখাদ্য, মনে হল যেন পেনসিল-মোছা রবার চিবোচ্ছি।

খাবারের সঙ্গে চার রকমের পানীয় তরমুজের রস, সনাতন লাল ও সাদা ওয়াইন এবং চাইনিজ রাইস ওয়াইন বা চৈনিক ধেনো। শেষের পানীয়টি বিলক্ষণ কড়া, তবে স্বাদে সর্বোৎকৃষ্ট। গেলাশ খালি করার উপায়

নেই, সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করে দিয়ে যাবে। আরেক বিড়ম্বনা, দুমিনিট অন্তর অন্তর কোনও না কোনও সরকারি হোমড়াচোমড়া পানীয়ের গেলাস হাতে টোস্ট করতে আসবেন। তখন খেতে খেতে উঠে দাঁড়িয়ে ভারত-চিন, পশ্চিমবঙ্গ-ইউনান এবং কলকাতা-কুনমিং সহযোগিতা কামনায় ভাল-ভাল দুচার কথা বলতে হবে। খেতে খেতে এতবার উঠে দাঁড়াতে হলে পানভোজনে সুখ থাকে না।

এদেশে পৌঁছনর সময় কুনমিং শহরটাকে দেখা হয়নি, ফেরার পথে সেই সুযোগ হল। সমৃদ্ধশালী আধুনিক শহর, চওড়া চওড়া রাস্তা, আকাশছোঁয়া বাড়ি। আমাদের দলের একজন জানালেন, এখানে দরিদ্র বসতিও আছে, তবে সেসব জায়গায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে না। আবার একটি এলাহি মধ্যাহ্নভোজনের পরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল শহর থেকে মাইল চল্লিশ দূরের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেখানে সরকারি উদ্যোগে পাশাপাশি অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে। একটা বিশ্ববিদ্যালয়, কুনমিং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনলজি, প্রায় পুরোটাই তৈরি হয়ে গেছে, সেটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। আমেরিকার যে কোনও বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস যেরকম হয়, এটাও সেরকম। দু'চারজন মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে আলাপ হল, সকলেই আমেরিকা-ক্যানাডা ফেরত। ইউনানের মত পিছিয়ে পড়া প্রত্যন্ত প্রদেশেও উচ্চশিক্ষার এই মহোৎসব দেখে মুগ্ধ হতেই হবে। এর তুলনায় আমাদের বারাসাত-গৌড়বঙ্গ নেহাতই গ্রাম্য পাঠশালা। তবে এই বিপুল কর্মযজ্ঞের জন্য যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দরকার সেটা কৃষকদের উচ্ছেদ করেই যে জোগাড় করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ভারতে এখন আর এটা সহজে সম্ভব নয়।

কুনমিং শহরের রাস্তায় দুটি ভিখারিণীকে দেখলাম। শিশু সন্তান পিঠে বেঁধে তারা ভিক্ষা করছিল। এদেশেও তবে ভিখারী আছে। রাত হল। একটু পরেই ফেরার প্লেন। যে দোভাষী মেয়েটি শুরু থেকেই আমাদের সঙ্গে ছিল, সে বাড়িতে মায়ের কাছে তার পাঁচ বছরের ছেলেকে রেখে এসেছে। স্বামী ইঞ্জিনিয়র, দূরে থাকে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পাঁচ বছরের বাচ্চা বাড়িতে রেখে এতদিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছ, তোমার খারাপ লাগছে না? সে ম্লান হেসে বলল, মাই প্লেজার। ওপর থেকে ওইরকমই বলার নির্দেশ এসেছে।

(৩)

ভাবছিলাম, ইয়োরোপ ও এশিয়ার এই দুই সমাজতন্ত্রের প্রাক্তনীর মধ্যে মিল কতটুকু? কতটাই বা অমিল? এটা পরিষ্কার যে, চিনের তুলনায় স্লোভেনিয়ার সমাজে সাম্য অনেক বেশি। শুধু আর্থিক সামর্থে নয়, সামাজিক ভেদাভেদের দিক থেকেও। অর্থনীতির তথ্যও সেই কথাই বলছে। এটা ঠিক যে, বর্তমান চিনে যত সংখ্যক বড়লোক আছে, স্লোভেনিয়ায় তার সিকির সিকিও নেই। কিন্তু স্লোভেনিয়ায় কেউ অভুক্ত থাকে না, কাউকে ভিক্ষা করতে হয় না। সকলের জন্যই পাকাপোক্ত সামাজিক নিরাপত্তা আছে। আর চিনে আমি নিজের চোখেই তো ভিখারিণী দেখে এলাম। এই অমিল কিছুটা ইয়োরোপের সঙ্গে এশিয়ার সংস্কৃতির তফাৎ থেকে এসেছে। কিন্তু এখানে ইতিহাসেরও একটা মুখ্য ভূমিকা আছে। ঐতিহাসিকভাবে, সমাজতন্ত্র আসার আগে, চিনে যতটা অসাম্য ছিল, মধ্য ইয়োরোপে ছিল তার থেকে ঢের কম। প্রশ্ন উঠছে, সমাজতন্ত্র কি তাহলে ইতিহাসের বিরুদ্ধে গিয়ে সমাজের অনেক দিন ধরে জমে থাকা ভুল-ভ্রান্তিগুলো আদৌ শুধরোতে পারে?

দুই বাঙালি নোবেলজয়ীর দুটি বই

আনসার্টেন গ্লোরিঃ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস্ কনট্রাডিকশন্স, জঁ দ্রেজ ও অমর্ত্য সেন

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অর্থনীতি চর্চাকে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা হিসেবে দেখেননি। বিমূর্ত গণিত কিংবা কায়াহীন দর্শনের মত যে-তাত্ত্বিক অর্থশাস্ত্র দীক্ষিত মানসে বিশুদ্ধ চিন্তার আনন্দ উৎপাদন করে, তাতে তাঁর রুচি নেই, একথা বলা যাবে না। কিন্তু তাঁর অর্থনীতি-বোধ, সেই নিরাপদ গাঁটগুলোকে, ইতরজনের বর্ণনায় 'বানানো' সমস্যাগুলোকে, অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের কাজে লাগে এমন একটা আর্থ-সামাজিক ধারণায় বহুদিন হল পৌঁছেচে। তিনি যখন সেই ধারণা থেকে লেখেন, তখন তাঁর ভূমিকা ধর্মপ্রচারক পাদরিদের থেকে খুব একটা আলাদা নয়। যদিও নিজেকে তিনি নির্ভেজাল যুক্তিবাদী হিসেবে ভাবতে ভালবাসেন, একটু নজর করে দেখলেই বোঝা যাবে তাঁর চিন্তায় যুক্তিবাদিতার সঙ্গে একটা প্রখর ন্যায়বোধের মিশেল ঘটেছে। যুক্তি দিয়ে সেই ন্যায়বোধের নাগাল পাওয়া যাবে না, সেই ন্যায়বোধের ভিত আসলে মানবিকতার প্রতি এক অটল বিশ্বাসে প্রোথিত। এই বিশ্বাসের ধরন গূঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাস থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়। বিশেষত এই কারণে যে, প্রথাগত ঈশ্বর-বিশ্বাস না হোক, শুভ ও অশুভ-র একটা গভীর বোধ ছাড়া মানবিকতার প্রতি এই অচল প্রত্যয় সম্ভব হতো না।

আর একটা ব্যাপারে পাদরিদের সঙ্গে তাঁর মিল। ধর্মপ্রচারকদের মত তিনি একই বার্তা বারবার জনমানসে পৌঁছে দিতে চান। পুনরাবৃত্তিতে তাঁর ক্লান্তি নেই, বরং পুনরাবৃত্তিটাই তাঁর উদ্দেশ্য। এই কাজে বেলজিয়ান-ভারতীয় অর্থনীতিবিদ জঁ দ্রেজকে তিনি সঙ্গে পেয়েছেন। ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে এটা যৌথভাবে তাঁদের তৃতীয় বই। বইগুলোর মূল বক্তব্য মোটের ওপর একই রকম।

অমর্ত্য সেন-জঁ দ্রেজ বাজার অর্থনীতির ওপর আস্থাহীন নন। বস্তুত, নব্বই দশক থেকে বাজারকে ভিত্তি করে ভারতীয় অর্থনীতিতে যে জোয়ার এসেছে এঁরা তার তারিফ করেন। কিন্তু বাজার-ভিত্তিক আয়বৃদ্ধির সুফল, অঙ্কের হিসেবে তা সে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, সমাজের সব স্তরে যে পৌঁছয়নি সেই বাস্তবটা দ্রেজ-সেন আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিতে চান। ফলত, উন্নত, উন্নতিশীল এবং দ্রুত উন্নতির পথে উপনীত দেশগুলির তুলনায় গড় ভারতীয়দের জীবনযাপনের মান লজ্জাজনকভাবে নিম্নস্তরের। গত দশক জুড়ে আমাদের আয়বৃদ্ধির হারটাই কেবল বেশি, মাথাপিছু আয়ের মান সহ আর সব কিছুর নিরিখেই আমরা পিছিয়ে রয়েছি। বিশেষ করে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এই দুই অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের নিরিখে গড় ভারতীয়দের অবস্থাকে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা চলে। এখনও ২৬ শতাংশ ভারতীয় নারী নিরক্ষর, আমাদের দেশে এখনও শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ৪৭ (চিনে ১৩, ব্রাজিলে ১৪, রাশিয়ায় ১০), পুষ্টির অভাবে এখনও ৪৮ শতাংশ ভারতীয় শিশু ঠিকমত বেড়ে উঠতে পারে না, প্রতিবেশি বাংলাদেশেও যেখানে মাত্র ৮.৪ শতাংশ মানুষ শৌচালয়হীনভাবে বাস করেন, ভারতে সেখানে সংখ্যাটা ৫৫ শতাংশ। আরও দুশ্চিন্তার কথা হল, বাজার অর্থনীতির পথ ধরে কিছু ভারতীয় গত কুড়ি বছরে নিজেদের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছেন, কিন্তু বিশ্বায়নের সুফল এখনও তেমনভাবে বেশিরভাগকে স্পর্শ করেনি। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজে অসাম্য বেড়েই চলেছে।

এই দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উপায়টা, দ্রেজ ও সেন-এর মতে, মুক্ত বাজার ব্যবস্থা থেকে আসবে না। এর জন্য রাষ্ট্রকে আলাদা করে এগিয়ে আসতে হবে। এখানেই আমাদের সমস্যা। দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভারতে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে রাষ্ট্রের খরচ সব থেকে কম। ভারতীয় রাষ্ট্র মোটামুটিভাবে জাতীয় আয়ের মাত্র ১.২ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে এবং মাত্র ৩.৩ শতাংশ শিক্ষাখাতে খরচ করে। চিন, ব্রাজিল

অথবা রাশিয়ার মত দ্রুত উন্নতিশীল দেশে এই অনুপাতগুলো আমাদের তিন-চার গুণ। কিন্তু সমস্যাটা কেবল শিক্ষা বা স্বাস্থ্য খাতে খরচ বাড়ালেই চলে যাবে না। কম খরচ ছাড়াও আমাদের একটা বড় সমস্যা দুর্নীতি। যে টাকাটা গরিবদের জন্য রাষ্ট্র খরচ করছে, আসলে যে তার একটা ছোট ভগ্নাংশ গরিবদের কাছে পৌঁছচ্ছে, এটা আমরা সকলেই জানি। অর্থাৎ এটা নিয়েও চিন্তার অবকাশ আছে।

এসব কথা যে একেবারে নতুন তা নয়। তবু দ্রেজ ও সেন এই বিপুল সমস্যাগুলোর কথা, ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির এই গভীর লজ্জাজনক দিকগুলোর কথা, আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চান, যাতে আমরা ওপরতলার কতিপয় সৌভাগ্যবানের আয়বৃদ্ধির গৌরবে মোহাবিষ্ট হয়ে দেশের প্রকৃত চিত্রটা ভুলে না যাই। সন্দেহ নেই, সাধু প্রচেষ্টা। তবু কিছু তর্ক থেকেই যাবে।

দ্রেজ ও সেনের বিরোধীরা বলবেন, আয়বৃদ্ধিটাই আসল। আয়বৃদ্ধি ঘটলে বাকি সমস্যাগুলো আপনা থেকেই উধাও হয়ে যায়। যেমন পূর্ব এশিয়ায় হয়েছে। বাজার খুলে যাওয়ার ফলে শ্রমের চাহিদা বেড়েছে, ফলে সেসব দেশে মজুরি বেড়েছে, মানুষের অবস্থাও ভালো হয়েছে। তাছাড়া আয়বৃদ্ধি না হলে কর-সংগ্রহ হবে কোথা থেকে? রাষ্ট্রই বা খরচ করবে কী করে? অর্থাৎ আয়বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়াটাই রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ। আর একটা তর্ক শিক্ষার বেসরকারিকরণ নিয়ে। কিছু কিছু সমীক্ষা বলছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় কম খরচে ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি শেখাচ্ছে। তাই কেউ কেউ বলছেন, সরকারি ইস্কুলের কী প্রয়োজন? গরিব মানুষের হাতে কিছু টাকা কিংবা সমমূল্যের কুপন পৌঁছে দিলেই তো হয়, যা দিয়ে তাঁরা বেসরকারি ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারেন। একই যুক্তি স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ নিয়েও দেওয়া যায়। এইসব তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকবে, কিন্তু তা বলে এই বইটির গুরুত্ব খর্ব করা যাবে না।

বিকল্প বিপ্লব, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাতী ভট্টাচার্য

গরিবদের নিয়ে বই। তত্ত্বভুক বাঙালি যদি এর মধ্যে কোনো গ্র্যান্ড থিয়রির সন্ধান করেন, হতাশ হতে হবে। বস্তুত, একটাই সর্বজনীন তত্ত্ব দিয়ে যে সবকিছুর ব্যাখ্যা করা যায় না, যেমন এমন কোনো সর্বরোগহর ওষুধ নেই যা দিয়ে সব অসুখের চিকিৎসা চলে, এটাই লেখকদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, বার্তা কথাটায় আপত্তি না থাকলে, তাই। রাষ্ট্রবিপ্লব নয়, প্রশাসনের আমূল খোলনলচে বদলে দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে না, লেখকরা বলছেন, ছোট-ছোট পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই গরিবি হটানোর লক্ষ্যে অনেকটা এগোনো সম্ভব। অর্থনীতিমনস্ক পাঠক, যাঁরা ভাবনার মেরুকরণে অভ্যস্থ, যাঁরা কখনো পড়েন মুক্ত বাজার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে, আবার কখনো পড়েন রাষ্ট্র নাক গলালেই গরিব মানুষের আর কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, তাঁদের কাছে বইটির অবস্থান বিলক্ষণ নতুন ঠেকবে।

বইএর বিষয়টি অবশ্য পুরোনো। ভারতের মতো দেশে কী করে দারিদ্র্য কমানো যায় এই প্রশ্নটাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বইটির নাতিদীর্ঘ রচনাগুলির ইন্ধন। দারিদ্র্য কমানো মানে শুধু গরীবদের আয় বা ভর্তুকি বাড়ানো নয়, তাদের লেখাপড়া শেখানো, স্বাস্থ্যবিধির প্রাথমিক নিয়মগুলো রপ্ত করানো কিংবা তার থেকেও দরকারি, দারিদ্য দূরীকরনের সমস্যাগুলো ঠিক কোথায় সেটা সঠিকভাবে জানা। সমস্যাগুলো বুঝতে পারলে তবেই তো সমাধান।

লেখকদের একজন নামজাদা গবেষক-অধ্যাপক, অন্যজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক। অধ্যাপক-সাংবাদিকের যুগলবন্দীতে সাধারণ পাঠকের জন্য অর্থনীতির বই আমরা এর আগে ইংরেজি ভাষায় পেয়েছি। প্রায় এক যুগ আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অর্থনীতিবিদ এবং নিউ ইয়র্ক সহরের এক সাংবাদিক মিলে ফ্রিকোনোমিক্স বলে যে বইটি লিখেছিলেন সেটি সারা পৃথিবীতে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তার সঙ্গে অবশ্য এই বইটির কিছু মৌলিক অমিল আছে। সুমো কুস্তিগিরদের জোচ্চুরি থেকে শুরু করে আইন-শৃঙ্খলার উপর গর্ভপাত বৈধকরনের প্রভাব, বিচিত্র সব বিষয় ফ্রিকোনমিক্স-এর বিচরণভূমি, তুলনায় বর্তমান বইটি

একমুখী, এর মূল বিষয় দারিদ্র্য। আবার ফ্রিকোনমিক্স-এর লেখকরা যেমন বই লেখার জন্যই পরিচ্ছেদগুলি লিখেছিলেন, বর্তমান বইটি তেমনভাবে লেখা হয়নি। এর সব কটি নিবন্ধই বিভিন্ন সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রিকায় আগে প্রকাশিত, কোনোটি একার নামে, কোনোটি দুজনের নামে, যৌথভাবে। অভিজিৎ বিনায়কের একক লেখাগুলির মূল ইংরেজিতে, সেগুলি স্বাতী ভট্টাচার্য অনুবাদ করে নিয়েছেন। সংবাদপত্রের জন্য লেখা হওয়ার ফলে নিবন্ধগুলি সংক্ষিপ্ত। স্বল্প পরিসরের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখকরা খুব বেশি গভীরে যেতে পারেননি। আবার কোনো কোনো রচনায় তাৎক্ষণিক কিছু প্রসঙ্গ এসেছে এই মুহূর্তে যাদের আর ততটা গুরুত্ব নেই, যেমন অণ্ণা হাজারে কিংবা তাঁর প্রস্তাবিত লোকপাল বিল। তুলনায়, উনিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকাটি, যা এই বই-এর জন্যই লেখা হয়েছে, ঢের সন্নিবদ্ধ, গভীর এবং মূল্যবান। আর একটি চমৎকার ব্যতিক্রম 'দারিদ্র্যের সংখ্যা, সংখ্যার দারিদ্র্য' নামক দীর্ঘতর প্রবন্ধটি। তার প্রসঙ্গে একটু পরেই আসব।

বইটি শুরু হয়েছে গণতন্ত্রের অপরিহার্যতার কথা দিয়ে। লেখকরা বলছেন, ভারতবর্ষে গণতন্ত্র অসাধ্যসাধন করেছে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও কি ভাবা যেত দেশের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীরা উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবার থেকে নাও আসতে পারেন? এখন যে উচ্চবর্ণের শিল্পপতিরা নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করছেন সেটা তো তাঁর জাত দেখে নয়, তাঁর কর্মক্ষমতা দেখে। লেখকদের মতে এটা গণতন্ত্রের ফলেই সম্ভব হয়েছে। তাঁদের মতে, গণতন্ত্রের ফলেই নির্বাচন কমিশন তার বৈধতা বাড়াতে পারছে, পঞ্চায়েত কাজ করতে পারছে, সমাজে মহিলারা আগের তুলনায় অনেক বেশি জায়গা করে নিতে পারছেন, আদালত দরকার মতো রাষ্ট্রকে ধমক দিতে পারছে।

পড়তে পড়তে নানা প্রশ্নে মনটা ভরে ওঠে। গণতন্ত্র গরিবদের জন্য কতটুকু করতে পেরেছে? এটাও তো অজানা নয় যে, বড়লোক দেশে গণতন্ত্র যতটা সুষ্ঠুভাবে কাজ করে, গরিব দেশে ততটা করে না। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নানা ফাটল—টাকা চুরি, স্বজনপোষণ, অকর্মণ্যতা। আর ভারতবর্ষের আদালতের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল—অসংখ্য আসন বিচারক শূন্য, আড়াই কোটির ওপর মামলা ঝুলে আছে। সব থেকে বড় কথা, বিচারব্যবস্থা এতটাই খরচসাপেক্ষ যে গরীবরা তার সুযোগ নিতে পারে না। লেখকরা এসব জানেন না, এমন নয়। তাঁরা বলবেন, এত কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতীয় গণতন্ত্র যা দিয়েছে সেটা মূল্যবান। আর যা যা দিতে পারেনি সেটা কেমন করে পাওয়া যায় তা নিয়েই বই-এর বাকি অংশটা, অর্থাৎ সিংহভাগ।

লেখকরা সত্যসন্ধানী, কোনো বিশেষ তত্ত্ব বা মতাদর্শকে রক্ষা করার দায় তাঁদের নেই। তাঁদের কাছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূল্য সবার ওপরে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে অগ্রাহ্য করলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে তা নিয়ে একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রচনা 'দারিদ্র্যের সংখ্যা, সংখ্যার দারিদ্র্য'। দারিদ্র্যের সংখ্যা সংক্রান্ত সমস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে উপেক্ষা করে বিরোধী এবং মিডিয়া এক সময় ধুয়ো তুলেছিল, যোজনা কমিশনের দেওয়া দরিদ্রের সংখ্যা এবং অনুপাত অলীক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ২০১১ সালে যোজনা কমিশন ধার্য করেছিল, দারিদ্র্যসীমা শহরে ৩২ টাকা এবং গ্রামে ২৬ টাকা। বিরোধী এবং সাংবাদিকরা বললেন, এত কম টাকায় কেউ বাঁচতে পারে না। দারিদ্র্য কম দেখানোর জন্য দারিদ্র্যসীমা ইচ্ছে করে কমিয়ে রাখা হচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য অন্তত ৮০ থেকে ১০০ টাকা দৈনিক দরকার। কথা হচ্ছে, দারিদ্র্যসীমা ৮০ টাকা ধার্য হলে মহারাষ্ট্র বা গুজরাতে যে মানুষটি দৈনিক ৭৫ টাকা খরচ করে বেঁচে আছেন আর বিহার বা ছত্তিসগড়ে যিনি দৈনিক ২০ টাকা খরচ করে জীবনধারণ করছেন এঁদের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না। দুজনেই সরকারের কাছ থেকে সমান হারে ভর্তুকি পাবেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, দারিদ্র্যসীমা যদি ৮০ টাকা ধার্য হয় তাহলে মহারাষ্ট্র বা গুজরাতে দরিদ্রের অনুপাত বিহার বা ছত্তিসগড়ে দরিদ্রের অনুপাতের কাছাকাছি চলে যাবে, ফলে কেন্দ্রের কাছ থেকে সব কটি রাজ্যই সমান অনুদান পাবে। কিন্তু সেটা হবে চরম অন্যায় এবং এই অন্যায়টা ঘটছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিলব্ধ সংখ্যাকে অগ্রাহ্য করার ফলে।

বই-এর বাকি অংশটা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুশাসন এবং উন্নয়নের বিতর্ক এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শিক্ষা বিষয়ে লেখকদের মূল অভিযোগ, সরকার প্রাথমিক ইস্কুলের পেছনে প্রভূত টাকা খরচ করছে বটে

কিন্তু সরকারি ইস্কুলে ছেলেমেয়েরা প্রায় কিছুই শিখছে না। ক্লাশ ফোরের বাচ্চারা ক্লাশ টু-এর অঙ্ক পারছে না, তারা এমনকি ঠিকমত পড়তেও শিখছে না। লেখকদের প্রস্তাব, মাস্টারমশাইদের আয়ের একটা অংশ তাঁদের ছাত্ররা কতটা শিখছে তার ওপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হোক। আসল কথাটা হল ইনসেনটিভ বা উৎসাহ। শিক্ষা হোক, স্বাস্থ্য হোক বা শাসন, দেখতে হবে যিনি বা যাঁরা একটা কাজের দায়িত্বে আছেন, সেই কাজ করার ব্যাপারে তাঁর বা তাঁদের যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে কিনা। না দেওয়া হলে এমন একটা প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত গড়ে তোলা দরকার যা উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিকে কাজ করার উপযুক্ত উৎসাহ দেবে।

প্রশ্ন উঠবে, এসব কি খুব নতুন কথা? আমরা কি এসব কথা আগে শুনিনি? বস্তুত যেসব সমস্যার কথা লেখকরা বলছেন, যে কোনো পরিশ্রমী, সৎ প্রশাসক বা সমাজসেবীকেই তো তার সম্মুখীন হতে হয়। তাহলে বইটির অবদান ঠিক কোথায়? বইটির আসল অবদান এটাই যে এখানে নিছক একটা মেঠো অনুভূতির ওপর নির্ভর করে কোনো সমস্যা বা তার সমাধানের কথা বলা হচ্ছে না। প্রতিটি সমস্যার বিবরণ ও তার প্রস্তাবিত সমাধানের পিছনে একেবারে প্রথম শ্রেণির গবেষণা আছে। এবং সেই গবেষণা পত্রগুলির বিশদ উল্লেখ বইটিতে বারেবারে করা হয়েছে। এখানেই আর পাঁচটা বইএর সঙ্গে বর্তমান বইটির তফাত।

টুকরো টুকরো ভাবনা

অ-বিশ্বায়ন

আশির দশক থেকে যে বিশ্বায়ন তথা মুক্ত বাজারের প্রভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, যে-প্রভাব বড়োলোক দেশগুলোকে তো বটেই, এমনকি পিছিয়ে পড়া কিংবা ভূতপূর্ব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকেও রেহাই দেয়নি, ইদানীং দেখছি, তাতে বেশ খানিকটা ভাটা পড়েছে। মতাদর্শের এমন দিক-পরিবর্তন অবশ্য নতুন নয়। বিগত ষাট দশকের কথা মনে আসতেই পারে যখন পৃথিবীর বেশ বড় একটা অঞ্চলে সোভিয়েত প্রতাপ অব্যাহত। যখন ভিয়েৎনামে মার্কিনি বর্বরতা চলছে। যখন অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রযুক্তির দিক থেকে বিপুলভাবে পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত স্বদেশের মাটি কামড়ে যুদ্ধরত ভিয়েৎ কংদের জয় হলো। তখন, কিছুদিনের জন্য হলেও, মার্কিনি বর্বরতার পরাজয় ও লাঞ্ছনা, ধনতন্ত্রের ওপরেই সারা পৃথিবীর বিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছিল। সেসব সময়ে মুক্ত বাজারকেও তো অনেকে সন্দেহের চোখে দেখতেন।

তবু তফাৎ একটা আছে। আগে মূলত পিছিয়ে পড়া দেশগুলো মুক্ত বাজারকে সন্দেহের চোখে দেখত, আর মোটের ওপর বড়লোক দেশগুলো পৃথিবী জুড়ে অবাধ বাণিজ্য করতে চাইত। এখন ঠিক উল্টোটা ঘটছে। এখন গরিব দেশগুলোই সারা পৃথিবীর বাজারে মুক্তভাবে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে চাইছে আর বড়লোক দেশগুলো অবাধ বাণিজ্যের ওপর নানারকম বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিচ্ছে।

পঞ্চাশ বছর আগেও গরিব দেশগুলোর উন্নতি-চিন্তায় সমাজতন্ত্রের প্রভাব ছিল। তারা ভাবত, মুক্ত বাজারের ছুতোয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলো এসে তাদের সমস্ত সম্পদ দখল করে নেবে। এই দখলদারির একটা গালভরা নামও দেওয়া হয়েছিল। বাম ভাবাদর্শে দীক্ষিতরা বলতেন এটা হল নয়া ঔপনিবেশিকতা। অর্থাৎ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে যেমন সৈন্য পাঠিয়ে, গায়ের জোরে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো গরিব দেশের সর্বস্ব দখল করে নিয়েছিল, এটা সেরকম নয়। বলা হতো, নতুন ঔপনিবেশিকতার যুগে বড়লোক দেশগুলোর বহুজাতিকরা এসে তাদের মনমোহিনী পণ্যসামগ্রী দিয়ে গরিব দেশগুলোর বাজার দখল করে নিচ্ছে। তারপর সেই সব বাজার থেকে কোটি কোটি ডলার লাভ করে হয় সেই লাভের টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজেদের দেশে কিংবা সেই টাকায় গরিব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো কিনে নিচ্ছে।

নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদ অবশ্য ধোপে টেকেনি। দেখা গেছে, গরিব দেশগুলোর মধ্যে যারা খোলা বাজারের আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের উন্নতি হয়েছে অনেক বেশি। এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ কোরিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন কোরিয়া দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল, উত্তর কোরিয়া রইল সোভিয়েত রাশিয়ার ছত্রছায়ায় আর দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, তখন, সামান্য হলেও, উত্তর কোরিয়াই দক্ষিণের তুলনায় আর্থিক দিক থেকে এগিয়ে ছিল। পরবর্তী ষাট-সত্তর বছরে দক্ষিণ কোরিয়া মুক্ত বাজারের সুবিধে নিয়ে পশ্চিমের দেশগুলোর সমকক্ষ হয়েছে। তার বর্তমান মাথা পিছু আয় ওইসিডি দেশগুলোর কাছাকাছি। তুলনায় সমাজতান্ত্রিক গোঁয়ারতুমি করে বাইরের বাজারের দরজা-জানলা বন্ধ রাখার ফলে উত্তর কোরিয়া এখনও গরিব একটা দেশ, তার মাথাপিছু আয় সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলোর থেকে খুব বেশি নয়। দক্ষিণ কোরিয়ার মতো বাজার-নির্ভর আর্থিক উন্নতির উদাহরণ আরও অনেক আছে।

প্রশ্ন হল, ধনী দেশগুলো কেন আজকাল খোলা বাজারের নীতি থেকে পিছিয়ে আসতে চাইছে? কেন তারা আগের মতো তাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিদেশি পণ্য বা শ্রমিকদের ঢুকতে দিতে রাজি নয়? কেন তারা এমনকি গরিব দেশে বিনিয়োগ করতেও ততটা উদগ্রীব নয় আজকাল?

বস্তুত, একটা দেশের উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি বলতে সেই দেশের গড় উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধিকেই বোঝায় যা আসলে তেমন কিছুই বোঝায় না যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে সেই বাড়তি শ্রী থেকে দেশের মানুষ কে কতটা লাভ করেছে। এমন হতেই পারে, মুক্ত বাজার থেকে যে বাড়তি আয়টা এল, সেটা মাত্র কয়েকজন ধনীর হাতে গেল। বাকিদের অবস্থা একই রইল বা আরও খারাপ হয়ে গেল। সেরকম হলে বড়লোক দেশের সাধারণ মানুষদের মনে স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত নীতির প্রতি একটা বিরূপতা তৈরি হবে এবং সেক্ষেত্রে মুক্ত বাণিজ্যের নীতিকে একদিন না একদিন জনরোষের সামনে দাঁড়াতেই হবে। বস্তুত এটাই হয়েছে এবং সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর অন্যতম বড় উদাহরণ।

পরিসংখ্যান বলছে, গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে, অর্থাৎ যবে থেকে বিশ্বায়নের পৃথিবীব্যাপী বিস্তার ঘটেছে মোটের ওপর তবে থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়বৃদ্ধি যথেষ্ট সন্তোষজনক হারে হয়েছে বটে, কিন্তু তার পাশাপাশি অসাম্যও প্রবলভাবে বেড়েছে। এর একটা কারণ অবশ্যই মুক্ত বাজার। মুক্ত বাজারের ফলে মার্কিন পুঁজি গরিব দেশে, যেখানে সস্তায় কাঁচামাল এবং শ্রমিক পাওয়া যায় সেখানে, আস্তানা গেড়েছে। ফলে মার্কিনি কম্পানিদের মুনাফা বেড়েছে। মার্কিন পুঁজিপতিদের, কিংবা যাদের মার্কিন কোম্পানিগুলোতে শেয়ার আছে তাদের, আয়ও বিপুলভাবে বেড়েছে। অপরপক্ষে, পুঁজি বাইরে চলে যাবার ফলে, আমেরিকার ভেতরে একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। যে প্রশিক্ষিত শ্রমিক বছরে নব্বই কি একশ হাজার ডলার আয় করত তাকে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বছরে পনের হাজার ডলার মাইনেতে কাজ নিতে হয়েছে। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ আয়ের অভিবাসীরা আমেরিকায় থেকে গিয়ে অসাম্য আরও বাড়িয়েছে। বিশ্বায়নের আগে এইরকম অসাম্য ছিল না। তাই অনেকদিন ধরেই বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে জনরোষ দানা বাঁধছিল। সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী সাফল্যের মধ্যে দিয়ে সেই জনরোষ একটা স্পষ্ট অবয়ব পেয়েছে।

একই গল্প ব্রেক্সিট। ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হবার পর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মানুষের যাতায়াত অবাধ হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব ইয়োরোপের গরিব দেশগুলো থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ জার্মানি-ফ্রান্স-ইংল্যান্ডে উন্নততর জীবনের আশায় পাড়ি দিয়েছিলেন। ফলে সেসব দেশে শ্রমের দাম কমেছে, স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে বেড়েছে অসন্তোষ। এরই একটা চরম পরিণতি ব্রেক্সিট, ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের প্রস্থান।

এই প্রক্রিয়া কোথায় গিয়ে থামবে? পৃথিবীটা কি আবার কিছু পরস্পরের সঙ্গে সংযোগহীন দ্বীপের সমষ্টিতে পরিণত হবে? আশা করা যায়, তেমনটা ঘটবে না। ঘটবে না তার কারণ, বিশ্বায়ন থেকে যাদের সব থেকে বেশি লাভ, সেই পুঁজিপতিরাই শেষ পর্যন্ত দেশের নিয়ম-নীতি নির্দ্ধারণ করে, নির্বাচনের পয়সা যোগায়, চাইলে জনমতও তৈরি করতে পারে। এই পুঁজিপতিরাই বিশ্বায়নকে ফিরিয়ে আনবে।

আমিষ-নিরামিষ

গত বছর সস্ত্রীক ভিয়েনা থেকে ফিরছিলাম। এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান। নৈশভোজনের আগে বিমানসেবিকা মেনু দিয়ে গেলেন। দেখলাম, তাতে আমিষ-নিরামিষ দু'রকম ব্যবস্থারই উল্লেখ রয়েছে, যে কোনও একটা বেছে নিতে হবে। আমিষের মধ্যে আবার দু'টি বিকল্প—চিকেন ও ল্যাম্ব। আমাদের দু'জনের জন্য দু'টি ল্যাম্ব অর্ডার দিলাম। খাবার আসার পর দেখি আমাদের দু'থালা নিরামিষ দিয়ে গেছে। বিমানসেবিকাকে জিজ্ঞেস করলাম, নিরামিষ কেন? তিনি নির্বিকার মুখে বললেন, আমিষ ফুরিয়ে গেছে। বললাম, তাহলে মেনুতে আমিষ রাখার দরকার কী? তাছাড়া, আমরা তো ভিক্ষে চাইছি না, নিয়ম মাফিক পয়সা দিয়েই প্লেনে উঠেছি। বিমানসেবিকা নিরুত্তর। বলা দরকার, যাওয়ার পথেও একই সমস্যা হয়েছিল। সেবার অনেক বাকবিতণ্ডার পর অন্তত দু'প্লেট চিকেন পাওয়া গিয়েছিল। এবার সেটাও জুটল না।

সময় রক্ষার ব্যাপারে না হোক, খাওয়ানোর ব্যাপারে কিন্তু এক সময় এয়ার ইন্ডিয়ার সুনাম ছিল। আতিথেয়তার ব্যাপারেও। মনে পড়ল, কয়েক বছর আগে লণ্ডন থেকে ফেরার সময় এয়ার ইন্ডিয়ার রাত্তিরের উড়ান যান্ত্রিক কারণে বাতিল হয়ে গেল। পরের দিন বিকেলে ফ্লাইট। রাত্তিরটা হোটেলে থাকতে

হবে। আমার অতীত অভিজ্ঞতা বলে, ইয়োরোপ-আমেরিকার কোনও বিমান কম্পানি হলে সম্পূর্ণ অচেনা অন্য কোনও যাত্রীর সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করে রাত কাটাতে হতো। এয়ার ইন্ডিয়ার কিন্তু মহারাজসিক মেজাজ। এয়ারপোর্ট সংলগ্ন হিলটনে আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হল। প্রত্যেক যাত্রীর আলাদা আলাদা ঘর তো বটেই, তার ওপর ঘরগুলো রীতিমত বিলাসবহুল। পরদিন সকালে হোটেলেই এলাহি ইংলিশ ব্রেকফাস্ট, ফ্লাইট ধরার আগে এয়ারপোর্টে লাঞ্চ। এককথায়, নিখুঁত আতিথেয়তা। সেই এয়ার ইন্ডিয়ার হঠাৎ হলটা কি?

ভেবে দেখলাম, কম্পানির অবস্থা খারাপ হয়েছে বলে রাতারাতি খরচ কমানোর চেষ্টা চলছে—ব্যাপারটা মোটেই এরকম নয়। আমিষের বদলে নিরামিষ খাইয়ে ক'টা টাকা বাঁচবে? যতদূর মনে হয়, ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে, নিরামিষের প্রসার ঘটাতে হবে। এটা হিন্দুত্বের প্রসার ঘটানোরই একটা অঙ্গ। সেই নির্দেশ মেনে দেশের অভ্যন্তরীণ উড়ানে জাতীয় কোম্পানি এয়ার ইন্ডিয়া আমিষ পদ পরিবেশন আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন তারা আন্তর্জাতিক উড়ানেও, অন্তত দেশোয়ালিদের জন্য, জোর করে নিরামিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। হিন্দুত্ববাদীদের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, নিরামিষ খাবার কথা তো শুধু হিন্দুত্ববাদীরা বলে না, মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে বহু মনীষী ও বিখ্যাত মানুষ নিরামিষ ভোজনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁদের যুক্তিগুলোও খতিয়ে দেখা দরকার।

নিরামিষাশী বিখ্যাত মানুষদের তালিকাটি দীর্ঘ। গান্ধী-টলস্টয়-থারোদের মতো মিনিম্যালিস্ট বা ন্যূনতমবাদীদের বাদ দিয়েও অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন, আইজ্যাক নিউটন থেকে শুরু করে ঔপন্যাসিক ফ্রানৎস কাফকা, নর্তকী ইসাডোরা ডানকান, সাহিত্যিক জর্জ বার্নাড শ, গায়ক পল ম্যাকার্টনি, টেনিস তারকা মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা ইত্যাদি অনেকেই হয় জীবনের একটা সময় নিরামিষভোজী হয়ে গেছেন অথবা নিরামিষ ভোজনের পক্ষে মত দিয়েছেন। উদরপূর্তির জন্য প্রাণী হত্যা করাটাকে রবীন্দ্রনাথও নিষ্ঠুরতা মনে করেছিলেন।

নিরামিষ ভোজনের পক্ষে নানা রকম যুক্তি শোনা যায়। প্রথম যুক্তিটা গান্ধীজীর মতো ন্যূনতমবাদীদের। এঁরা মনে করেন, মানুষের ঠিক ততটুকুই খাদ্যগ্রহণ করা উচিত বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ন্যূনতম যতটুকু দরকার। অর্থাৎ রসনার তৃপ্তির জন্য খাওয়া-দাওয়াকে এঁরা নৈতিকভাবে অসমর্থনযোগ্য মনে করেন। বিশেষ করে মাংস খাওয়ার মধ্যে যে লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া সুপ্ত আছে, ন্যূনতমবাদীরা বলবেন, সেটা মানুষের আত্মিক উত্তরণের অন্তরায়।

নিরামিষ ভোজনের সমর্থনে দ্বিতীয় যুক্তিটা স্বাস্থ্যভিত্তিক। নিরামিষাশীরা মনে করেন, খাদ্য তালিকা থেকে আমিষ বাদ দিলে শারীরিকভাবে অনেক বেশি সুস্থ ও সবল থাকা যায়। নাভ্রাতিলোভা, মাইক টাইসন বা কার্ল লুইস-এর মত অনেক খেলোয়াড় শুধুমাত্র এই কারণেই নিরামিষাশী হয়েছেন। বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন, নিরামিষ আহার স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক হতে পারে যদি তা কিছু মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে।

তৃতীয় যুক্তি, আমিষ ভোজন মানেই প্রাণী হত্যা আর প্রাণী হত্যা মানেই নিষ্ঠুরতা। সারা পৃথিবী জুড়ে মানব অধিকারের মতো প্রাণীদের অধিকার নিয়েও অনেক গোষ্ঠী এখন সোচ্চার হয়েছে। বর্তমানে এই গোষ্ঠীগুলিই নিরামিষ ভোজনের সব থেকে বড় প্রচারক। তথাকথিত সভ্য মানুষদের চোখে আঙুল দিয়ে তারা দেখিয়ে দিচ্ছে খাদ্য উৎপাদনের নামে মনুষ্যেতর প্রাণীদের সঙ্গে কী প্রবল নিষ্ঠুরতা করা হয়। কৃত্রিম এবং প্রায়শই যন্ত্রণাদায়ক উপায়ে প্রাণীদের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। তাদের শরীর যাতে মেদযুক্ত, কোমল এবং পেশিহীন হয় তার জন্য তাদের স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে দেওয়া হয় না। বস্তুত সর্বভুক মানুষের নিষ্ঠুরতা থেকে কুমির, হাঙর, সাপ, মাছ, ব্যাঙ, পশু, পাখি, সরীসৃপ, কেউই রেহাই পায়নি। এছাড়া, ধর্মীয়, সামাজিক বা ঐতিহ্যগত কারণেও অনেকে আমিষ খান না। এই ধরনের মানুষের সব থেকে বড় সমাবেশ আমাদের দেশে।

নিরামিষ ভোজনের উল্টো যুক্তিও কিছু কিছু আছে। নিরামিষ খেলেই যে আত্মিক উত্তরণ ঘটবে তার স্থিরতা কোথায়? লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যাকারী অ্যাডলফ হিটলার সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলেন, পশুপ্রেমিকও

ছিলেন। গান্ধী-হন্তারক নাথুরাম গডসে ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ, আজীবন নিরামিষাশী ও ব্রহ্মচারী। আবার আপাতদৃষ্টিতে ন্যূনতম খাদ্যগ্রহণের সঙ্গেও যুক্তিগতভাবে আমিষ ভোজনের কোনও বিরোধ নেই। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, পশু সমাজে শক্তিশালী পশু জীবন ধারণের জন্য দুর্বল পশুদের উদরস্থ করে বলেই প্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে। পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা কখনই সমর্থন করা যায় না, কিন্তু নিষ্ঠুরতা না করেও আমিষাশী হওয়া যায়। আর প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে যে অন্যান্য মাংস সহ গোমাংস ভক্ষণের কথাও আছে তা তো আমরা সবাই জানি।

আসল কথাটা হল, আমি আমিষাশী হব, না নিরামিষাশী সেটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। আমার ওপর সেই নির্বাচনটা কেউ চাপিয়ে দিতে পারে না। হিন্দুত্ববাদীরা সেটাই চেষ্টা করছে।

মার্কিন দেশের ভারতীয়

পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও পৃথিবীর গরিব দেশগুলোকে নিয়ে গড়পড়তা মার্কিনি নাগরিকদের তেমন একটা মাথা ব্যথা ছিল না। পশ্চিম ইয়োরোপ, জাপান, খানিকটা তাইওয়ান-দক্ষিণ কোরিয়া-হংকং-সিঙ্গাপুর (যাদের সেই সময় বলা হতো গ্যাঙ অফ ফোর), কিছুটা মধ্যপ্রাচ্য এবং পরাজয়ের গ্লানিময় স্মৃতির কারণে ভিয়েৎনাম—পৃথিবীর এই ক'টা অঞ্চল সম্বন্ধে খবর রাখলেই তাদের কাজ চলে যেত। বস্তুত, মার্কিনিদের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে যাঁরা গ্রামাঞ্চলে থাকতেন, মনে করতেন, আমেরিকাটাই বুঝি পৃথিবী। সুপারম্যান বায়োস্কোপে মহাকাশ থেকে উড়ে আসা তিন সুপার-ভিলেন যেই হোয়াইট হাউস দখল করে নিল, অমনি সবাই ধরে নিল সেই মহাদুষ্টদের বিশ্বজয় সম্পন্ন হয়ে গেছে।

যে সময়ের কথা বলছি, বিশ্বায়নের হাওয়া সারা পৃথিবীতে তখনও এমন করে ছড়িয়ে পড়েনি। বিংশ শতাব্দীর আশির দশক শিগগির শুরু হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ণ মহিমায় বিরাজমান। আর পাঁচটা ভারতীয় যুবকের মতো আমিও উচ্চশিক্ষার আশায় মার্কিন মুলুকে গিয়ে পড়েছি। থাকছি পিএইচডি ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা এগারোতলা বাড়ির তিনতলার একটা ফ্ল্যাটে, আরও দুজন ছাত্রের সঙ্গে। আমাদের বাড়িটা এক মাঝবয়সী মহিলা দেখাশোনা করতেন। মাস গেলে বাড়ি ভাড়ার চেকটা তাঁর হাতেই জমা দিতে হতো।

একটা দুপুরবেলা, তাড়াতাড়ি ক্লাশ শেষ হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরে ভাড়ার চেক জমা দেবার জন্য মহিলার আপিসে ঢুকেছি। ভদ্রমহিলা একা বসে আছেন, মনে হল, কথা বলার মুডে রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'তোমার নাম দেখে তো মনে হচ্ছে ভারতীয়, তা ভারতের কোন অঞ্চল থেকে আসছ?' আমি অভিভূত। আমাকে পাকিস্তানি, বাংলাদেশি, সিংহলি ইত্যাদি না ভেবে ঠিক বুঝে গেছেন আমি ভারতীয়। ইনি নিশ্চয় ভারত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। জানালাম, 'আমি বঙ্গদেশ থেকে আসছি।' আমি 'বেঙ্গল' থেকে আসছি শুনে ভদ্রমহিলা প্রায় আঁতকে উঠলেন। বললেন, 'সে কি! তুমি বাঙালি? বাঙালিরা তো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে!' এবার আমার আঁতকে ওঠার পালা। মাত্র কয়েক মাস হল দেশ ছেড়েছি। আসার সময় দেখে এসেছি বাঙালি জাতি বহাল তবিয়তেই রয়েছে। এই ক'দিনের মধ্যে কী এমন হল?

সবিনয়ে জানালাম, 'বাঙালির বিলুপ্ত হয়ে যাবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বরং যে হারে বাঙালি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা কিছুটা কম হলেই বোধহয় ভাল হতো।' ভদ্রমহিলা কিছুতেই আমার কথা মানবেন না। তিনি খুব নির্ভরযোগ্য কোথাও একটা পড়েছেন, বাঙালি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার কথা তিনি বিশ্বাস করবেন কেন? কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি চলল। আমি বীরদর্পে বাঙালি জাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করে গেলাম আর সেই মাঝবয়সী মার্কিনি মহিলাও তাঁর বিশ্বাসে অনড় রইলেন। মিনিট পাঁচেক এইভাবে চলার পরে রহস্যটা বোঝা গেল। ভদ্রমহিলা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে বাঙালিকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

এই নিদারুণ অজ্ঞানতা এখন আর নেই। বেশ কিছুদিন হলো মার্কিন দেশে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়র-ম্যানেজার-অধ্যাপকদের চাকরির বাজারে শ্বেতকায় মার্কিনিরা বাঙালি তথা ভারতীয়দের উপস্থিতি বিলক্ষণ টের পাচ্ছে।

ভালো ভালো চাকরিগুলো অনেক সময় ভারতীয়রাই নিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এই ভারতীয়দের একটা অংশ ঠিক ভারতীয় নয়। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিনি নাগরিক। অভিবাসী ভারতীয়দের দ্বিতীয় প্রজন্ম, যাদের বাবা-মায়েরা এক সময় নিজের দেশ ছেড়ে আমেরিকায় বসবাস শুরু করেছিল। আর একটা অংশ প্রথম প্রজন্মের ভারতীয় অভিবাসী।

ব্রিটেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবা আফ্রিকার অভিবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মার্কিনি ভারতীয়দের একটা মস্ত তফাত আছে। মার্কিন দেশে ভারতীয় অভিবাসীদের প্রায় প্রত্যেকেই উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেও এরা অত্যন্ত যত্নশীল। ফলে শিক্ষার ব্যাপারটা এখানে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য কোথাও এটা ততটা ঘটেনি। ব্রিটেনে যেমন ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের অনেককেই ট্যাক্সি-চালক, দোকানদার, রেস্টোরান্ট-শ্রমিক কিংবা ঝাড়ুদার হিসেবে কাজ করতে দেখা যায়, মার্কিন মুলুকে তেমন দেখা যায় না।

মার্কিনি ভারতীয়রা উচ্চ শিক্ষিত বলে আর্থিকভাবেও অত্যন্ত সচ্ছল। ইউনাইটেড স্টেটস সেন্সাস ব্যুরো ২০১৬ সালে মার্কিন দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সমীক্ষা করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা মার্কিন দেশের সব থেকে ধনী সম্প্রদায়। তাদের গড় পারিবারিক আয় বছরে ১,২২,০২৬ মার্কিন ডলার। লক্ষনীয় যে, এই আয় সচ্ছলতার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইহুদি গোষ্ঠীর আয়ের থেকেও বাইশ হাজার ডলার বেশি। আমরা এতদিন জানতাম, আমেরিকায় ইহুদিরাই সব থেকে অবস্থাপন্ন এবং প্রতিপত্তিশালী। অ্যামেরিকান সেন্সাস ব্যুরোর সমীক্ষা সেই ধারণা একেবারে পালটে দিচ্ছে। বলাই বাহুল্য, এই অবস্থায় সনাতন মার্কিনিদের পক্ষে ভারতীয়দের সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাটা আর সম্ভব নয়।

আমার এই প্রতিবেদন কিন্তু মার্কিন দেশে ভারতীয়দের অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে নয়, তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি নিয়েও নয়। আমার প্রশ্ন, দেশে থাকলে যে-ভারতীয় পরিবারের বার্ষিক আয় বড়জোর কুড়ি-তিরিশ লক্ষ টাকা অব্দি পৌঁছতে পারত, মার্কিন দেশে গিয়ে সেই আয় আড়াই-তিনগুণ বেড়ে যাচ্ছে কী করে? মার্কিন দেশে গেলে ভারতীয়রা কি আড়াই তিনগুণ বেশি কর্মক্ষম হয়ে যাচ্ছে? এর খানিকটা উত্তর এই যে, বিলেত-আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজে যেখানে ভারত থেকে প্রচুর অদক্ষ শ্রমজীবী মানুষ গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন, সেখানে মার্কিন দেশে ভারতীয় অভিবাসীদের বেশিরভাগই শিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এরা বেশি আয় করবেন এটা স্বাভাবিক। কিন্তু পুরো উত্তর এটা নয়। আসল উত্তর এটাই যে, মার্কিন দেশে এমন একটা কাজের পরিবেশ আছে যেখানে গিয়ে পড়লে নিজের থেকেই কাজের উৎসাহ বেড়ে যায়, কাজে মন আসে। এই পরিবেশ তৈরির পেছনে রয়েছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ, যে প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধগুলি দেশের অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজ ব্যবস্থা সব কিছুকে ধরে রেখেছে। এই প্রতিষ্ঠান-মূল্যবোধগুলি আছে বলে এখানে কঠোর পরিশ্রমের যোগ্য পুরস্কার পাওয়া যায়, দৈনন্দিন জীবনযাপনে দুর্নীতি প্রায় চোখেই পড়ে না, সাধারণ মানুষ একটা ন্যূনতম মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে।

তবে কারণ যাই হোক, তেমন পরিবেশ পেলে ভারতীয়রাও যে কিছু করে দেখাতে পারে, এটা দেখলে গর্ব হয় বৈকি।

তেলের দাম বাড়ছে

তেলের দাম বাড়ছে, বেড়েই চলেছে। শুধু পেট্রলের দাম নয়, ডিজেলের দামও, যে ডিজেল দিয়ে বাস-লরি চলে, চাষের পাম্পসেট চলে। চাষের খরচ বাড়লে, শাক-সব্জী-চাল-গম গ্রাম থেকে শহরে আনার খরচ বাড়লে, খাবারের দাম বাড়ে, ফলে মজুরিও বাড়াতে হয় আর তার জেরে সবকিছুরই খরচ বাড়ে, দাম বাড়ে। কিন্তু যে হারে দাম বাড়ে, সে হারে মজুরি বাড়ে না। ফলে পুজো-পার্বনের আগে সাধারণ মানুষের কেনাকাটা কমে যায়। নাভিশ্বাস ওঠে। আর যেসব দোকানী-ব্যবসাদার সারা বছর সংসার চালানোর জন্য পুজো-পার্বনের কেনাকাটার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদেরও।

দিল্লির সরকার অবশ্য বলছে, তাদের কোনও দোষ নেই, টাকার দাম পড়ছে, হালে অপরিশোধিত তেলের দামও একটু বেড়েছে, ফলে পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ছে। টাকার দাম পড়ে যাচ্ছে এটা ঠিক, সম্প্রতি বিশ্ব-বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম একটু বেড়েছে এটাও ভুল নয়, কিন্তু সত্যিই কি সরকারের কিছু করার নেই? বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার সময়, ক্রুডের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ৬৩৪৩ টাকা। ডলারে এক ব্যারেল ক্রুডের দামকে তখনকার ডলার-টাকা বিনিময় মূল্য দিয়ে গুণ করলে এই সংখ্যাটা পাওয়া যাচ্ছে। এটা ২০১৪ সালের মে মাসের গড় হিসেব। স্মরণ করা যেতে পারে, বিজেপি শপথ নিয়েছিল ২০১৪ সালের ২৬শে মে। এটাও স্মরণ করা যেতে পারে, বিজেপি ক্ষমতায় আসার ঠিক আগে, ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে, দিল্লিতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যেত ৭২.২৬ টাকায় আর এক লিটার ডিজেলের দাম ছিল ৫৫.৪৮ টাকা।

একই ভাবে যদি হিসেব করি তাহলে দেখব, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, অর্থাৎ এখন, এক ব্যারেল ক্রুড অয়েলের দাম হয়েছে ৫০০০ টাকার কিছু কম। কিন্তু, কী আশ্চর্য, দিল্লির বাজারে এই মধ্য সেপ্টেম্বরে এক লিটার পেট্রলের দাম প্রায় ৮১ টাকা ছুঁয়েছে আর লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৭৩ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। অতএব, মানতেই হবে, শুধু ডলারের নিরিখে টাকার দাম কমা কিংবা বিশ্ব বাজারে ক্রুডের দাম বাড়া দিয়ে পেট্রল-ডিজেলের সাংঘাতিক মূল্যবৃদ্ধির ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

এটা এখন প্রায় কারোরই অজানা নয় যে, আমাদের দেশে তেলের দাম বেশি হওয়ার একটা বড় কারণ কেন্দ্র এবং রাজ্য তেলের ওপর অনেকটা কর চাপিয়ে রেখেছে। আগে এতটা কর ছিল না, ফলে তেলের দামও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। বস্তুত, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পেট্রল-ডিজেলের ওপর কেন্দ্রিয় সরকারের আবগারি শুল্ক বা এক্সাইজ ডিউটি বাড়তে বাড়তে একটা অসম্ভব জায়গায় পৌঁছে গেছে। ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ বিজেপি ক্ষমতায় আসার ঠিক আগে, প্রতি লিটারে পেট্রলের ওপর আবগারি শুল্ক ছিল ৯.৪৮ টাকা আর ডিজেলের ওপর মাত্র ৩.৫৬ টাকা। সেই শুল্ক বাড়তে বাড়তে এখন হয়েছে পেট্রলে ১৯.৪৮ টাকা এবং ডিজেলে ১৫.৩৩ টাকা। পেট্রলে দ্বিগুণ শুল্ক বাড়াটা যদি বা হজম করা যায়, চার বছরে ডিজেলের ওপর আবগারি শুল্ক প্রায় সাড়ে চারগুণ বেড়ে যাওয়াটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না, কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষই ডিজেলের মূল ভোক্তা। যখনই বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমেছে তখনই আবগারি কর একটু বাড়ানো হয়েছে, যে কারণে ক্রেতা কখনই দাম কমার পুরো সুবিধেটা পাননি। কিন্তু তেলের দাম যখন বেড়েছে তখন আবগারি শুল্ক সেভাবে আর কমানো হয়নি, ফলে তেলের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

এই দাম বাড়ার পেছনে রাজ্যগুলির ভূমিকা কতটা? অপরিশোধিত তেলের দামের সঙ্গে পরিশোধন ও পরিবহনের খরচ এবং কেন্দ্রিয় আবগারি শুল্ক যোগ করে যেটা দাঁড়াল তার ওপর রাজ্যগুলি ভ্যাট চাপায়। এই ভ্যাটের হার কোথাও কুড়ি শতাংশ, কোথাও পঁচিশ, কোথাও বা তিরিশ বা তারও বেশি। ভ্যাট চাপিয়ে যে সংখ্যাটা দাঁড়ায় সেটাই ক্রেতাদের কাছে তেলের দাম। গত পাঁচ বছরে রাজ্যগুলির ভ্যাটের হার তেমন বাড়েনি, বরং কিছু ক্ষেত্রে কমে গেছে। কিন্তু যেহেতু অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে, আবগারি শুল্ক বেড়েছে, তাই তেলের ভ্যাট থেকে রাজ্যগুলির রাজস্ব আদায়ও বেড়েছে। তারা চাইলে ভ্যাট কমিয়ে তেলের দাম কিছুটা কমাতে পারে। এবং এর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সহ কিছু কিছু রাজ্য লিটার প্রতি এক-দুই টাকা করে ভ্যাট কমিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকারের অনড় মনোভাব, তেলের ওপর আবগারি শুল্ক তারা কমাবে না। কমালে নাকি বাজেট ঘাটতি দেখা দেবে। যেন রাজ্যগুলির বাজেট ঘাটতির সমস্যা নেই।

আসলে রাজ্য ভ্যাটে এক-দুই টাকা কমলে ক্রেতাদের কাছে তেলের দাম ওই এক-দুই টাকাই কমবে। তাতে পেট্রল-ডিজেলের বিপুল মূল্যবৃদ্ধির তেমন একটা সুরাহা হবে না। বিশেষ করে ডিজেলের। আমাদের মনে হয়েছে, চার বছরে ডিজেলের ওপর আবগারি শুল্ক সাড়ে চারগুণ করে দেওয়াটা শুধু অনৈতিক নয়, অযৌক্তিকও বটে। এই শুল্ক অনেকটাই কম হতে পারত, কম হলে ডিজেলের দাম অনেকটাই কমে যেত।

এছাড়া আরও বড় একটা সমস্যা আছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঠিক করল, পেট্রল-ডিজেলের দাম সরাসরি আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বাড়লে দেশের বাজারেও বাড়বে, কমলে, কমবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ক্রেতাদের ওপর দাম বাড়া-কমার অনিশ্চয়তা এসে পড়ল। রাজ্যদের ঘাড়েও, যেহেতু তেল থেকে রাজ্যদের রাজস্ব ভ্যাটের মাধ্যমে মূল দামের শতাংশ হিসেবে আসে। কিন্তু, কী আশ্চর্য, কেন্দ্রিয় রাজস্বে কোনও অনিশ্চয়তা নেই, কারণ আবগারি শুল্ক টাকার অঙ্কে নির্দ্ধারিত, শতাংশে নয়। অর্থাৎ বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বাড়ুক বা কমুক কেন্দ্রিয় সরকারের রাজস্ব একই থাকছে। বাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে অন্যদের ঘাড়ে বাজারের সমস্ত অনিশ্চয়তার বোঝা তুলে দিয়ে নিজে নিরাপদ থাকাটাকে দ্বিচারিতা ছাড়া আর কী বলা যায়?

ভেনিজুয়েলা

আমরা যারা কলকাতায় বসে পেট্রল-ডিজেলের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে পর্যুদস্ত হচ্ছি, ভবিষ্যতে আরও মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি, ক্রমশ বাজারের থলির আয়তনটা ছোট এবং টাকার ব্যাগের সাইজটা বড় করে ফেলতে বাধ্য হচ্ছি, অনেকেই খবর রাখি না, কিছুকাল যাবত ভেনিজুয়েলায় বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধির হার চলছে ১০ লক্ষ শতাংশেরও বেশি। ১০ লক্ষ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি এতটাই উদ্ভট যে একে অনুধাবন করা শক্ত। বোঝার সুবিধের জন্য বলি, যে জিনিসটার দাম এখন ভেনিজুয়েলার মুদ্রা বলিভারে একশ বলিভার, এই রকম মূল্যবৃদ্ধি চললে এক বছর পরে তার দাম হবে ১০ লক্ষ বলিভার। অর্থাৎ হিসেব মতো ভেনিজুয়েলায় এখন প্রতি সপ্তাহে জিনিসপত্রের দাম ডবোল হচ্ছে।

অবশ্য একশ বলিভারে কিছুই পাওয়া যায় না, আমাদের এক টাকা দিলে এই মুহূর্তে সাড়ে তিন হাজার বলিভার পাওয়া যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাজারে যার দাম প্রায় কিছুই নেই। ভেনিজুয়েলায় সাবান-বিস্কুট-পাঁউরুটির মতো সামান্য জিনিসের দাম এখন লক্ষ-লক্ষ বলিভার, কিন্তু সে দামও এমন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে যে, কেউ আর জিনিসের বদলে বলিভার নিতে চায় না। ভেনিজুয়েলায় এখন জিনিসের বদলে জিনিস বিনিময় হচ্ছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেমন হতো।

অথচ কিছুদিন আগেও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে ভেনিজুয়েলার অবস্থা ছিল রীতিমত ঈর্ষণীয়। মাথাপিছু আয়ের নিরিখে অনেক দেশের থেকেই ভেনিজুয়েলা এগিয়ে ছিল। যে কারণে ভেনিজুয়েলা লাতিন আমেরিকার অন্য অনেক দেশের থেকে এগিয়েছিল, বলা হচ্ছে, ঠিক সেই কারণটাই বুমেরাং হয়ে ভেনিজুয়েলার সর্বনাশ ডেকে এনেছে। কথাটা ঠিক না ভুল বোঝার আগে ভেনিজুয়েলার অর্থনৈতিক কাঠামোটা খানিকটা জানা দরকার।

ভেনিজুয়েলার অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হল পেট্রল ও পেট্রলজাত দ্রব্য। বিশ্বের সব থেকে বড় তেলের ভাণ্ডার ভেনিজুয়েলাতে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর বাজারে পেট্রল বিক্রি করে সে দেশের যা কিছু স্বচ্ছলতা। দেশটি একান্তভাবেই রপ্তানি নির্ভর এবং দেশ থেকে ৯৬ শতাংশ রপ্তানি হয় পেট্রল ও পেট্রলজাত দ্রব্য।

সমস্যা হল, দেশে অপর্যাপ্ত পেট্রল আছে বলে ভেনিজুয়েলার প্রায় সমস্ত বিনিয়োগ হয়েছে পেট্রল-শিল্পে। অর্থনীতিবিদরা একে বলেন 'ডাচ ডিজিজ'। নর্থ সী-তে যখন তেল পাওয়া গেল, তখন যেমন হল্যান্ডের প্রায় সমস্ত বিনিয়োগ ছুটে গেল তেল-নিষ্কাশন শিল্পে, যেহেতু সেটাই ছিল সব থেকে লাভজনক, তেমনি একই কারণে বেশ কিছুদিন ধরে ভেনিজুয়েলাতেও দেশি, বিদেশি সব বিনিয়োগের গন্তব্য তেল-শিল্প। এই প্রবণতাকে ডিজিজ বা অসুখ বলা হয়েছে এই কারণে যে, এই প্রবণতার ফলে তেল উৎপাদনকারি দেশটিতে অন্যান্য উৎপাদন ভীষণভাবে মার খায় এবং যেভাবে শুধুমাত্র তেল রপ্তানির ওপর নির্ভর করে দেশের অর্থনীতিটি চলে তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কোনও কারণে পৃথিবীর বাজারে তেলের দাম পড়ে গেলে দেশের সর্বনাশ হয়ে যায়। তাই বলা হচ্ছে, ভেনিজুয়েলার স্বচ্ছলতা ও সর্বনাশ দুটোই তেলের কারণে।

বলা হচ্ছে, কিছুদিন আগেও যখন বিশ্ব বাজারে তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী ছিল, তখন ভেনিজুয়েলার আর্থিক অগ্রগতিও অব্যাহত ছিল। ডলার ভাণ্ডারটি ফুলে-ফেঁপে উঠছিল, বিদেশি বিনিয়োগের জোয়ারে ভেনিজুয়েলার অর্থনীতি ভেসে যাচ্ছিল। ২০১৪ সালে যখন তেলের দাম পড়তে শুরু করল, বলা হচ্ছে, তখন থেকেই ভেনিজুয়েলার সঙ্কটের শুরু। কথাটা আংশিক সত্য, পুরোপুরি নয়। এটা ঠিক যে, বিশ্বের বাজারে তেলের দাম কমে যাবার ফলে ভেনিজুয়েলার রপ্তানি মার খেয়েছিল, কিন্তু সেই সমস্যা তো অন্যান্য তেল রপ্তানিকারি দেশগুলোরও হবার কথা। কই, আর কোথাও তো এমন ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায়নি।

আসল কথা হল, ভেনিজুয়েলায় বহুদিন ধরে কিছু ভ্রান্ত আর্থিক নীতি নেওয়া হচ্ছিল যার ফলে অর্থনীতির ভিতটা ক্রমশই নড়বড়ে হয়ে গেছে। নিম্নগামী তেলের দাম সেই নড়বড়ে ভিতটাকে ধাক্কা দিয়ে একেবারে চুরমার করে দিয়েছে। লক্ষনীয় যে, মূল্যবৃদ্ধি ভেনিজুয়েলার অর্থনীতির বহুদিনের অসুখ। বছরে দশ লক্ষ শতাংশ না হলেও পঞ্চাশ থেকে একশ শতাংশ বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধি এ-দেশে আগেও দেখা গেছে। তেলের দাম যখন বাড়ছিল আর প্রচুর ডলার দেশে ঢুকছিল, ভেনিজুয়েলার সরকার বেপরোয়াভাবে তাদের ঘাটতি বাড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে হুগো চ্যাভেজ ক্ষমতায় আসার পর থেকে সমাজতন্ত্রের নামে অবাধ ভর্তুকি, বাজারের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ, পেট্রলিয়ম সহ প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ ইত্যাদি হটকারি পদক্ষেপ ক্রমশ দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতাকে একেবারে তলানিতে নিয়ে গেছে।

উৎপাদন কমে যাবার ফলে একদিকে যেমন বিপুলভাবে আমদানি নির্ভরতা বেড়েছে, তেমনি সরকারের কর-সংগ্রহ ক্রমশ কমেছে। যতদিন তেলের আয় অব্যাহত ছিল, ততদিন তা দিয়ে সরকার তার ভর্তুকি-জনিত বিপুল খরচের ভার কোনক্রমে বহন করতে পেরেছিল। কিন্তু তেলের আয় হঠাৎ কমে যাবার পর সরকারকে ক্রমাগত নতুন নোট ছাপিয়ে ভর্তুকির দায় সামলাতে হয়েছে। মহা-মূল্যবৃদ্ধির সেই সূত্রপাত। মহা-মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা হল একবার শুরু হলে তাকে আর থামানো যায় না। যত দাম বাড়ছে, তত সরকারকে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আরও নোট ছাপাতে হচ্ছে। একই সঙ্গে বলিভারের নিরিখে ডলারের দাম বাড়ছে, ফলে আমদানিও প্রতি মুহূর্তে মহার্ঘ্যতর হচ্ছে। সাম্প্রতিক ভেনিজুয়েলা ভ্রান্ত সমাজতন্ত্রের করুণ উদাহরণ হয়ে রইল।

মেঘদূত

স্বাধীনতার পর এত দিন কেটে গেল তবু বৃষ্টির দেবতার ওপর আমাদের নির্ভরতা কমল না। প্রতি বছর বর্ষা আসার আগে বৃষ্টি নিয়ে সেই একই রকম আশঙ্কা। কম বৃষ্টি হলে খরা, মাঠ ফেটে ফসল জ্বলে যাবে। বেশি বৃষ্টি হলে জলের নিচে থাকতে থাকতে পচে যাবে ফসল। আর খুব বেশি বৃষ্টি হলে তো বন্যা, প্লাবন। দেশে যদি পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা থাকত তাহলে অন্তত এক দিকটা, অর্থাৎ খরার সমস্যাটা, খানিকটা সামলানো যেত। দুর্ভাগ্যবশত, দেশে সেচ থেকে জল পায় এমন জমি এখনও মোট কর্ষিত জমির অর্ধেকেরও হবে না। অতএব কম নয়, বেশি নয়, একেবারে সঠিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াটা সৌভাগ্যের ব্যাপার, অনেকে বলবেন বিধাতার আশীর্বাদ।

বৃষ্টির খবর এতটাই জরুরি যে প্রতি বছর কেন্দ্রিয় সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ইকনমিক সার্ভে-তে সাধারণত সে বছরের বৃষ্টিপাতের ওপর একটা অনুচ্ছেদ বরাদ্দ থাকে। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়, ঠিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত শুধু যে কৃষিজীবীদের স্বস্তি দেয় তাই নয়, সারা দেশের মানুষকেও স্বচ্ছন্দে রাখে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? ভালো বৃষ্টি হলে ভালো ফসল হবে, কৃষিজীবীর হাতে পয়সা আসবে। সেই পয়সা খরচ হবে জামা-কাপড়, তেল-সাবান, ছাতা-জুতো ইত্যাদি কল-কারখানায় তৈরি হওয়া হাজারটা জিনিসের ওপর। আবার একই সঙ্গে ফসল পর্যাপ্ত হলে ধান-চালের দাম কমবে, শহরের মানুষকেও খাবারের পেছনে কম খরচ করতে হবে। সেই বাড়তি পয়সাটা তাঁরাও সেই কলকারখানায় তৈরি টুকিটাকি জিনিসগুলোর ওপরেই খরচ করবেন। এর ফলে কল-কারখানায় তৈরি জিনিসের চাহিদা বাড়বে,

উৎপাদন বাড়বে, দেশের অনেক বেকার কাজ পাবে, অর্থনীতির বিকাশ দ্রুততর হবে। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায় এই সরল যুক্তিতে ফাঁক আছে।

ভালো করে ভাবলে কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠবে। ফসল ভালো হলে কৃষিপণ্যের দাম কমবে এটা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু কৃষিপণ্যের দাম কমলে কৃষকদের আয় বাড়বে এটা কি জোর দিয়ে বলা চলে? কৃষকের আয় নির্ভর করে দু'টো জিনিসের ওপর কতটা পণ্য তিনি বাজারে বিক্রি করতে পারছেন এবং কী দামে সেই পণ্য তিনি বিক্রি করছেন। বস্তুত, দাম এবং বিক্রির পরিমাণ এই দুইএর গুণফলের ওপর নির্ভর করে কৃষকের আয়। ফসল ভালো হলে বিক্রির পরিমাণ বাড়ে, ফসলের দাম কমে। কিন্তু এই দুইএর গুণফলের কী হয় জানা দরকার। অর্থনীতির তত্ত্ব বলে, দাম কমলেও চাল-গমের চাহিদা ততটা বাড়ে না। অর্থাৎ কোনও বছরে যদি বাড়তি কিছুটা যোগান বাজারে এসে যায় তাহলে সেই পরিমাণটা বিক্রি হতে গেলে দাম অনেকটাই কমতে হবে। বস্তুত যে পরিমাণ বাড়তি যোগান বাজারে এসেছে দামকে কমতে হবে তার তুলনায় অনেকটাই বেশি। অতএব অর্থনীতির তত্ত্ব বলবে, কৃষিপণ্যের যোগান বাড়লে কৃষকের আয় কমে। তাহলে, বৃষ্টি ভালো হলে, ফসল ভালো উঠলে, কৃষকের লাভ হবেই এটা আমরা বলছি কী করে?

প্রশ্নের উত্তরটা একটু জটিল। কৃষির ওপর যাঁরা নির্ভর করেন তাঁদের সকলের অবস্থা অথবা অবস্থান এক রকম নয়। বড়, মাঝারি, ছোট, প্রান্তিক নানা ধরনের কৃষক আছেন, রয়েছেন অসংখ্য কৃষি-শ্রমিক যাঁদের নিজস্ব কোনও জমি নেই, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরের জমিতে চাষ করে পেট চলে যাঁদের। তাছাড়া আছেন ছোট-বড় মধ্যসত্ত্বভোগী। আর সবার ওপরে রয়েছেন সরকার। ফসল ওঠার আগে সরকার ধান-গমের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেন এবং অঙ্গীকার করেন ওই দামে যে-কোনও পরিমাণ ধান বা গম তাঁরা কিনে নিতে প্রস্তুত। উদ্দেশ্য, কৃষিপণ্যের একটা ন্যূনতম দাম যাতে কৃষকরা পান সেটা নিশ্চিত করা। বাস্তবে কিন্তু সব কৃষক সরকারি সংগ্রহ-কেন্দ্র অব্দি পৌঁছতে পারে না। সংগ্রহ-কেন্দ্রগুলো সাধারণত বড় বড় জনপদে অবস্থান করে যাদের থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকদের দূরত্ব বহু বহু মাইল। সামান্য কিছু পণ্য বিক্রি করার জন্য অত দূর যাওয়া ছোট বা প্রান্তিক কৃষকদের পোষায় না। বড় কৃষকদের পোষায় যেহেতু তাঁরা একসঙ্গে অনেকটা পণ্য বিক্রি করেন। আর পোষায় বড় বড় মধ্যসত্ত্বভোগী ব্যবসায়ীদের যাঁরা অনেক ছোট ছোট কৃষকদের দোরগোড়া থেকে পণ্য কিনে সেই পণ্য বিক্রি করেন সরকারি সংগ্রহ-কেন্দ্রে।

বৃষ্টি ভাল হলে, ফসল ভাল উঠলে, বড় কৃষক এবং বড় বড় মধ্যসত্ত্বভোগী ব্যবসায়ীদের হাতে অনেক ফসল আসে। সরকার যেহেতু আগেই দাম বেঁধে দিয়েছেন তাই দাম পড়ে যাবার প্রশ্ন নেই। সেই পূর্ব-নির্ধারিত দামে বেশি ফসল বিক্রি করলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের লাভ বেশি হয়। সেই লাভের ভাগ কিন্তু ছোট চাষী পান না। তাঁরা তাঁদের ফসল বিক্রি করেন গ্রামের স্থানীয় বাজারে যেখানে ভাল ফসল হলে দাম কিছুটা পড়ে যাবারই সম্ভাবনা। দাম পড়ে গেলে অবশ্য কৃষি-শ্রমিকদের লাভ, কারণ চাল-গম তাঁদের বাজার থেকেই কিনে খেতে হয়।

বড় কৃষক এবং বড় বড় মধ্যসত্ত্বভোগী ব্যবসায়ীদের হাতে বাড়তি পয়সা এলে তাঁরা আধুনিক ভোগ্যপণ্য, ফ্রিজ-টিভি-গাড়ি-জামাকাপড় যা কল-কারখানায় তৈরি হয়, আরো বেশি করে কিনবেন। ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে, আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়বে। একই সঙ্গে ছোট কৃষকরা যা যা কিনতে পারতেন, যা সাধারণত অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে তৈরি হয়, তার চাহিদা কমতেও পারে আবার কৃষি-শ্রমিকদের থেকে চাহিদা বাড়ার কারণে বাড়তেও পারে। কিন্তু আধুনিক সমাজের শ্রীবৃদ্ধি যেহেতু আধুনিক ভোগ্যপণ্যের বৃদ্ধির ওপরেই নির্ভর করে তাই মোটের ওপর কৃষি ভালো করলে শিল্পেরও উন্নতি হবে।

অশোক মিত্র-র অর্থনীতি

সদ্য-প্রয়াত বামপন্থী অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রকে বাঙালি আমজনতা বামপন্থী হিসেবে যতটা চিনত, অর্থনীতিবিদ হিসেবে ততটা নয়। বস্তুত, সক্রিয় রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় সরে আসার পর সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল মূলত কিছু সংবাদপত্র এবং কিছু কিছু লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যবর্তিতায়, যেসব

জায়গায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। তাঁর বাঙলা ও ইংরেজি উত্তর-সম্পাদকীয়গুলির বেশ বড় একটা পাঠক গোষ্ঠী ছিল। এই পাঠক গোষ্ঠী শুধু যে তাঁর লিরিকাল ভাষার অনুরাগী ছিল তাই নয়, সমাজের বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ, কশাঘাত এবং ব্যাঙ্গবিদ্রুপগুলোকে তারা বিলক্ষণ তারিফ করত। লেখার মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর যে একগুঁয়ে বামপন্থী সত্তাটা বেরিয়ে পড়ত, তাকেও। পাঠকদের মধ্যে যারা একটু বেশি ওয়াকিবহাল, তারা জানত একসময় অশোক মিত্র অর্থনীতির প্রথম নোবেল-লরিয়েট জ্যান টিনবার্গেন-এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেছেন, নামজাদা কিছু প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন, বিশ্বব্যাঙ্ক-এ অর্থনীতিবিদের চাকরি করেছেন, ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন, অ্যাগ্রিকালচারাল প্রাইস কমিশনে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন। আমজনতার মনে সম্ভ্রম জাগানোর পক্ষে এই যথেষ্ট ছিল, অর্থশাস্ত্র কিংবা ভারতীয় অর্থনীতি চর্চায় অশোক মিত্র-র অবদান ঠিক কী বা আদৌ আছে কিনা তা নিয়ে সাধারণ লোকের মাথা ঘামানোর কথা নয়।

লক্ষনীয় যে, বর্তমান সারস্বত সমাজও, অর্থাৎ আজকের যুগের অধ্যাপক-গবেষক-অর্থবিজ্ঞানী-সমাজবিজ্ঞানীরাও, অশোক মিত্রকে মূলত সংবাদপত্রের কলাম লিখিয়ে হিসেবে মনে রেখেছে। এর প্রতিফলন দেখি প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একটি সাম্প্রতিক খোলা চিঠিতে যেখানে অশোক মিত্রকে তিনি অর্থনীতিবিদদের মধ্যে নয়, সাংবাদিকদের মধ্যে জায়গা দিয়েছেন। বলা যেতেই পারে, ভাল সাংবাদিকদের মধ্যে জায়গা পাওয়ার ভেতর অগৌরবের কিছু নেই, বলা যেতেই পারে, শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের বিবেচনা অনুযায়ী অশোক মিত্রের কাজের একটি সৎ মূল্যায়ন করেছেন মাত্র, তবু খটকা থেকে যায়, অশোক মিত্রকে অর্থনীতিবিদ না বলে সাংবাদিক বলাটা কি ঠিক হল?

অশোক মিত্র, একথা মানতেই হবে, বিশুদ্ধ অর্থনীতির বই দু'একটার বেশি লেখেননি। মূলস্রোত অর্থনীতির সংকলন অথবা জার্নালগুলোতেও তাঁর লেখা খুব বেশি পাওয়া যাবে না। অর্থনীতির ওপর তাঁর শেষ এবং বলতে গেলে প্রধানতম কাজ Terms of Trade and Class Relations। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশাল সায়েন্স রিসার্চ-এর একটি বৃত্তি নিয়ে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল জুড়ে এই বই-এর কাজটা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। কাজটা ১৯৭৭-এ বই হয়ে বেরোয়। এর পর থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী হয়েছেন, সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লিখেছেন, কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থনীতি চর্চায় আর কখনও ফিরে আসেননি। প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই স্বল্প কাজের জন্য তাঁকে অর্থনীতিবিদ আখ্যা দেওয়া যায় কি?

প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আগে ষাট-সত্তর দশকের ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটা বোঝা দরকার। ষাট-সত্তর দশক জুড়ে আমাদের উৎপাদন শিল্পে মন্দা চলেছিল, শিল্পের বৃদ্ধি ঠেকেছিল তলানিতে। এর একটা চলতি ব্যাখ্যাও ছিল। বলা হত, আমাদের গরিব দেশের সঞ্চয় কম, যা উৎপাদন হয় তার বেশিরভাগটাই আমরা খেয়ে ফেলি, কাজেই নতুন মূলধন, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি বা কলকারখানা, যা দিয়ে নতুন উৎপাদন হতে পারত, যথেষ্ট তৈরি হয় না। ফলে উৎপাদনও তেমন বাড়ে না, দেশের স্থবিরতাগ্রস্ত শিল্পক্ষেত্রটি কোনোক্রমে টিকে থাকে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্থবিরতার দাবাই সঞ্চয় বাড়ানো, দেশের মূলধন বাড়ানো। সেই অভিজ্ঞান নিয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই সরকারি চেষ্টায় ভারি শিল্পের উৎপাদন শুরু হল। মস্ত বড় বড় ইস্পাত কারখানা বসল। বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরমাণু শক্তি উৎপাদন সব কিছুরই উদ্যোগ নেওয়া হল, যাতে উৎপাদক শক্তির অভাবে শিল্পের বৃদ্ধি কমে না যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এত চেষ্টা সত্ত্বেও শিল্পের স্থবিরতা কাটল না।

১৯৭০ সালের একটি গবেষণা পত্রে অধ্যাপক অমিয় বাগচি দেখালেন, দেশ জুড়ে প্রচুর উৎপাদক শক্তি অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে, জিনিসপত্র, বিশেষ করে সাধারণ মানুষ যেসব শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করেন, সেগুলো অনেকাংশেই অবিক্রিত রয়েছে, কাজেই মূলধন বা উৎপাদক শক্তির অভাবে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা চলছে এটা মনে করা ঠিক নয়। সেই প্রথম, যোগানের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে চাহিদার অভাবকে শিল্পের প্রতিবন্ধক

হিসেবে চিহ্নিত করা হল। ঠিক কী কারণে চাহিদার অভাব সে-বিষয়ে অধ্যাপক বাগচির ১৯৭৫ সালের গবেষণা পত্রে নানারকম কারণ দেখানো হল যার মধ্যে অসম আয়বন্টন, শিল্পক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি বা নতুন ভোগ্যপণ্য উদ্ভাবনের অভাব, অনুন্নত কৃষি ইত্যাদি সবই আছে। এই লম্বা তালিকার ভীড়ে আমরা কিছুটা দিশেহারা বোধ করি। প্রশ্ন ওঠে, কারণগুলোর মধ্যে কোনটা মুখ্য, কোনটা গৌণ? নীতি-নির্ধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে জানা দরকার হয়ে পড়ে, কোন সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সরকারের আশু পদক্ষেপ প্রয়োজন আর কোন কোন সমস্যাগুলোর সমাধান খানিকটা অপেক্ষা করতে পারে। একটু অন্যভাবে বলতে গেলে, নানা সম্ভাব্য কারণের গোলকধাঁধায় না ঘুরে, সেই সময় শিল্পক্ষেত্রে চাহিদার অভাবকে কোনও একটা বিশেষ তাত্ত্বিক কাঠামোর সাহায্যে বুঝতে পারাটা প্রয়োজনীয় ছিল।

মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য সেই রকম একটা তাত্ত্বিক কাঠামো, যা দিয়ে শিল্পে চাহিদার অভাবকে বোঝা যাবে, শেষ পর্যন্ত তৈরিও হয়েছিল, তবে রাতারাতি নয় এবং তার পেছনে, বলাই বাহুল্য, অনেকের গবেষণা, চিন্তা ও পরিশ্রম অন্তর্নিহিত ছিল। সে-প্রসঙ্গে পরে আসব। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখি যে, এই তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরির পেছনে অশোক মিত্রের অবদান সব থেকে প্রথম, যদিও সে অবদানের কথা পরবর্তীকালের সারস্বত সমাজ ততটা মনে রাখেনি।

প্রথমেই বোঝা দরকার ছিল, শিল্পের সমস্যাটা কি তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা, নাকি বাইরে থেকে আরোপিত কিছু? শিল্পের অভ্যন্তরে যে চাহিদার অভাব ঘটতে পারে, যে অভাবের কারণ বিনিয়োগের স্বল্পতা, সেটা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস এবং পোলিশ অর্থনীতিবিদ মিখাইল কালেচকি অনেক দিন আগেই আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু ভারতের মতো অনুন্নত দেশে যেহেতু কলকারখানার সংখ্যা ও আয়তন এমনিতেই অনেকটা কম, অর্থাৎ এখানে উৎপাদনের মোট ক্ষমতাটাই যেহেতু সামান্য, তাই এখানে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ চাহিদার অভাবে পূর্ণ সামর্থ্য অনুযায়ী উৎপাদন করা যাচ্ছে না, এটা মেনে নেওয়া শক্ত। অর্থাৎ আমাদের দেশের সমস্যাটা বোঝার জন্য কেইনস-কালেচকির তত্ত্বের সঙ্গে আরও কিছু কাঠামো যোগ করার দরকার ছিল। কালেচকি অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন, উন্নত দেশগুলির সঙ্গে অনুন্নত দেশগুলির মূল তফাৎ এই যে, অনুন্নত দেশগুলিতে কৃষি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, এখানে সাধারণ মানুষ তাদের আয়ের একটা বড় অংশ কৃষিপণ্য, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের ওপর খরচ করে। তাই শিল্পে কেন চাহিদার অভাব এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে কৃষির দিকে তাকানো জরুরি।

Terms of Trade and Class Relations বইটিতে অশোক মিত্র ঠিক এই কাজটাই করেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৭৩-৭৪ এই দুই আর্থিক বছরের মধ্যবর্তী সময়ে দু'টো জিনিস ঘটেছে। প্রথমত, এই সময়ে শিল্পদ্রব্যের দাম যতটা বেড়েছে, কৃষিপণ্যের দাম বেড়েছে তার থেকে অনেক বেশি। বস্তুত, এই সময়ের মধ্যে কৃষি-শিল্পের আপেক্ষিক মূল্য প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কৃষির অনুকূলে সরে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে কৃষি উৎপাদন শিল্প উৎপাদনের থেকে মোটের ওপর খানিকটা বেশি হারেই বেড়েছে। যেমন, ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৭০-৭১ এই দুই আর্থিক বর্ষের ভেতর কৃষি উৎপাদন বেড়েছে ২৫ শতাংশ, শিল্প উৎপাদন বেড়েছে ২০ শতাংশ। এই সার্বিক প্রবণতা থেকে অশোক মিত্র এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, শিল্পক্ষেত্রে স্থবিরতার প্রধান কারণ কৃষির অনুকূলে অর্থাৎ শিল্পের বিরুদ্ধে যাওয়া কৃষি-শিল্পের আপেক্ষিক মূল্য।

অশোক মিত্র তাঁর বইতে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন কী করে এটা ঘটছে। কৃষিপণ্যের দাম বাড়লে শিল্পক্ষেত্রের শ্রমজীবীরা তাঁদের আয়ের একটা বাড়তি অংশ খাবারের ওপর খরচ করতে বাধ্য হন। ফলে শিল্পদ্রব্যের ওপর তাঁদের খরচ কমে, শিল্পদ্রব্যের চাহিদাও কমে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে যে অসংখ্য ছোট-ছোট কৃষক বা কৃষি-শ্রমিক আছেন তাঁরাও কি শিল্পদ্রব্যের চাহিদা কমান? কৃষির দাম বাড়লে সেই দাম বাড়ার সুবিধেটা কতটুকু তাঁদের ওপর বর্তায়? যদি চাহিদা-যোগানের টানাপোড়েনে কৃষির দাম বাড়ত, যদি কৃষির বাজারটা প্রতিযোগিতামূলক হতো, তাহলে, ধরে নেওয়া যায়, বাড়তি কৃষিমূল্যের খানিকটা সুবিধে এই ছোট

চাষী এবং কৃষি-শ্রমিকরাও পেতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চাহিদা-যোগান দিয়ে কৃষি-শিল্পের আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্ধারিত হচ্ছে না। হলে আমরা দেখতে পেতাম কৃষি-শিল্পের আপেক্ষিক মূল্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির তুলনায় শিল্পের বৃদ্ধি আপেক্ষিকভাবে বেশি হয়েছে। সেটা যখন দেখতে পাচ্ছি না তখন বুঝতে হবে চাহিদা-যোগান নয়, অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় নির্দ্ধারিত হয়েছে কৃষি-শিল্পের আপেক্ষিক মূল্য।

অশোক মিত্র দেখালেন, বহু বছর ধরে সবুজ বিপ্লবকে সহায়তা করার অছিলায় কেন্দ্রিয় সরকার কৃষিপণ্যের মূল্য বেঁধে দিয়েছে। এবং এই বেঁধে দেওয়া দামের মান প্রতি বছর বেড়েছে। এইভাবেই ধারাবাহিকভাবে কৃষি-শিল্প আপেক্ষিক দাম কৃষির অনুকূলে যেতেই থেকেছে। এর পেছনে রয়েছে সরকারের ওপর পাঞ্জাব-হরিয়ানা-পশ্চিম উত্তর প্রদেশের অবস্থাপন্ন বড় কৃষকদের প্রভাব। তাঁরা তাঁদের প্রভাব খাটিয়ে আশাতীত লাভ করেছেন, কিন্তু সেই লাভের সামান্য ভগ্নাংশও ছোট কৃষকদের কপালে জোটেনি। এর কারণ, ফসল ওঠার ঠিক পরেই পূর্ববর্তী ঋণ শোধ করার জন্য ছোট কৃষকদের পূর্ব-নির্দ্ধারিত দামে মহাজনের কাছে ফসল বিক্রি করে দিতে হয়। বস্তুত, কৃষি-শ্রমিক তো বটেই কিন্তু শুধু কৃষি-শ্রমিক নয়, তাদের মতো এমন অনেক ছোট কৃষকও আছেন যাদের বাজার থেকে খাদ্যশস্য কিনে খেতে হয়। কৃষিপণ্যের দাম বাড়লে এদের লাভ তো নেই বরং ক্ষতি। কৃষি-শিল্প আপেক্ষিক দাম যত কৃষির অনুকূলে গেছে তত এদের খাবারের খরচ বেড়েছে এবং শিল্পদ্রব্যের ওপর খরচ কমেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, শিল্পের চাহিদা কমার পেছনে কৃষিপণ্যের দাম বাড়াটা একটা বড় কারণ। এর পাশাপাশি অবশ্য বড় কৃষকদের আয় বেড়েছে। কিন্তু তাঁরা যেহেতু মূলত বিলাসব্যসনে খরচ করেন এবং আমাদের দেশে বিলাসব্যসনের বাজার যেহেতু অপেক্ষাকৃতভাবে সীমিত, তাই শুধু বিলাসব্যসনের উৎপাদন দিয়ে শিল্পের সমস্যা মেটেনি।

সত্তর দশকের শেষ দিকে, যখন অশোক মিত্র-র বইটি প্রকাশিত হয় সেই সময়ে, শিল্প-স্থবিরতার এই ব্যাখ্যা অনেকটাই মান্যতা পেয়েছিল। কিন্তু প্রধানত দুটো কারণে সেটি ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের সম্মিলিত চেতনা থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে। প্রথম কারণ, ১৯৭৪ সালের পর থেকে কৃষি-শিল্প আপেক্ষিক মূল্য আবার একটু একটু করে শিল্পের অনুকূলে আসতে শুরু করে এবং ১৯৮৪ সাল নাগাদ এই আপেক্ষিক মূল্য প্রায় ১৯৬১-৬২র স্তরে পৌঁছে যায়, যেখান থেকে অশোক মিত্র তাঁর পর্যবেক্ষণ শুরু করেছিলেন। এর পর থেকে এই আপেক্ষিক মূল্য ধারাবাহিকভাবে বাড়েওনি আবার ধারাবাহিকভাবে কমেওনি। দ্বিতীয়ত, যত দিন গেছে তত অর্থনীতির চিন্তা-ভাবনাগুলোকে গণিতের ভাষায় বলাটাই দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অশোক মিত্রের চিন্তায় একটি গাণিতিক উপস্থাপনার সমস্ত মালমশলা ছিল, কিন্তু তিনি নিজে সে বিকল্পটা গ্রহণ করেননি।

মেনে নেওয়া ভাল, ক্রম-বর্দ্ধমান কৃষি পণ্যের দাম দিয়ে শিল্পের স্থবিরতাকে ব্যাখ্যা করার তত্ত্বটিকে ১৯৭৪ পরবর্তী তথ্য সমর্থন করে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অশোক মিত্র-র তত্ত্ব থেকে গ্রহনীয় কিছু নেই। গরিব দেশের শিল্পে চাহিদার অভাবকে বোঝার জন্য যে তাত্ত্বিক কাঠামোটির প্রয়োজন ছিল তার সব রকম উপাদান অশোক মিত্র-র ভাবনায় দেখতে পাই। ১৯৭৭ সালের একটি অপ্রকাশিত গবেষণা পত্রে অধ্যাপক অরূপ মল্লিক শিল্প-কৃষি ভারসাম্যের যে গাণিতিক কাঠামোটি নির্মাণ করেন তার সঙ্গে অশোক মিত্র-র চিন্তার বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। একই রকম মিল খুঁজে পাওয়া যাবে অধ্যাপক অমিতাভ বসুর ১৯৮৫ সালের তাত্ত্বিক গবেষণা পত্র Short Period Equilibrium in a Less Developed Economy-র সঙ্গে। দুটি গবেষণা পত্রই বিখ্যাত। দুটি গবেষণা পত্রেই কৃষি পণ্যের দাম ঠিক সেইভাবে শিল্পের চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করে যেভাবে অশোক মিত্র কল্পনা করেছিলেন। এছাড়াও দেশে-বিদেশে শিল্প-কৃষি ভারসাম্যের গাণিতিক কাঠামোটি ব্যবহার করে অসংখ্য গবেষণা পত্র লেখা হয়েছে, যেখানে শিল্পে চাহিদার অভাব, কৃষিতে যোগানের। এখানে সেই সব গবেষণা পত্রের তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু লক্ষনীয় যে, এই সমস্ত গবেষণা পত্রে কোথাও অশোক মিত্র-র কাজের কোনও উল্লেখ নেই। বর্তমান লেখকের মতে, এটা সারস্বত সমাজের সম্মিলিত ভ্রান্তি।

যেটুকু অর্থনীতির গবেষণা অশোক মিত্র করেছিলেন তার জন্য তাঁকে অর্থনীতিবিদ আখ্যা দেওয়া যায় কিনা এই প্রশ্ন দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। দেখতে পাচ্ছি, যে তাত্ত্বিক কাঠামো পরবর্তীকালে বহুজনস্বীকৃত, তার রূপরেখা অশোক মিত্র আগেই কল্পনা করেছিলেন। আমরা তাই তাঁকে মূলত অর্থনীতিবিদ হিসেবেই মনে রাখব।

সুখী কে?

বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, সুখী কে? যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, যে-লোক অঋণী ও অপ্রবাসী হয়ে অষ্টম প্রহরে অর্থাৎ সন্ধেবেলায় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য শাক রান্না করতে পারে, সে-ই সুখী। ধর্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন করছেন তখন পাণ্ডবদের বনবাস প্রায় বারো বছর হয়ে গেছে। এই বারো বছর ভাইদের নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নিজের বাড়ি ছেড়ে বনে বনে ঘুরতে হয়েছে, কখনও খাবার জুটেছে, কখনও জোটেনি, তিনি প্রতি পদে অনুভব করেছেন দ্যূতক্রীড়ার ঋণ শোধ করতে গিয়েই তাঁদের এই অপরিসীম কষ্ট। কাজেই বকের প্রশ্ন করার মুহূর্তে যুধিষ্টিরের কাছে অঋণী ও অপ্রবাসী থেকে সামান্য শাকাহার করাটাই চরম সুখের মনে হওয়া সম্ভব। কিন্তু বনবাসের আগে, যখন তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হয়েছেন, কিংবা তারও আগে যখন তিনি রাজপুত্র, তখনও তিনি বিলাসব্যসন ত্যাগ করে যোগীর মতো জীবন কাটাতে চাইছেন এমন ইঙ্গিত মহাভারতের বিভিন্ন অংশে আমরা বারবার পেয়েছি।

বিলাসব্যসন বাদ দিয়ে সুখী হওয়ার চিন্তা যুধিষ্ঠিরের একা নয়। প্রাচীন মুনি-ঋষিদের থেকে শুরু করে একেবারে আধুনিক যুগের মিনিম্যালিস্ট বা ন্যূনতমবাদীরা সকলেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সুখী হবার একমাত্র উপায় সমস্ত বিলাসিতা ছেড়ে সহজ-সরল জীবনযাপন করা। বেঁচে থাকার জন্য যা অপরিহার্য নয় তাকে একেবারে বর্জন করা। সক্রেটিস, যীশুখ্রীষ্ট, কনফুশিয়াস, গান্ধী, টলস্টয় অনেক মনীষীই আমাদের বিলাসিতাহীন, আড়ম্বরহীন জীবনযাপনের উপদেশ দিয়েছেন। এটাই নাকি সুখী হবার চাবিকাঠি।

মূলস্রোতের অর্থনীতি কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলে। ধরে নেওয়া হয়, মানুষের নিজস্ব ভোগ যত বেশি, তত তার সুখ। সেই নিজস্ব ভোগের আওতায় হয়ত তার বউ-ছেলেমেয়ে কিংবা নিকট অন্য কারো ভোগও আছে, কিন্তু তার বেশি আর কিছু নেই। অর্থাৎ আধুনিক অর্থনীতি ধরে নিচ্ছে, মানুষ মূলত স্বার্থপর ও ভোগবাদী, তার সমস্ত সিদ্ধান্ত বা কার্যকলাপ তার নিজের এবং নিকটজনদের ভোগকে ঘিরে, তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য তার নিজস্ব ভোগের বৃদ্ধি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে মানুষ তার প্রতিবেশির জন্য কিংবা নিজের দেশের জন্য ভাবে না। কিন্তু রোজকার বাজার-অর্থনীতি যে নিয়মে চলে তাতে এইসব মহৎ ভাবনার কোনো ভূমিকা নেই। যে চাহিদা-যোগানের টানাপোড়েন বাজার-অর্থনীতির চালিকাশক্তি সেখানে মানুষের স্বার্থপরতা এবং ভোগবাদটাই মুখ্য।

মানুষের এই স্বার্থপর প্রবণতার কথা প্রথম বলেছিলেন অ্যাডম স্মিথ, ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর ওয়েলথ অফ নেশনশ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। সেই থেকে মূলস্রোতের অর্থনৈতিক তত্ত্ব মানুষকে স্বার্থপর ধরে নিয়েই এগিয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বার্থান্বেষণ করলে কি মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বার্থের সংঘাত ঘটবে না? ফলে কি একটা সর্বব্যাপ্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে না? অ্যাডম স্মিথ বিশ্বাস করতেন, ঠিক এর উল্টোটাই হবে। মানুষ নিজের স্বার্থেই চারদিকে শান্তি বজায় রাখবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বার্থান্বেষণ করলে সকলেরই ভাল হবে। আধুনিক অর্থনীতি-চিন্তা অ্যাডম স্মিথের সেই মৌলিক বিশ্বাস থেকে এখনও সরে আসেনি।

সঙ্কীর্ণ স্বার্থচিন্তা বা ভোগবাদ মনুষ্য জাতির পক্ষে ভাল না মন্দ সেটা নিয়ে অবশ্যই তর্ক হতে পারে। কিন্তু তারও আগে প্রশ্ন উঠবে, সত্যি সত্যিই কি ভোগের ওপরে মানুষের সুখ নির্ভর করে? বস্তুত, মানুষের সুখ কীসের ওপর নির্ভর করে সেটা বোঝার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রত্যেক বছর সারা পৃথিবী জুড়ে একটা সমীক্ষা করা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে কিছু কিছু মানুষকে বৈজ্ঞানিকভাবে বেছে নিয়ে

তাঁদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করা হয়, শূন্য থেকে দশ, সুখের এই দশদফা মাপকাঠিতে তিনি নিজেকে কোথায় জায়গা দেবেন। যিনি নিজেকে দশে দশ দেবেন, বলাই বাহুল্য, তিনি নিজেকে প্রকৃতই সুখী মনে করছেন আর যিনি নিজেকে শূন্য নম্বর দিচ্ছেন তিনি মনে করছেন তাঁর মতো দুঃখী আর নেই। এই উত্তরের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি দেশের জন্য এক থেকে দশের মধ্যে একটা গড় সূচক গণনা করা হয় যা সেই দেশের গড় সুখের নির্দেশক।

এর পর প্রত্যেকটি দেশের গড় সুখের সূচকের সঙ্গে সেই দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়, অসাম্য, সুস্থ জীবনের গড় মেয়াদ, বিপদের দিনে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের থেকে সাহায্যের সম্ভাবনা, নিজের জীবন নিজে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা, দেশে দুর্নীতি সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা ইত্যাদি কয়েকটি সূচক মিলিয়ে দেখা হয়। বোঝার চেষ্টা করা হয়, সুখের সঙ্গে ভালোভাবে বেঁচে থাকার এই নিতান্তই পার্থিব সূচকগুলির কতটা সম্পর্ক।

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, একটি দেশের সুখ এই পার্থিব সূচকগুলির ওপর অবশ্যই নির্ভর করে। ২০১৮-র সমীক্ষায় পৃথিবীর সব থেকে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড এবং তার ঠিক নিচেই রয়েছে যথাক্রমে নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, সুইৎজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ইত্যাদি দেশ। লক্ষ্যনীয় যে, এইসব দেশে শুধু যে মাথাপিছু আয় বেশি তাই নয়, এখানে অসাম্য কম, সুস্থ জীবনের মেয়াদ বেশি, দুর্নীতি নেই বললেই চলে, মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রশ্নাতীত। চুপি চুপি বলে রাখি, সুখের মাপকাঠিতে ভারতের স্থান ১৫৬টা দেশের মধ্যে ১৩৩ নম্বরে। অর্থাৎ আমরা নিজেরাই মনে করছি, আমরা ১৩৫ কোটি মানুষের একটি দুঃখী দেশ।

২০১৮ সালের রিপোর্ট আর একটা তথ্য দিচ্ছে। সমীক্ষা করে দেখা গেছে প্রায় প্রত্যেকটি দেশে অভিবাসীরা, অর্থাৎ যারা সেই দেশে জন্মাননি কিন্তু অন্য কোথাও জন্মাবার পরে সেই দেশে গিয়ে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, দেশজ নাগরিকদের মতোই সুখী। এর একটা অর্থ হল, ভারত থেকে যেসব মানুষ ইয়োরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সেসব দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন তারা মোটের ওপর ওইসব বড়োলোক দেশের মানুষদের মতোই সুখী, গড় ভারতীয়র মতো দুঃখী নন। যুধিষ্ঠির যে বলেছিলেন, সুখী হওয়ার জন্য অপ্রবাসী থাকাটা জরুরি, কার্যত দেখা যাচ্ছে সেটাও বেশিরভাগ লোক ঠিক মনে করছেন না।